নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

জয়িতা দত্ত

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ



রত্নাবলী

৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ☐ কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম - প্রকাশ
ভাদ্র ১৪০৫ / আগস্ট ১৯৯৮

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
এস ঘোষ

মুদ্রক
কালার ইণ্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অধ্যাপক মানস মজুমদার
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ দু-এক কথা ॥

'যৌবরাজ্যে মৃত্যু বলে কিছু নেই'—লিখেছিলেন নবারুণ ভট্টাচার্য। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতাসমগ্রের মুখবন্ধে। কথাটা একশভাগ সত্যি। কবিতা ও কবি উভয়তই। মধ্যে বিস্তর বছরের ব্যবধান—বছর পেরিয়ে এক একটি শতাব্দী। তবু বেঁচে আছেন বাংলা কাব্যের আদি এবং আবহমান যুবক ভারতচন্দ্র রায়। বেঁচে আছেন তাঁর যৌব সাম্রাজ্য আলো করে। সমস্ত রকমের শাসন, শৃঙ্খলা, নীতি-নির্দেশিকা আর প্রথার মধ্যযুগীয় প্রাচীরকে নেহাৎ তুচ্ছ করে। এমন সাড়ম্বর জীবন ঘোষণার কারণেই তিনি কেবল সেকালের নন—চিরন্তন অধুনার। আর নির্বিশেষে আধুনিক বলেই তাঁকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার শেষ নেই। সেই অফুরন্ত আলোচনার মাঝখানে আমার এই ক্ষুদ্র অংশগ্রহণ নিছক ভিড় বাড়ানোর অপবাদটি মাথায় নিয়েও গুণমুগ্ধতার অকৃত্রিম তাগিদে ঠিক একটি প্রবেশপত্র যোগাড় করে নিয়েছে।

তবু উপস্থিতি প্রমাণসাপেক্ষ। ভারতচন্দ্র-কেন্দ্রিক আলোচনার আসরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে সেই উপস্থিতিটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি মাত্র। ফেলে আসা একটা সময়ের তীরে নোঙর ফেলে ধরতে চেয়েছি অস্থির, সংশয়-ক্লিষ্ট বঙ্গীয় বিন্যাসকে। দিনবদলের রুচি কেমন করে যুগান্তের অপরাহ্ণে ইতি-নেতির দ্বান্দ্বিকতায় দুলতে থাকে—তাকে। আর এ-সবই করবার চেষ্টা করা গেছে মাত্র একটি গ্রন্থের, বিশেষ একটি অংশের ('অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ড) নিবিড় পাঠ অবলম্বনে। দেখেছি, একক কবিমনীষার বহুমুখী দৃষ্টিতে পঠিত হচ্ছে একটি শতাব্দী। আমার কাজ ছিল শুধু সেই দৃষ্টিপাতকে অনুভব করা।

অনুভব আত্মগত। কিন্তু তাব প্রদর্শন সর্বজনীন। একলার ভাবনায় সকলকে সামিল করা। তা, সেই প্রদর্শনটি এই বইতে তিনভাবে করা হচ্ছে।

এক. বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সময় সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি, অনাধুনিকতা-আধুনিকতা, কিংবা কবির রাজকীয় অবস্থান ইত্যাদিকে মূর্ত করে।

দুই. চরিত্রগুলোর সঙ্গে ভাববিনিময় করতে করতে আলাপচারিতার ফাঁকে তাদের আঁতের কথা টেনে বার করে।

তিন. পুরাণ এবং ইতিহাস প্রসঙ্গের খুঁটিনাটি তথ্য সাধ্যমত পরিবেশন করে।

এই তিনে মিলে মূল পাঠের একটি অনতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা বচিত হয়েছে।

রচনায় সময় লেগেছে বিস্তর। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীল ভট্টাচার্যের (প্রকাশক, রত্নাবলী) নিখাদ এবং আন্তরিক পরামর্শ ও সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশ পেয়েছে। আমার দুই প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, অভিজিৎ গলুই ও শিরীন শবনম এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরির মাননীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয় দে-র ভূমিকাও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশ সাগ্রহে পড়ে তার মূল্যবান মতামত দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে আমার পুত্র ঋভু। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের হাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া গেল না। এ-ব্যাপারে আমার নিজের দায়ভার অস্বীকার করছি না।

প্রেসিডেন্সি কলেজ
বাংলা বিভাগ
জন্মাষ্টমী ১৪১৫/২৪.৮.২০০৮

জয়িতা দত্ত

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

অবতরণিকা

কবি ভারতচন্দ্র : জীবন ও কাল পরিচিতি

কবি-পরিচিতি : ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনার সূত্রপাত উনিশ শতকে। সাধারণভাবে প্রাপ্ত তথ্য, ক্ষেত্রানুসন্ধান ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-ই প্রথম ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনায় প্রয়াসী হন। তিনি জানিয়েছেন 'কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথায়' (যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতচন্দ্রের পৌত্র এবং ভারতচন্দ্রের বাসস্থান মূলাজোড়ের প্রবীণ মানুষজন) এবং স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনা করেছেন, যা প্রথমে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এবং পরে *কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত* নামে পুস্তকাকারে (১৮৫৫ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। এর আগে অবশ্য 'Literary Gazette' (১৯৩০ খ্রি.)-এর সম্পাদকদ্বয়, কালীপ্রসাদ ঘোষ ও রেভারেণ্ড লং ভারতচন্দ্রকে মুকুন্দের সমসাময়িক ধরে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াসকেই প্রথম গবেষণামূলক আলোচনা হিসেবে মর্যাদা দিতে হয়।

ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশিট বা ভুরসুট পরগনার 'পেঁড়োর গড়' নামে এক গড়-বন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা হাওড়া জেলায় এই দু'টো জায়গাই বিদ্যমান। কিন্তু ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের সর্বপ্রথম আলোচক ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন যে, ভারতচন্দ্রের পিতা—"নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় জিলা বৰ্দ্ধমানের অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পেঁড়ো নামক স্থানে বাস করতেন।"

ঈশ্বর গুপ্তের এই বক্তব্যের কারণে পরবর্তী সমালোচকদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছে যে, তাঁরা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত (অধুনা হাওড়া) ভুরসুটে কবি ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল—এটুকু বলেই দায়মুক্ত বোধ করেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান নিয়ে এই বিভ্রান্তি (বর্ধমান-হাওড়া) বিমোচনের অবকাশ রয়ে গিয়েছে এখনও।

ড. নীহাররঞ্জন রায় ভুরসুটের জেলা নির্ণয়ে আত্ম-বিরোধ স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—

> "...দু'একটি অধ্যায়ে ভুরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা অঞ্চলের কথা বলেছি, এবং এক জায়গায় বলেছি এই গ্রাম বা অঞ্চলটির অবস্থান ছিল হাওড়া জেলায়, অন্যত্র বলেছি, হুগলী জেলায়।"

ড. রায় এই সমস্যার মীমাংসায় বলেছেন যে, ভুরসুট নামে গ্রাম এবং পরগনা দুই-ই ছিল বা আছে। পরগনাটা হাওড়া-হুগলি জুড়ে বিস্তৃত।

শ্রী নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় *অন্নদামঙ্গল* কাব্য সম্পাদনকালে 'পেঁড়ো' অর্থাৎ 'পাণ্ডুয়া' গ্রামে কবির পিতার বাস ছিল বলে সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পেঁড়ো এবং পাণ্ডুয়া অভিন্ন বলা সঙ্গত নয়। কেননা হুগলির চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রাম ও হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত পেঁড়ো সম্পূর্ণ পৃথক এবং বহু দূরবর্তী দুটি স্থান। পেঁড়োর আদিনাম পাণ্ডুয়া নয়—'পাণ্ডুভূমি বিহার'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পাণ্ডু দাস (১০ম শতাব্দী)—যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীধরাচার্য রচনা করেন *ন্যায়কন্দলী* গ্রন্থ (৯৯১-৯৯২)। সেখানে বিবৃত হয়েছে—

আসীদক্ষিণারাঢ়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মাণাম।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠাজনাশ্রয়॥

অর্থাৎ 'দক্ষিণবাঢ'-এ ভূবিশ্রেষ্ঠীগ্রাম বহু ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠীব সমাবেশে সমৃদ্ধ ছিল। আর জীবনেব এমন সচ্ছল আবহে যে সাহিত্যেব সোনার ফসল ফলবে তাতে সন্দেহ কি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিই এ-অঞ্চলে বাস কবতেন। *জৈগুন হানিফা*-র রচয়িতা সৈয়দ হামজা, *জগন্নাথমঙ্গল* (১৭১৬)-এর রচয়িতা গদাধব দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য এইসব কবিদেব মধ্যে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠতম।

সুতবাং হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান জেলাসীমান্ত অঞ্চল নিয়ে যে বিস্তৃত দক্ষিণবাঢ অঞ্চল, তার অন্তর্গত যে ভুরসুট পরগণা সেখানেই ভাবতচন্দ্রের জন্ম। বর্তমানে এটি হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঠিকই। তবুও ঈশ্বর গুপ্ত যে তাকে 'বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী' বলেছেন তাবও একটা কারণ আছে।

দশম শতকের পর থেকে ঈদ-লিপি, লক্ষ্মণসেনেব নৈহাটি ও গোবিন্দপুব লিপি থেকে 'বর্ধমানভুক্তি' বলে একটা বিষযের কথা জানা যায। সেই অনুযায়ী দণ্ডভুক্তি-মণ্ডল বা অধুনা মেদিনীপুবেব সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত দাঁতন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এই বর্ধমানভুক্তির মধ্যে পড়েছিল। অতএব এব মাঝামাঝি গোটা দক্ষিণ বাঢ ছিল তৎকালীন বাষ্ট্রবিভাগে 'বর্ধমান'-এব অন্তর্গত। বলাবাহুল্য যে বিভাগ বণ্টনে হাওডা, হুগলি ও বর্ধমান জেলা এখনও পর্যন্ত বর্ধমান বিভাগেবই অন্তর্গত। সেই সূত্রেই ভুবশিট 'বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী'।

কাল পরিচিতি. ভারতচন্দ্রেব জন্মস্থানেব মতোই তার জন্মকাল নিযেও একটা বিভ্রান্তি রয়ে গিয়েছে। ঈশ্বব গুপ্ত তাঁব *কবিবব ভাবতচন্দ্র বায গুণাকবেব জীবনবৃত্তান্ত* (১৮৫৫) পুস্তকে লিখেছেন—"ভাবতচন্দ্র বাযগুণাকব মহাশয ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হযেন।" অর্থাৎ তাঁর মতে ভারতচন্দ্রেব জন্ম খ্রি ১৭১২ অব্দে বা ১১১৯ বঙ্গাব্দে। তিনি এই তথ্যেব সংকেত পেয়েছেন কবিব *সত্যপীবেব কথা*-ব একটি চৌপদীতে—

> সবে কৈল অনুলাও, সংক্ষেপে কবিতে পুঁতি, কমতি বাহাব গাও, না কাণও দূষণা॥
> গোষ্ঠীব সহিততায, হবি হোন ববদায, ব্রতকথা সাঙ্গ পায, সনে রুদ্র চৌগুণা॥

লোকশ্রুতিতে এই লেখাটি কবিব পনেবো বছর বযসেব লেখা বলে ধবে নিযে এবং 'সনে রুদ্র চৌগুণা'কে ১১৩৪ ধবে নিযে ঈশ্বব গুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, কবিব জন্ম ১১৩৪ ১৫ = ১১১৯ বঙ্গাব্দ। কিন্তু 'সনে রুদ্র চৌগুণা'ব মূল্যমান নিযেই একটা সংশয় বযেছে। ঈশ্বব গুপ্ত একাদশ রুদ্র এবং ত্রিবিধ গুণ ধবে 'সনে রুদ্র চৌগুণা'ব (রুদ্র = ১১, চৌ = ৪, গুণ = ৩) মূল্যমান নিরূপণ করেছেন ১১৩৪। কিন্তু এতে 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মকে লঙ্ঘন কবা হয়। মধ্যযুগীয বাংলা পুঁথিব পুষ্পিকায় সচবাচব অঙ্কের বামাগতি নিয়মকে কোথাও লঙ্ঘিত হতে দেখা যায নি। এক্ষেত্রে সেই নিয়মকে মাথায রেখে *সত্যপীরের কথা*-র বচনাকাল ১১৪৩ বঙ্গাব্দ ধবাটাই যুক্তিযুক্ত। অধ্যাপক সুখময মুখোপাধ্যায অবশ্য 'সনে রুদ্র চৌগুণা = ১১৪৪' হিসেবে নিরূপণ করেছেন (*মধ্যযুগীয বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*)। কেননা তাঁব মতে 'চৌ' শব্দ হিসাবে বাংলায় অব্যবহৃত। এখন 'সনে রুদ্র চৌগুণা = ১১৪৪' বঙ্গাব্দ হলে ভাবতচন্দ্রেব জন্মসাল ১১২৯ বঙ্গাব্দেব কাছাকাছি বলে বিবেচনা কবতে হয়। সেক্ষেত্রে আবাব কবির মৃত্যুকালে অর্থাৎ ১১৬৭ বঙ্গাব্দে তাঁর বয়স দাঁড়ায় ৩৮ বছর। এক্ষেত্রেও বিপত্তিব কাবণ *নাগাষ্টক* রচনার সময়ে কবিব বয়স ছিল ৪০ বছর—কবি স্বযং তা উল্লেখ করেছেন। এখন 'সনে রুদ্র'র পরিবর্তে *নাগাষ্টক* ধরে বিচাব কবলে আর একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে *নাগাষ্টকম্* রচনা করেছিলেন মূলাজোড়ের পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগ (মতান্তরে রামদেব)-এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে। রচনার পর এ-কাব্য কবি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান। *সত্যপীরের পাঁচালী* ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের রচনা। এর পরও বেশ কিছুকাল নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন কবি। আবার ১৭৪২-এ কৃষ্ণচন্দ্র যখন আলিবর্দির হাতে বন্দি হন তখন থেকেই ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। *অন্নদামঙ্গল*-এর গ্রন্থসূচনা অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে বন্দিশালাতেই কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন দেবী অন্নদা কর্তৃক—

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।...

....

তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।

সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র বন্দিশালায় প্রবেশের আগেই ভারতচন্দ্র রাজসভাকবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যদিও রায়গুণাকর উপাধি তিনি পেয়েছিলেন কাব্যরচনার পরেই—

কৃষ্ণদাস আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে।।

*নাগাষ্টক*তাই ১৭৪২-এর পরের রচনা। আবার তা *অন্নদামঙ্গল* রচনার (১৭৫০-৫২) আগের লেখাও বটে। কেননা *অন্নদামঙ্গল* রচনাকালে কবি তিন পুত্রের পিতা অথচ *নাগাষ্টক* রচনার সময় কবির কেবল একটিমাত্র শিশুপুত্রের জন্ম হয়েছিল—"পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী"।

এবার অনুসন্ধান করা যেতে পারে ঠিক কোন সময়টিতে বা বছরটিতে *নাগাষ্টক* লেখা হয়েছিল। বামদেবকে মূলাজোড়ে পত্তনি দেওয়ার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে আনারপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপনেব জন্য ভূমিদান কবেন। এই দানের দলিলটিকে উদ্ধার করে সুখময় মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে ভারতচন্দ্র ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে আনারপুরের ৭২ বিঘা জমির মালিকানা পেয়েছিলেন। সুতরাং বর্গির হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানের মহারানি যে বামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পত্তনি নেন, সেই রামদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র নিশ্চয়ই ১৭৪৯-এর নভেম্বরের আগেই *নাগাষ্টক* রচনা করেন। এ গ্রন্থ রচনাকালে ভারতচন্দ্রের বয়স যেহেতু চল্লিশ বছর ছিল তাই সিদ্ধান্ত করতে সমস্যা হয় না যে ভারতচন্দ্রের জন্ম ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে বা তার কিছু পূর্ববর্তী সময়ে।

বংশ ও পূর্বপুরুষের পরিচয় : ঈশ্বর গুপ্ত কবির বংশপরিচয় বিষয়ে লিখেছেন—

"তিনি (নরেন্দ্রনারায়ণ রায়) অতি সুবিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন; সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগের সম্মানপূর্ব্বক 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি 'ভরদ্বাজ গোত্রে' মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয়-বৈভবের প্রাধান্য জন্য 'রায়' এবং 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

কবির এই পরিচয়ই আদিসূত্র হিসেবে রয়েছে কবির লেখা *সত্যপীরের পাঁচালী* গ্রন্থে—

"ভরদ্বাজ-অবব্যস ভূপতিরায়ের বংশ সদা ভাবে হতক্যস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারতভারতীযুত ফুলের মুকুটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি।।
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র জননী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায় হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারণী।।"

অর্থাৎ কবি ভারতচন্দ্র গোত্র পরিচয়ে ভারদ্বাজ, বংশ পরিচয়ে মুখোপাধ্যায় বংশীয়। তাঁদের ভূম্যধিকারজ্ঞাপক পদবি 'রায়' এবং কবি-হিসেবে রাজার কাছ থেকে লাভ করেন 'রায় গুণাকর' উপাধি। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ এবং মাতা ভবানী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র। অগ্রজ তিন ভ্রাতার নাম—যথাক্রমে চতুর্ভুজ রায়, অর্জুন রায় ও দয়ারাম রায়। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে একজায়গায় নিজেকে রাধানাথ বলে উল্লেখ করায় মনে হয় যে, তাঁর পত্নীর নাম ছিল সম্ভবত রাধা। এই বংশেরই আদিপুরুষ ছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা।

জীবনবৃত্ত : ভারতচন্দ্রের জীবন যথেষ্ট ঘটনাবহুল। নিতান্ত বাল্যাবস্থা থেকেই ভারতচন্দ্রের ভাগ্যবিড়ম্বনার সূত্রপাত। জনশ্রুতি হল, অধিকারভুক্ত ভূমির সীমা-সম্বন্ধীয় কোনো এক বিবাদসূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়বাহাদুরের মাতা শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে তিক্তবাক্য প্রয়োগে অপমানিত করেন। সে সময়ে মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের শৈশবাবস্থা। মহারাণী ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ং ভুরসুট আক্রমণ ও অধিকার করার নির্দেশ দেন। সেনাপতি 'আলমচন্দ্র' ও 'ক্ষেমচন্দ্র' দশ হাজার সৈন্যসহ 'ভবানীপুরের গড়' এবং 'পেঁড়োর গড়' আক্রমণ ও অধিকার করেন। পরদিন মহারাণী সেখানে এসে ধনরত্ন যা ছিল সমস্ত হস্তগত করে তারপর গড় প্রত্যার্পণ করে ফিরে গেলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে কোনো প্রকারে কায়ক্লেশে দিনযাপন করতে লাগলেন। ভারতচন্দ্রকে তখন ঘাট পরগনার গাজিপুরের নিকটবর্তী 'নওয়াপাড়' গ্রামে মাতুলালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করতে হয়েছিল। সেখানেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তারপর সেই অল্পবয়সেই চিরাচরিত পারিবারিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে অগ্রজ তিন ভ্রাতার বিবাহ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কনিষ্ঠ হয়ে ঐ মণ্ডলঘাট পরগনার তাজপুর (সম্ভবত বর্তমান হুগলির মশাটগ্রামের নিকটবর্তী)-এর নিকটবর্তী সারদা গ্রামের কেশরকুনির আচার্যদের মধ্যে একজন নরোত্তম আচার্যের কন্যাকে বিবাহ করলেন। সম্ভবত সেই কন্যার নাম ছিল 'রাধা'। এই বিবাহকে ভারতচন্দ্রের জীবনে এক বিরাট বাঁক হিসেবে দেখতে হয়।

বিদ্যার্জন করে ঘরে ফিরলেন ভারতচন্দ্র। অভ্যর্থনার পরিবর্তে মিলল কঠিন আঘাত। অগ্রজেরা তাঁকে তৎকালীন বৈষয়িক কাজে অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এবং প্রণয়ান্তিক বিবাহব্যাপারে অগ্রসর হবার কারণে প্রভূত তিরস্কার করলেন। সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করলেন ভারতচন্দ্র। স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন কবি অর্থকরী রাজভাষা শিক্ষার জন্য বর্তমান ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে দেবানন্দপুর-বকুলতলা নিবাসী রামচন্দ্র দত্ত মুনশির গৃহে বাস করতে শুরু করলেন (১১২৪-৪৪ সাল = ১৭১৭-৩৭ খ্রি.)। রামচন্দ্র মুনশির গৃহে অবস্থানকালে হীরারাম রায়ের (রামচন্দ্রের পুত্র) 'বাসনা'-য় মাত্র ১৫ বছর বয়সে (ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত জনশ্রুতি অনুযায়ী) ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্র সত্যনারায়ণ পাঁচালী (সম্ভবত ত্রিপদীতে) রচনা করেন। এরপরে পারসি-শিক্ষক রামচন্দ্র মুন্শির 'অনুমতি' অনুসারে ভারতচন্দ্র চৌপদীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা (১৭৩৭ খ্রি.) করেন। এখানে হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

রাজভাষায় কৃতবিদ্য হয়ে কবি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। সমাদরও পেলেন। এই সময় নরেন্দ্রনারায়ণ বর্ধমানেশের কাছ থেকে কিছু জমি ইজারা নিয়েছিলেন। পিতা এবং অগ্রজদের নির্দেশে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে গিয়ে উক্ত ভূ-সম্পত্তির তদারকি শুরু করেন (১১৪৫-৪৮ সাল = ১৭৩৮-৪১ খ্রি.)। কিন্তু করদানে অপারগতাবশত উক্তভূমি খাসভুক্ত হয়ে যায় এবং নানা চক্রান্তে পড়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। ভাগ্যক্রমে কারাধ্যক্ষের কৃপায় একরাত্রে কবি তাঁর ভৃত্য

রঘুনাথের সঙ্গে পলায়ন করে মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলের সুবেদার শিবভট্টের শরণাগত হন এবং তাঁরই কৃপায় ছদ্মবেশে শংকরাচার্যের মঠে গেরুয়াবসন পরে, বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠ এবং ভজনকীর্তনে যোগদান করে তাঁর দিন কাটতে লাগল।

কিছুদিন পরে বৈষ্ণব সহযোগীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবার জন্য ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসেন। সেখানে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি ভট্টাচার্য মহাশয় বাস করতেন। ভৃত্য রঘুনাথের কাছে গোপনে সংবাদ পেয়ে তিনি ভারতচন্দ্রকে স্বগৃহে নিয়ে আসেন এবং উদাসী ভ্রাম্যমাণ কবিকে গৃহীজীবনে ফিরিয়ে আনেন। এর পরে অর্থোপার্জনের জন্য ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙায় এসে ফরাসি সরকারের দেওয়ান পালধি-বংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাগত হন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জাতিগত অপবাদেব কারণে ভারতচন্দ্র বাস করতে থাকেন ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাঁর বন্ধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। এই সময় স্ত্রীর সঙ্গে তিনি সংসার পাতেন। মহারাজ কবিকে ৪০ টাকা বেতনে সভাকবি পদে বরণ করেন এবং ভারতচন্দ্রের রচনায় (*অন্নদামঙ্গল*) মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। এইভাবে ভারতচন্দ্রেব অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতি অন্তরঙ্গ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রও তার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়েছেন তাঁর কাব্য মহারাজ এবং রাজবংশকে উজ্জ্বল গৌরবে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু বিস্ময়েব ব্যাপার ভারত রচনাবলীর কোথাও ভারতচন্দ্রের সবথেকে ঘনিষ্ঠ দুই পৃষ্ঠপোষক-যুগল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম নেই।

কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা ভাগ্যবিড়ম্বিত কবিকে স্বাচ্ছন্দ্য আর সৌভাগ্যের হদিশ দেয়। রাজা তাঁকে বসতবাটি নির্মাণের জন্য মূলাজোড় (বর্তমান শ্যামনগর) গ্রামটি ইজারা দেন। গৃহনির্মাণের জন্য ১০০ টাকা এবং বার্ষিক ৬০০ টাকা অনুদানের ফলে একদিকে যেমন কবির জীবনে এল সচ্ছলতা তেমনি অন্যদিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পেলেন একজন পরম গুণবান প্রতিভাশালী রাজসভাকবি।

কিন্তু 'বড়র পিরিতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ'—স্বরচিত এই প্রবচনের সত্যতা ভারতচন্দ্রের নিজের জীবনেই অভিজ্ঞাত হল স্বয়ং মহারাজের এক অকরুণ ব্যবহারে। তখন সঙ্কটকাল। বাংলাদেশে ভয়াবহ বর্গিহাঙ্গামা চলছে। বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের জননী বর্ধমান থেকে পালিয়ে এসে মূলাজোড়ের পূর্ব-দক্ষিণে 'কাউগাছি' নামক স্থানে 'গড়বন্দী বাটী' নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করলেন। কর্মচারী রামদেব নাগের নামে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে মূলাজোড় পত্তনি নেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রকে প্রদত্ত মূলাজোড় তিলকচন্দ্রের জননীর অনুকূলে পত্তনি দিয়ে দেন। তবে মূলাজোড়ের জমির স্বত্ব ত্যাগের বিনিময়ে আনারপুরের অন্তর্গত 'গুস্তে' নামক গ্রামে ১০৫ বিঘা ব্রহ্মত্ররূপে কবিব জন্য ধার্য করেন। কিন্তু মূলাজোড়বাসীর সনির্বন্ধ অনুরোধে কবি সেখানেই থেকে যেতে বাধ্য হন। আর এরই ফলে মূলাজোড়ের অধিবাসীদের উপর রামদেবের নাগের অত্যাচার শুরু হয়। এর প্রতিকারার্থে রামদেব অত্যাচারের কাহিনীকে উপজীব্য করে শ্লেষাত্মক কাব্য *নাগাষ্টক* সংস্কৃত ভাষায় রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান। এই কাব্যের বৈদগ্ধ্য এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নির্ভুলভাবেই লক্ষ্যভেদ করেছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে অচিরেই নাগদমন করলেন। কবির জীবনে *অন্নদামঙ্গল* রচনার স্থিতিশীল আবহ তৈরি হল। ১৭৫২-৫৩ সালে রচিত হল সেই বিখ্যাত কাব্য—ভারতচন্দ্রের

সমস্ত জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সার, জীবনের প্রতি অপরিসীম সুস্থ আকাঙ্ক্ষার সুচারু শিল্পিত প্রকাশ।

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

এরপর আর আট বছর মাত্র বেঁচেছিলেন কবি। ১৩৭৪ শকে বাংলা ১১৫৯ সালে (১৭৬০ খ্রি.) ৫০ বছর বয়সে বহুমূত্র রোগে ও শেষ সময়ে ভস্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। যশ ও খ্যাতির মধ্যগগনে তখন কবির অবস্থান। কবির শেষজীবন সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর *কবিজীবনী*-তে লিখেছেন :

> "মরণের কিছুদিন পূর্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনাচ্ছলে সংস্কৃত ও হিন্দি-মিশ্রিত বঙ্গভাষায় 'চণ্ডীনাটক' নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচন করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।"

জীবন-তৃষিত কবি, তবু স্বল্পায়ু জীবনে তৃষ্ণার পানপাত্র জীবনরসে পরিপূর্ণ করে নিয়েছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ জীবনদর্শন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শানিত অস্ত্রে জীবনকে চিরে চিরে তিনি তাঁর সমগ্র কাব্যসাধনায় দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন কোথায় জীবনের সত্যস্বরূপ আর কোথায়ই বা মিথ্যার ছলনায় আত্ম-খণ্ডনের নিদারুণ লাঞ্ছনার জ্বালাধরা মূর্তি।

সাল (খ্রি.)	ভারতচন্দ্রের জীবন ও সমকালের ঘটনাপঞ্জি	ভারতচন্দ্র ও অন্যান্যদের রচনা
১৭০৩	বর্ধমানে রাজা কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল শুরু। ঔরঙ্গজেবের থেকে মসনদ লাভ	
১৭০৪		বৈষ্ণবপদ সংকলন : *ক্ষণদাগীতচিন্তামণি* বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (সম্পা), *মনসামঙ্গল*—রামজীবন বিদ্যাভূষণ
১৭০৪	ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু, মারাঠা পেশোয়াতন্ত্রের উদ্ভব	
১৭০৮		*মনসামঙ্গল*—সীতারাম দাস
১৭১০	কবি ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম। কীর্তিচন্দ্রের মাতা কর্তৃক নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন	
১৭১১		সত্যনারায়ণ ব্রতকথা, *শিবায়ন* বা *শিবমঙ্গল* (রামেশ্বর ভট্টাচার্য) *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)
১৭১৩	ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে অসদ্ভাবের কারণে তাঁদের ভবানীপুর গড় দখল করতে কীর্তিচন্দ্রের আক্রমণ	প্রণয়কাব্য *শাহনামা* (মুহম্মদ উজীর আলি)
১৭১৪-১৫	বাল্যশিক্ষালাভার্থে ভারতচন্দ্রের মাতুলালয়ে গমন। সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন।	*গদ্যমালিকা সংবাদ* (শেখশাদী)
১৭১৬		*জগন্নাথমঙ্গল* (গদাধর দাস) তিনি এ কাব্য লিখেছেন কীর্তিচন্দ্রের 'পড়ুয়া' পরগনার ভুরশিট তালুকে বসে, ভেজুয়া আমীন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে
১৭১৭	মুর্শিদকুলি বাংলার নবাব হলেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা-বিহার ওড়িশায় ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র বা 'ফরমান' লাভ।	
১৭২৫	ভারতচন্দ্রের প্রণয়াস্তিক বিবাহ 'রাধা' নাম্নী এক কন্যার সঙ্গে।	

সাল (খ্রি.)	*ভারতচন্দ্রের জীবন ও সমকালের ঘটনাপঞ্জি*	*ভারতচন্দ্র ও অন্যান্যদের রচনা*
১৭২৫-৩৭	কবির সস্ত্রীক গৃহে প্রত্যাবর্তন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বাড়িতে তিরস্কৃত। দেবানন্দপুরে গমন। রামচন্দ্র দত্ত মুনশির কাছে ফারসি শিক্ষা গ্রহণ।	*সত্যনারায়ণ পাঁচালী* রচনা (১৭৩৭ খ্রি.) [চৌপদীতে]
১৭৩৮	জমিদারি কাজের তদারকির জন্য কবির বর্ধমান যাত্রা, সেখানে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাবরণ। কারাধ্যক্ষের অনুকম্পায় পলায়ন। বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ। শ্যালীপতিকর্তৃক শ্বশুরালয়ে ফিরিয়ে আনা। বৈরাগীবেশ ছাড়ানো। উপার্জনের উদ্দেশে ফরাসডাঙ্গা যাত্রা এবং সেখানে ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।	
১৭৪০-৪২	ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর উদ্যোগেই কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রাজা কর্তৃক ৪০ টাকা বেতনে সভাকবি-রূপে নিয়োগ। মূলাজোড় গ্রামের পত্তনি দান।	
১৭৪২	মারাঠারা দিল্লীর সুলতানের কাছ থেকে চৌথ আদায়ের অধিকার লাভ করার পর বাংলায় ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বর্গি আক্রমণ।	কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বসে ভারতচন্দ্রের *রসমঞ্জরী* রচনা
১৭৪৩	নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলেকে নিয়ে ভাস্করের বাংলা আক্রমণ—পেশোয়ার সঙ্গে আলিবর্দির চুক্তি ২২ লক্ষ টাকা এবং রঘুজীর বিতাড়ন।	
১৭৪৪	বিতাড়িত মারাঠাদের বাংলায় পুনরাক্রমণ লুঠপাট। বর্ধমান-রাজ তিলক চন্দ্রের রাজত্বের সূচনা।	
১৭৪৫	বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের জননীর মূলাজোড়ে পত্তনি স্থাপন। রামদেব নাগের অত্যাচারে বিপন্ন ভারতচন্দ্র।	
১৭৪৯	কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান এবং আনারপুরে জমি দান দলিল। কবি কর্তৃক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক সংস্কৃত কাব্য *নাগাষ্টক* রচনা ও রাজাকে প্রেরণ।	*নাগাষ্টকম্* রচনা
১৭৫০	তিলকচন্দ্রের কর্মচারী রামদেব মূলাজোড় থেকে বিতাড়িত।	
১৭৫২-৫৩	তিন সন্তানের জনক কবি।	*অন্নদামঙ্গল*-কাব্য রচনা সমাপ্ত
১৭৬০	কবির মৃত্যু ৫০ বছর বয়সে।	

আঠারো শতকের বাংলা

সপ্তদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু জীবনযাত্রা ও সামাজিক চৈতন্যের প্রত্যয়হীনতার পথ ধরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা। ভারতচন্দ্রের জন্ম মোটামুটি ১৭১০-১১ এবং মৃত্যু ১৭৬০ সালে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ৫০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার নিরিখে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হিসেবে যে-ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেই পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা রূপায়িত করেছেন তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে তা যে-কোন কবির পক্ষেই শ্লাঘার বিষয়। কোন মানুষ যেমন তার ছায়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না তেমনি ভূয়োদর্শী কবি-শিল্পীরা দেশ ও কাল-নিরপেক্ষ ভাবে কাব্যরচনা করতে পারেন না, ভারতচন্দ্রও পারেন নি। তাঁর রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে সমকালের দেশ-কালের বাস্তবচিত্রই উঠে এসেছে। তাই তাঁর কাব্যকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে ইতিহাসগতভাবে ভারতচন্দ্রের সমসময়ের চিত্রটিকে জেনে নিতে হয়, জেনে নিতে হয় ঐ সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে। এখানে মনে রাখতে হবে যে পলাশীব যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের তিন বছর পরে ১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভটুকুর প্রত্যক্ষ সঙ্গী হতে না পারলেও সে-শাসনে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন হবে তার আভাস তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ভয়াবহ মন্বন্তরের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসেবে খ্যাত) আভাস তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ভারতচন্দ্রেব কাব্যে দেখি অন্নদা যাঁর পত্নী সেই শিবকেও অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হয়েছে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে অষ্টাদশ শতকের বাংলা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রটিকে আমরা একবার দেখে নিতে পাবি।

রাজনৈতিক পটভূমি :

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের শাসনকালে বাংলা দেশ মোগল অধিকারে আসে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবায় ভাগ করেন—সুবার শাসক ছিলেন সুবাদার বা নাজিম (প্রশাসনিক) এবং দেওয়ান (আর্থিক)—এঁরা নিজেদের কাজের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের কাছে দায়ী থাকতেন। সুবার জমি থেকে দু-ধরনের রাজস্ব আদায় হত : খালসা যা মোগল সম্রাটের প্রাপ্য এবং জায়গীর যা সুবার প্রশাসনিক ও উন্নতির জন্যে ব্যয়িত হত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলা সুবা থেকে প্রাপ্ত এই দু-ধরনের রাজস্ব বিপুলভাবে কমে যায়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মুর্শিদকুলিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষার দেওয়ান এবং উড়িষ্যার নাজিম করে পাঠান। এই সময় (১৭০০-১৭০৬ খ্রি.) বাংলার সুবাদার ছিলেন ঔরঙ্গজেবের প্র-পৌত্র অলস ও অর্থলোভী আজিম-উস-সান। মুর্শিদকুলি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৩-য় তিনি বাংলার ডেপুটি সুবাদার হন এবং ১৭১৭ থেকে আমৃত্যু ১৭২৭ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাংলা সুবার সুবাদার। অপুত্রক মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ানি লাভ করে জামাতা সুজা-উদ-দিনকে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলির সঙ্গে সুজাউদ্দিনের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। এই অবস্থায় মুর্শিদকুলির ধর্ম-প্রাণা কন্যা (জেবুন্নিসা) সুজাউদ্দিনের অসংযত জীবন যাপনের

কারণে পুত্র সরফরাজকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃগৃহে চলে আসেন। এরপর মুর্শিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজের নামে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদারির ফরমান আনানোর প্রয়াস শুরু করলেন। এই সংবাদ পেয়ে সুজা-উদ-দিনও দিল্লি দরবারে নিজের নামে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদারের পদের জন্যে ফরমান আনানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ-ব্যাপারে তাঁর একান্ত অনুগত কর্মচারী—দুই ভাই হাজি মহম্মদ ও মির্জা মহম্মদ আলি তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। আবার এদেরই পরামর্শে সুজা-উদ-দিন বাংলা নবাবের সিংহাসন দখল করার অভিপ্রায়ে মির্জা মহম্মদ আলিসহ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করলেন। পথেই তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুসংবাদ এবং নিজের নামে দিল্লির ফরমান পাওয়ার সংবাদ পেলেন। ফলে এখন আর বাংলা ও উড়িষ্যার নবাবরূপে নিজেকে ঘোষণা করতে কোন অসুবিধা থাকল না। নবাবি তক্তে আসীন হয়ে সুজা-উদ-দিন প্রিয়পাত্র মির্জা মহম্মদ আলিকে আলিবর্দি খাঁ উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে আকবরনগর (রাজমহল) চাকলার ফৌজদার নিযুক্ত করলেন। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুজা-উদ-দিন ক্রমশ আলিবর্দির ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হলে এই তিনটি সুবাকে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) সুজা-উদ-দিন চারটি অংশে ভাগ করলেন। বিহারের নায়েব নাজিম পদে নিযুক্ত হলেন আলিবর্দি খাঁ, সরফরাজ খাঁ-র ওপর অর্পিত হল ঢাকার শাসনভার। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুজা-উদ-দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বাংলার মসনদে বসলেন। সরফরাজের সুবেদারির সূত্রপাতের সময়ে ভারতচন্দ্র পিতৃসম্পত্তি-বিষয়ক কাজে বর্ধমানে অবস্থান করছিলেন। বর্ধমানের সঙ্গে নবাব দরবারের সুসম্পর্ক ছিল। ফলে মুর্শিদাবাদে রাজকার্য সম্পর্কিত যে-কোন ঘটনার প্রভাব পড়ত বর্ধমানেও। অনুমান করা যায় যে ভারতচন্দ্র এই পালাবদলের ইতিহাসের খবর রাখতেন।

সরফরাজ খাঁ ছিলেন অযোগ্য শাসক। শাসন ব্যাপারে তাঁর অযোগ্যতা এবং চারিত্রিক অনৈতিকতার কারণে আলিবর্দি বাংলার সিংহাসন দখলের সুযোগ পেয়ে যান। সরফরাজের সভাসদদের মধ্যে কয়েকজনকে হাত করে আলিবর্দি সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফবাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার নবাবি মসনদ দখল করেন এবং দিল্লিতে উৎকোচ দিয়ে বাদশাহি ফরমান আনতে সমর্থ হন। আলিবর্দির এই ভূমিকা বিশ্বাসঘাতকতার নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এটাই ছিল সময়ের বাস্তব চিত্র। ইতিহাসবিদ কালীকিংকর দত্তের বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে যুগের সেই বাস্তবচিত্র :

> "It is a clear illustration of the grossly vitiated atmsphere of the age and of the effects of treachery, for ungratefulness and inordinate ambition. Alivardi's behaviour towards Sarfaraj, the son of his benefactor was certainly abominable. A Nemesis followed it when his favourite grand son and successor Siraj-ud-daulah fell a victim of the same forces which had worked to cause the ruin of Sarfaraj. It might very well be said that the battle of Plasey was the reply of divine justice to the battle of Giria."

আলিবর্দি অবশ্য নিশ্চিন্তে রাজ্যশাসন করার সুযোগ পান নি। সিংহাসনে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বর্গি হাঙ্গামার মুখোমুখি হতে হয়। বার বার বর্গি আক্রমণে বাংলার অর্থনীতি

বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের কর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এই সময় যে-সব বিত্তবানরা নবাবের অতিরিক্ত করের আদায় থেকে রক্ষা পাননি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বস্তুত কর না দিতে পারায় তাঁকেও কিছুদিন বন্দি জীবন কাটাতে হয়। পরবর্তী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্র যে ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন এটা তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যায়। আঠারো শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি স্থাপনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিশেষ অবদান ছিল। আলিবর্দির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন সিরাজ, একে Divine Justice মনে করা যেতে পারে তবে তা ঐতিহাসিক বাস্তবও, সিরাজের পতনের মধ্যে দিয়ে যা প্রমাণিত। বস্তুত মুর্শিদকুলির খাঁ-র পরবর্তী নবাবি আমলের ইতিহাস এক অর্থে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল নৈতিক অবক্ষয়, রুচির অবক্ষয়, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং সামগ্রিক একটা অস্থিরতার বাতাবরণ—সব মিলিয়ে ইতিহাসও বোধহয় পালাবদলের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়কে সেই পালাবদলের সূচনা হিসেবে দেখা যেতেই পারে। ভারতচন্দ্রের জীবন কেটেছে নবাবি আমলের এই পরিবেশে। রাজনৈতিক উত্থান-পতন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—যার কিছু কিছু উল্লেখ তাঁর কাব্যে আছে। ভারতচন্দ্র বাংলার এই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে গেলেন—এবার তা আমরা দেখব।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার মসনদে আসীন হওয়ার পর রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। যে পরিবর্তনের ফল ভোগ করতে হয় ভারতচন্দ্রের পরিবারকেও। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র পাণ্ডুয়া অধিকার করে নিলে শৈশবেই ভারতচন্দ্রকে সংকটের মুখোমুখি পড়তে হয়। অসহায় ভারতচন্দ্রকে মাতুলালয়ে চলে যেতে হয়, সেখানেই সম্পূর্ণ হয় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষান্তে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু শিক্ষার ধরন ও বিবাহসংক্রান্ত কারণে পিতৃবংশের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হলে স্ত্রীকে পিতৃগৃহে রেখে তিনি রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফারসি শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেবানন্দপুরে যান। পরে গৃহে ফিরে এসে তাঁকে বর্ধমান যেতে হয় ইজারাকৃত জমির (ভারতচন্দ্রের পিতা যা বর্ধমান-রাজের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিলেন) সালিশি করতে। সেখানে তিনি কারারুদ্ধ হন। কিন্তু কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন এবং বিভিন্ন স্থানে সন্ন্যাসবেশে ভ্রমণ করেন। সন্ন্যাসী হয়ে বিভিন্ন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে উত্তর-ভারত যাবার পথে হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুলে উপস্থিত হলে সেখানে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সহায়তায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। এই ঘটনাটি অবশ্যই ভারতচন্দ্রের জীবনে বাঁকবদলের মুহূর্ত। এরপর তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ করে জীবিকার তাগিদে ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর (ফরাসি গভর্নরের দেওয়ান) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠান। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে তাঁর রাজসভার সভাকবি নিযুক্ত করেন। সভাকবি নিযুক্ত হবার পর তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছায় *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা শুরু করেন। এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভারতচন্দ্রের অস্থির জীবনের সঙ্গে সমকালের অস্থিরতার একটা মিল যেন খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র সময়কে তাই উপেক্ষা করতে পারেন নি—রাজনৈতিক টালমাটালের চিত্র তুলে ধরেছেন *অন্নদামঙ্গল* গ্রন্থের সূচনা-অংশে :

সুজা খাঁ নবাব সুত সর্ফরাজ খাঁ। দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়। আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব। মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥

এখানে ভারতচন্দ্রের বিবরণে কিছুটা ভ্রান্তি ঘটেছে। মুর্শিদাবাদেব মসনদ দখল করার পর আলিবর্দি 'মহাবৎজঙ্গ' খেতাব পাননি। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুজা-উদ-দিন আলিবর্দি খাঁকে বিহারের নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত করার পর আলিবর্দি খাঁর জন্যে বাদশাহি দরবার থেকে এই খেতাব আনিয়ে দেন।

বিহারে নায়েব-নাজিম থাকাকালে আলিবর্দি সেখানে নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'য়ে তিনি উৎকোচ, শিষ্ট ব্যবহার এবং সুমধুর বাক্যজালে প্রধান প্রধান সভাসদদের বশীভূত ক'রে বাংলাতেও নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু উড়িষ্যায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজ হয় না। ভারতচন্দ্র লিখেছেন :

কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল। তারে গিয়া আলিবর্দি খেদাইয়া দিল।।

মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু আসন্ন—এই সংবাদ পেয়ে সুজা-উদ-দিন তাঁর এক পুত্র মুহম্মদ তকী খাঁকে কটকে নায়েব-নাজিম নিযুক্ত ক'রে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা থেকে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদে নবাবি তক্ত্ অধিকার ক'রে তিনি তকী খাঁকেই স্থায়ীভাবে উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত করেন। তকী খাঁর অকাল মৃত্যুর পর তিনি আপন জামাতা মুর্শির্দকুলি খাঁ রুস্তম জঙ্গকে সেই পদে নিয়োগ করেন। নাম সাদৃশ্য হেতু অনেকে এই মুর্শিদকুলি খাঁকে মুর্শিদাবাদেব নবাব, সুজা উদ-দিনের শ্বশুর মুর্শিদকুলি খাঁ মনে ক'রে ভুল ক'রে ফেলেন। সুজা-উদ-দিনের শাসনকাল জুড়ে মুর্শিদকুলি খাঁ উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সর্‌ফরাজ খাঁও তাঁকে সেইপদে বহাল রাখেন। কিন্তু আলিবর্দির মসনদ দখলের পর তাঁর সঙ্গে আলিবর্দির বিরোধ দেখা দিলে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বালেশ্বর অতিক্রম করে বাংলা দেশের দিকে অগ্রসর হলেন।

মুর্শিদকুলির যুদ্ধযাত্রাব সংবাদ পেয়ে আলিবর্দিও ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দের জানুযারি মাসে মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সয়ীদ আহম্মদ-মহামদ-উদ্ দৌলা সৌলৎজঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং কটক দখল করে সৌলৎজঙ্গকে নায়েব-নাজিম নিযুক্ত ক'রে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গেই ভারতচন্দ্র লিখেছেন :

কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল। তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল। ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল।।

কিন্তু সৌলৎজঙ্গের অপশাসনের সুযোগ নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে এক বিরাট ভাড়াটিয়া মারাঠা বাহিনী নিয়ে মির্জা বাখর উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রে সৌলৎজঙ্গকে পরাজিত ও বন্দি করলেন। মুর্শিদাবাদে এই দুঃসংবাদ উপস্থিত হ'লে আলিবর্দি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করলেন। ভারতচন্দ্র এই ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে। মুরাদবাখর তারে ফেলিলা ফাটকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক। শুনি মহবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥

সেটা ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়। এমন হতে পারে যে বর্ধমানের কারাগার থেকে পালিয়ে ভারতচন্দ্র তখন হয়তো উড়িষ্যাতেই অবস্থান করছিলেন।

উড়িষ্যার এই বিপর্যয়ের সংবাদ আলিবর্দির কাছে পৌঁছোলে তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করলে মির্জা বাখরও তাঁর প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কিন্তু আলিবর্দির বিশাল বাহিনীর সামনে মির্জা বাখরের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়লো, তিনি পরাজিত

হয়ে পালিয়ে গেলেন। যুদ্ধ জয়ের পরে জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামকে পেশকার নিযুক্ত ক'রে আলিবর্দি কটক ত্যাগ করলেন। এই ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র :

উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর। যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া। উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম। আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥

কিন্তু আলিবর্দি অধিককাল উড়িষ্যা নিজের অধিকারে রাখতে পারেননি। উড়িষ্যা জয় ক'রে মুর্শিদাবাদে পৌঁছোনোর আগেই বর্ধমানের কাছে মারাঠা বর্গির দল কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। এই বর্গি আক্রমণকে ভারতচন্দ্র দৈবরোষ রূপেই দেখেছেন। কারণ হিসেবে আলিবর্দির ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির লুণ্ঠনের কথা বলেছেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন :

ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান। দুর্গাসহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল। দেখিয়া নন্দীর ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥

শিব অবশ্য নন্দীকে এই কাজ করতে নিষেধ করেন—অনেক প্রাণ বিনষ্ট হবে বলে। শিবের জবানীতে ভারতচন্দ্র জানাচ্ছেন :

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়। আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনের করিব দমন। শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত। পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

বর্গি আক্রমণের সম্ভবত প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন ভারতচন্দ্র—তিনি যখন সন্ন্যাসী হয়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করছিলেন তখনই বর্গি আক্রমণ ঘটে। তাঁর বর্ণনায় তাই আক্রমণের তীব্রতা, সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং অসহায়তার চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে :

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি। আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল। গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইয়া ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল। কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী। সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥

ভারতচন্দ্র বর্গিবাহিনীর এই অবর্ণনীয় অত্যাচার-কাহিনীর কারণ খুঁজেছেন আলিবর্দির ভুবনেশ্বর লুণ্ঠনে। ভারতচন্দ্রের এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও তাঁর বর্ণনায় ঐতিহাসিক তথ্য কিন্তু উঠে এসেছে। সমকালীন আর এক কবি (গঙ্গারাম দত্ত) রচিত *মহারাষ্ট্র পুরাণ*-এ বর্গির অত্যাচারের বিবরণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে (দৈব-নিরপেক্ষ) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে ভাস্কর পণ্ডিতের বিরুদ্ধে হাওয়া ঘুরে যেতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত আলিবর্দির কূট কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হলেন। মধ্যযুগের দস্তুর অনুযায়ী গঙ্গারামের কাব্যেও দৈব্যের ব্যাপারটি একেবারে বাদ পড়েনি—ভাস্করের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে দেবী শঙ্করী রুষ্ট হয়ে গোস্বামী ও ভৈরবীদের আদেশ দেন 'ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি। 'ভারতচন্দ্র অবশ্য অত্যাচারের পেছনে দৈবের হাত দেখলেও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের বিবরণে ইতিহাসের অমোঘ সত্যকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন : 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥' ভারতচন্দ্রের এই উচ্চারণে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ইতিহাসচেতনার অমোঘ নিদর্শন।

অর্থনৈতিক পটভূমি :

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের বিভাগ অনুযায়ী বাংলা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি সুবা বা প্রদেশ। প্রতিটি সুবা থেকে সম্রাটের কাছে রাজস্ব পাঠাতে হত। কিন্তু সুবাদার ও দেওয়ানের পদ বদলি হওয়ায় বদলির সময় এবং অবসর গ্রহণকালে প্রদেশের একটা বিরাট সঞ্চয় তাঁরা নিয়ে যেতেন স্বদেশে। অর্থাৎ নিয়মিত রাজস্ব ছাড়াও এধরনের বে-আইনি সম্পদও প্রদেশের বাইরে চলে যেত। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা থেকে সম্পদ নির্গমনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার পূর্ব-সূচনা মোগল আমলেই দেখা গেল। এর ফলে প্রদেশগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি ক্রমশ কমে আসছিল। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ঔরঙ্গজেবের সময় বাংলা থেকে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব বিপুল পরিমাণে কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলাদেশে পাঠান যাতে বাংলাদেশ থেকে যথাযথ রাজস্ব-আয় পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি মহাল বা পরগনায় ভাগ করেন। পরগনা ও জমিদারগুলি ছিল চাকলার অধীন। পুরোনো জমিদারিগুলির সঙ্গে তাঁর সময়ে নতুন জমিদারিও পত্তন হয়। নীতিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল জমিদারদের, কিন্তু বাস্তবে ইজারাদাররা জমিদারদের হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে নবাবের কোষাগারে জমা দিত। অনেকটা কন্ট্রাক্ট সিস্টেম-এর মতো। ভূমিরাজস্ব ছাড়া স্বনিযুক্ত ব্যবসায়ীদেরও—ছুতোর, তাঁতি, নাপিত, ধোপা, কুমোর, স্যাকরা প্রমুখ বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের কর দিতে হত। কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করা হত—অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্যে জমিদার ও রায়তদের ওপর দৈহিক নির্যাতন ও কারাবাসের ব্যবস্থা ছিল। মুর্শিদকুলির পূর্বে আর্থিক নিষ্কাশনের কারণে বাংলাদেশ এমনিতেই আর্থিক দুর্গতির কবলে ছিল—এখন অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল। মুর্শিদকুলির আমলে তাই সম্রাটের আর্থিক আয় বাড়লেও, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দ্রারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পেল।

মুর্শিদকুলির পরে কর আদায়ের কঠোরতা কিছুটা হ্রাস পেলেও শোষণের প্রক্রিয়া লাগামহীন হয়ে পড়ে। আলিবর্দির আমলে বর্গি আক্রমণে সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। বিশাল অঙ্কের অর্থ বর্গিদের দিতে হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রতিরক্ষা ব্যয়। ফলে প্রজাদের উপর শোষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপে--যার ভার শেষ পর্যন্ত প্রজাদেরই বহন করতে হত। কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের পূর্ববর্তী তিনজন কর না দিতে পারায় কারারুদ্ধ হন। কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যতিক্রম নন। ভারতচন্দ্র জানাচ্ছেন 'মহাবদজঙ্গ' তাঁকে ধরে নিয়ে যান নজরানা হিসেবে বার লক্ষ টাকা না দিতে পারায়। বাংলার অর্থভাণ্ডারের এই সমস্ত চাপ শেষ পর্যন্ত দরিদ্র প্রজাদের ওপর পড়ত। নবাব বা ইজারাদাররা অর্থের জন্যে জমিদারদের চাপ দিত—জমিদাররা যেহেতু অনুৎপাদক শ্রেণী তাই শেষ পর্যন্ত প্রজাদেব উৎপাদন শোষণ করে রাজস্ব প্রদান করতে তাঁরা বাধ্য হতেন।

এই পিরামিড-সদৃশ শোষণতন্ত্রের ছবি সমকালেব বিভিন্ন কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে—প্রত্যক্ষভাবে, অথবা ইঙ্গিতে—রূপকের আড়ালে। রামপ্রসাদের ভক্তিসঙ্গীতে উচ্চারিত হয় : 'তোর যম কালেকটারি' বা 'প্যাদার রাজা কৃষ্ণকান্ত, তার নামেতে নিলাম জারি।' শিবায়ন (রামেশ্বর ভট্টাচার্য) কাব্যে কৃষক শিবের ক্ষেদোক্তির মধ্যে ফুটে ওঠে শোষণের বাস্তব চিত্র :

চাষ বলে ওরে চাষী আগে তোকে খাব। মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি খেতে হব॥
অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত। শুখা হাজা পড়লে পশ্চাৎ বিপরীত॥
গরীবেব ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বার করা৷ সকল বেচিয়া লয় রাজা॥

ভারতচন্দ্রে এই শোষণ-প্রক্রিয়ার এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়ে যাই। আমরা লক্ষ করব 'হরগৌরির বিবাদসূচনা', 'হরগৌরীর কন্দল', 'শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ', 'জয়ার উপদেশ'-অংশগুলি। অনুৎপাদক শ্রেণীর শোষণের কারণেই যে প্রজার দারিদ্র্য ভারতচন্দ্র তা স্পষ্ট করেছেন। ভিখারি শিব অন্নের সংস্থান করতে পারেন না। পরিবার পালনে অক্ষম শিব তখন কিন্তু সমস্ত দোষ অন্নদার ওপর চাপাতে চান, শিব-গৃহিণীও আক্ষেপ করেন স্বামীর অকর্মণ্যতায়—তিনি বাপের বাড়ি চলে যেতে চান। এ-সবই রূপকের আড়াল। আসল বাস্তবটি প্রকাশিত হয় 'জয়ার উপদেশ'-অংশে। পিতৃগৃহে গমনোদ্যতা অন্নপূর্ণাকে জয়া উপদেশ দেয় :

যা বলি তা কর নিজ মূর্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাসশিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে॥
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনিহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে॥

অন্নপূর্ণাকে জয়া উপদেশ দিচ্ছে 'অন্নপূণা' রূপ ধারণ করে 'কটাক্ষ করিয়া' তিন ভূমণ্ডলে যত অন্ন আছে তা 'হরিয়া' নিজের হেপাজতে রাখতে। এখানে অন্নপূর্ণার মধ্যে কি আলিবর্দি-কৃষ্ণচন্দ্রের ছায়া দেখা যাচ্ছে না ? তিন ভূমণ্ডলের সমস্ত অন্ন 'হরণ' করার কারণেই তো তিন ভুবনের মানুষ (শিবসহ) অন্নহীন। বাস্তবে নবাব-ইজারাদার-জমিদারদের শোষণের কারণে প্রজারা অন্নহীন। অন্নদার রূপকে সেই বাস্তবের কাহিনীই কবি বর্ণনা করেছেন। রাজসভার কবিকে তো রূপকের আড়াল নিতেই হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই একই প্রক্রিয়া চলেছে। পুঁজির মনোপলি সাধারণ মানুষের দুর্দশার কারণ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। ভারতচন্দ্র এভাবে নিজের কালের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন যেমন ঘটিয়েছেন তেমনি ভবিষ্যৎকালের ছবিটিরও আভাস দিয়েছেন—এ-কারণেই তিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি এবং *অন্নদামঙ্গল* সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থব্যবস্থায় কড়ি বেশ গুরুত্ব পেত। *অন্নদামঙ্গল*-এ দেখছি কপর্দকহীন বিষ্ণু হোড় মৌলিক কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে ঘুঁটে বিক্রি করে তাকে সংসার চালাতে হয়, 'বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে বসিতে না পান ভালো কায়স্থের কাছে'—সেই হড়িহোড় দেবী-প্রদত্ত অর্থবলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। এমন কি কুলীন কায়স্থ-কন্যাদের সঙ্গে তার বিবাহও সম্পন্ন হয়। ভারতচন্দ্র লেখেন :

ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর। বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা। বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥

অর্থকৌলীন্যের কারণে জাতিকৌলীন্য কেনার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেল ভারতচন্দ্রের কাব্যে। অর্থশক্তির এই প্রতাপ ভবিষ্যতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থের দৌলতে বৃত্তি ও জাতবদলের প্রক্রিয়াটি যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল—হরিহোড়-বৃত্তান্তে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চালচিত্রটি কবি শিবের সংলাপ ও আচরণের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করেছেন *অন্নদামঙ্গল*-এ। হর-গৌরীর কোন্দলের যে চিত্র সমকালের কবিরা বর্ণনা

করেছেন তাতে দরিদ্র-পরিবারের ছবিটি-ই স্পষ্ট হয়। গৃহস্বামীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল—উপার্জন করে সংসার প্রতিপালন। কিন্তু আঠারো শতকে সেই রোজগারের পথটি সাধারণ মানুষের কাছে খোলা ছিল না। তাই ভিক্ষায় বেরোনোর আগে শিবকে বলতে শোনা গেল :

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্ধেক চাষ
রাজসেবা বড় খচমচ।

বাণিজ্যের জন্যে পুঁজি সাধারণের করায়ত্ত ছিল না। আর চাষের উৎপাদন 'গবীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বার কর্‌্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।' পুঁজির অভাব, চাষে লাভের আশা না থাকা এবং ঝঞ্ঝাটের কারণে চাকরিজীবিকায় অনীহা—এ এক গতিহীন অর্থনীতির উদাহরণ, যেখানে টিকে থাকার লড়াই-এ দরিদ্ররা হেরে যাচ্ছিল। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে (১৭৫২) ঈশ্বরী পাটনীর কথা মনে পড়বে, যে অন্নদার কাছে মিনতি জানায় 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'—হয়তো এ-আকূতির কারণ আগামীদিনে আরও সংকটের কথা ভেবেই। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতচন্দ্রের কাব্য লেখার ১৭ বছর পরেই ঘটেছিল ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯)।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার শ্রমজীবী জনতা নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। এর মধ্যে অবশ্যই কৃষির প্রাধান্য অনস্বীকার্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুকুন্দের কাব্যে দেখা যায় কালকেতু নানাভাবে কৃষকদের আশ্বাস দিয়েছে, সেলামি-কর মুকুবের আশ্বাসও পেয়েছে কৃষকরা। অনুরূপভাবে মুর্শিদকুলিও কৃষি-ঋণ (বীজ-বলদ কেনার জন্য) দিতেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে খাজনাও মুকুব করা হত। তথাপি, বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলেও (এই সময়ে বিভিন্ন কবির বাজার বর্ণনায় দেখা গেছে বাজার নানা মূল্যবান দ্রব্যে শোভিত—কিন্তু ক্রেতা নেই) প্রশাসনিক ব্যর্থতা (বলা ভাল দুর্নীতি) ও ধনবন্টনের অসাম্যের কারণে কৃষকদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটেনি। *অন্নদামঙ্গল*-এ কোন কৃষক চরিত্র না থাকার এটাও একটা কারণ হতে পারে। শিল্প শ্রমিকরাও একভাবে শোষিত হত। নানা ধরনের শিল্পজাত সামগ্রী যে এই সময়ে তৈরি হত তার নিদর্শন সমকালের কাব্যে আছে। *অন্নদামঙ্গল*-এ দেখা যায় দেবী অন্নপূর্ণার জন্যে বিশ্বকর্মাকে অলংকার তৈজস, বস্ত্র ও সিংহাসন নির্মাণ করে দিতে। অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্য-শ্রমিকেরও অস্তিত্ব ছিল। পলাশীযুদ্ধের আগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ বেশ ভালরকমই ছিল। মুর্শিদকুলির আমল থেকে (পূর্ববর্তী সুবাদারদের আমলের মতো) একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে ওঠে— ফলে বাণিজ্য-শ্রমিকের চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে, তবে বাণিজ্য শ্রমিকদের অবস্থার পরিচয় এ-সময়ের কাব্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকের পূর্বের কবিদেব রচনায় বহির্গামী বাণিজ্যের বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের কবিদের বর্ণনায় অভ্যন্তরীণ পণ্যবাজারের কিছু বিবরণ থাকলেও বহির্বাণিজ্যের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বহির্বাণিজ্যে বাঙালির গুরুত্ব হারানোর ইঙ্গিত হিসেবেই ঘটনাটিকে দেখা যেতে পারে। মনে হয় এজন্যেই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে কোন বণিক চরিত্র নেই। চাকুরিজীবী বিভিন্ন পদের—বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গণক, মুনশি, উকিল প্রভৃতির উল্লেখ সমকালের সাহিত্যে মিলবে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন-অংশে এই পদগুলির নাম এবং যাঁরা এই সব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁদের নামও পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এইসব পদাধিকারীদের জীবনসংকটের কোন ছবি ভারতচন্দ্র আঁকেন নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চালচিত্র পর্যবেক্ষণে যে-সত্য বেরিয়ে এল তা হল নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় স্বচ্ছলতার কারণে একটা গতিশীলতা বজায় থাকলেও নগরবৃত্তের বাইরে গ্রাম-জীবন ছিল সমৃদ্ধিহীন এবং নিশ্চল। সেখানে কেবলই দারিদ্র্য—অন্নের জন্যে

হাহাকার। যুগন্ধর কবির *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে চিত্রিত হয়েছে অন্নহীন মানুষের ছবি যা কবির লেখনীর দৌলতে দেবলোকেও পৌঁছেছিল। শিবের সংসারে তাই দেখা গেল বাঙালির নিত্য-অভাবের বেদনাময় ছবি। কবি বিষ্ণু হোড়ের স্ত্রীর (দেবীর বর পাওয়ার আগে) চলমান ছবিটির মাধ্যমে ভারতচন্দ্র রচনা করলেন সমকালের বাঙালি জীবনের দুর্গতির চিত্র :

হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন। ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার। গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি। মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি॥

অষ্টাদশ শতকের নাগরিকজীবনের আপাত বৈভবের আড়ালে এটাই ছিল তৎকালীন বাংলার বাস্তব আর্থিক চিত্র।

সামাজিক পটভূমি :

আধুনিক দৃষ্টিকোণে অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে। তাই আর্থিক বনিয়াদেব পরিবর্তন ঘটলে সমাজ বদলে যায়, সমাজের মূল্যবোধও বদলে যায়, আর তখন বিশ্বাসের পরিবর্তে সংশয়ের চিহ্ন দেখা যায় সামাজিকের মনে। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীকে তাই Age of Interrogation আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। পূর্ববর্তী শতাব্দীব আর্থিক বুনিয়াদ পালটে যাওয়ার চিহ্ন অষ্টাদশ শতকেব প্রথম থেকেই ধরা পড়ছিল যার অনিবার্য প্রভাব পড়ছিল সমাজজীবনে। অষ্টাদশ শতকে সমাজজীবনে দুটি চিত্র ধরা পড়ে · একদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার, আর অন্যদিকে নাগরিক জীবন, তার নীতিহীনতা এবং অবক্ষয়ের ছবি। ধনতন্ত্রের উল্লাস তখনো অনেক দূরে, সামন্ততন্ত্রের শোষণ ও রুচিবিকার একই সঙ্গে আঠারো শতকের সমাজে তখনো বিদ্যমান। ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল* অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্য। ভারচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৬০-এ। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের একটি সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি তাঁব রচনায় ধরা আছে। শিব-পার্বতীর সাংসারিক জীবন যাত্রায় ধরা পড়েছে সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবন যাপনের ছবি—-যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নানা চিহ্ন ধরা আছে—শিবকে সেখানে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয় অন্নের জোগাড়ে অন্নপূর্ণাকে দেখা যাচ্ছে চৌর্যবৃত্তিতে রত হতে—ত্রিভুবনের সমস্ত অন্ন তাঁর ভাঁড়ারে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে আধুনিক কালের মতো মজুতদারের অস্তিত্ব সে-যুগেও ছিল। বিষয়টিকে রূপকের আড়াল দিয়েছেন কবি—শিবকে অন্নদামুখী করবার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তাতেও স্পষ্ট হয়ে যায় সমাজ-অন্তর্গত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের অবস্থা। ঈশ্বরী পাটুনীর বর প্রার্থনার ছবিটিও সমাজের ছবি হিসেবে গণ্য হতে পারে। সন্তানকে 'দুধে-ভাতে' রাখার কামনার মধ্যে দিয়ে দরিদ্র সমাজের ছবিটিই ফুটে ওঠে। এর বেশি চাইবার ক্ষমতাই বা তার কোথায়!

সমাজের অন্য একটি ছবিও কিন্তু তখন স্পষ্ট হচ্ছিল। তা হল বাঙালি মনের পর্বান্তর। ঔপনিবেশিক শাসন তখনো দূরবর্তী, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাঙালি মনের পর্বান্তর ধরা পড়ছিল নানা ভাবে। ধর্মের প্রতি আস্থা এবং বাণিজ্যের প্রসার মানবমনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে—বৃহত্তর সমাজও যার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাণিজ্য বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র ঘটানোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। বাংলার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ প্রাচীন—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার নানা নিদর্শন আছে। তবে মধ্যযুগে মানুষের মনে ধর্মের প্রতি আস্থা ছিল অধিক। কারণ সমাজ তখনও গোষ্ঠীবদ্ধ 'ইউনিট' ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রীয়প্রথা মেনে চলার একটা তাগিদ ছিল মানুষের

মনে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধর্মের এই প্রভাব কিছুটা আলগা হতে থাকে। লক্ষণীয় এই শতাব্দীর প্রায় সূচনা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা ভারতে তাদের বাণিজ্যঘাটি স্থাপন করে। বাংলায় ওলন্দাজরা কুঠি স্থাপন করেছিল চুঁচড়োয়, কাশিমবাজার, বরানগর এবং পাটনায়। জোব চার্ণকের সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের ঘটনা ১৬৯০-এ। বাণিজ্যের কারণে ইউরোপীয়দের আগমনের প্রভাব ক্রমশ সমাজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল। সপ্তদশ শতকের এই প্রক্রিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজজীবনে একটা বাঁক বদলের চেহারা কিন্তু অনেকটাই প্রত্যক্ষ হতে দেখা গেল। ধর্ম তখনো মানুষের আশ্রয়, তবুও কোথায় যেন একটা সংশয়ের ছায়া, প্রচলিত ধর্মের বিধানকে একেবারে পুরোপুরি মেনে না নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেল। বড় সাহিত্যিক-ই পারেন পরিবর্তনের এইসব প্রবণতাগুলিকে চিনিয়ে দিতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে এইসব পবিবর্তনের লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছিল।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় কবি *অন্নদামঙ্গল* রচনা করেছেন—একথা মেনে নিয়েও তাঁর রচিত কাব্যে একটা অন্য সুর পাঠকের মনের তন্ত্রীতে বেজে ওঠে। নিজেও সচেতন ছিলেন এ-বিষয়ে। অন্নপূর্ণা বন্দনা অংশে কবি নিজেই পাঠকদের জানিয়ে দিলেন : 'নূতন মঙ্গল আশে/ভারত সরস ভাষে/রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।' মঙ্গলকাব্যের প্রথা স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করা—প্রথাটি ভারতচন্দ্রও মেনেছেন তবে একটু অন্যভাবে। দেবী কবিকে স্বপ্নে দেখা দিলেন পরলোকগতা নিজের মায়ের রূপে। দেবীর স্বপ্নে দেখা দেওয়ার মধ্যে অলৌকিকতা থাকলেও, নিজের মা-কে স্বপ্নে দেখা খুবই স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ যে অলৌকিকতার নির্মোক ছেড়ে বাস্তবকে গ্রহণ করতে উদ্‌গ্রীব তা কবির নতুন পরিকল্পনার অভিনবত্বে স্পষ্ট হয়। এবারে 'হর-গৌরির কথোপকথন' অংশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। মিলনের আনন্দে শিব প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চাইছেন গৌরী-র থেকে—'ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার।/সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।' তখন গৌরী শিবকে বললেন :

হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই। শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে। হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥
হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়। সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন। পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে। তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়। অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা। কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

সম্পর্কের এই ভাষ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে শোনা যায় নি। নারীর এই কণ্ঠ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষকেই চিহ্নিত করে। সামন্ততন্ত্র নারীর ব্যক্তিসত্তাকে মূল্য দেয় না, অষ্টাদশ শতকে সামন্ততন্ত্র বজায় থাকলেও বাণিজ্যের প্রসারের কারণে বৃত্তিজীবী মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল, স্বভাবতই ব্যক্তিচেতনাও বাড়ছিল। মানুষ এখন আর শ্রেণী হিসেবে বিচার্য নয়, ব্যক্তি হিসেবে বিচার্য। গৌরী নারী হিসেবে তাঁর অবস্থানটি চিনিয়ে দিয়েছেন শিবকে, সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও। প্রসঙ্গত এই কথোপকথনে আরও দুটি বিষয় উঠে আসছে : সহমরণ প্রথা ও পুরুষের বিপথগামিতার বাস্তব। এ ছাড়া গৌরীর পুরো বক্তব্যে যে শ্লেষের পরিচয় আছে তার ভাষাও সম্ভবত এই শতকের।

* আলোচনার প্রথমেই আমরা বলেছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটা সংশয়ের আবহ বিরাজমান ছিল, বস্তুত দেবতার দয়ার ওপর মানুষ সম্ভবত আর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেনা।

রাজনৈতিক টালমাটাল, বর্গি আক্রমণ, বিপর্যস্ত আর্থিক অবস্থা এর কারণ হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তব। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যেও এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। রামপ্রসাদের ভক্তিগীতির মধ্যেও মাঝে মাঝেই এই সংশয়ের প্রকাশ ঘটেছে। এই শতকে লেখা শিবায়ন কাব্যে শিবের দেব মহিমার চিহ্নমাত্র নেই। কৃষিজীবী শিব সুযোগ পেলেই পরনারীতে আসক্ত হয়ে পড়েন (হর-গৌরীর কথোপকথনে গৌরীর উক্তিও তার সাক্ষ্য দেয়)। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়-পর্বে এ-রকমটাই সম্ভব। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যে যার অজস্র উদাহরণ আছে। মধ্যযুগের (অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বচিত) মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা দেখেছি দেবীর অসীম ক্ষমতা আর ভক্তের প্রতি দাক্ষিণ্য বিতরণেও দেবী অ-কৃপণ। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবীর দয়ায় শ্রীমন্ত সিংহলরাজের রোষ থেকে মুক্তি পেয়েছে। বেহুলা ফেরৎ পেয়েছে মৃত স্বামীর প্রাণ, চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর কাছে কালকেতু সাতঘড়া ধন পেয়েছে, দেশের রাজাও হয়েছে। অর্থাৎ সেই যুগে দৈবী কৃপায় এবং দাক্ষিণ্যে মানুষের আস্থা ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেহেতু সমাজ-মানসে ইহলোক চেতনা বাড়ছিল তাই দৈব বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা যাচ্ছিল। দৈবশক্তির কার্যকারিতায় একটা সংশয়ের ছায়া মানুষের মনোলোককে কিছুটা হলেও আচ্ছন্ন করেছিল। সুমিতা চক্রবর্তী ঈশ্বরী পাটনীর দেবীর কাছে বর চাইবার মধ্যে অবিশ্বাসজনিত সংশয়ের ছাপ লক্ষ করেছেন। ঈশ্বরী পাটনী দেবীব কাছে প্রর্থনা জানিয়েছে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' এই বিনীত প্রার্থনাকে দেবীর ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকলেও সন্তানের পিতাব এই প্রার্থনার মানবিক দিকটি অ-প্রকাশিত থাকে না। সুমিতা চক্রবর্তী ঠিকই বলেন, "এই উচ্চারণে প্রায় সকলেই অনুভব করেছেন মানবতার মহৎ ও স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি। সন্তানের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা—এর বেশি আর কী চাইবার আছে মানুষের।" *(অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য: পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা* গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত সুমিতা চক্রবতীর প্রবন্ধ : 'বাঙালি মনের পর্বান্তব আধুনিকতা ও আঠারো শতক') আমাদের বক্তব্য অষ্টাদশ শতকের সমাজ যে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে তার একটা ছবি এখানে স্পষ্ট।

মধ্যযুগের পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দী দেশ-কালচেতনায় অনেকটাই অগ্রবর্তী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গুজরাট নগব বা মনসামঙ্গলকাব্যে সিংহলের কিন্তু বাস্তব গুজরাট বা সিংহলের সঙ্গে কোন যোগ নেই। মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত উজানি ও চম্পানগর সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দেশ-কালের পটভূমি একেবারেই বাস্তব। ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে গ্রন্থসূচনা অংশটিতে ইতিহাস পরিক্রমা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটিকে চিহ্নিত করেছেন। *বিদ্যাসুন্দর* খণ্ডে বর্ণিত বর্ধমান-কে চিনে নিতে পাঠকের কোন অসুবিধেই হয় না। এটাও এক অর্থে সমাজজীবনের বিন্যাসগত দিক থেকে বিচার করা যায়। এ বিষয়ে সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে "ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর ও মানিকরাম-ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'-এর নিরিখে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আঞ্চলিকতাকে এই কবিরা কাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণে এই প্রথম প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন।" [তদেব]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় সহনশীলতা। মধ্যযুগে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কোন্দল সাহিত্যেও ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ভেদাভেদ অনেকটাই কমে এসেছিল। ভারতচন্দ্র অন্নদার সেবক হয়েও কৃষ্ণ-প্রীতি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত ছিলেন না, রামপ্রসাদ কালীভক্ত হয়েও শ্যামা ও শ্যাম-কে অভেদ রূপে কল্পনা করেছেন, আবার রামের ভক্ত ঘনরাম লিখছেন ধর্মমঙ্গল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রায় অনায়াসেই এই ধর্মসমন্বয় সম্ভব হয়েছিল—সমাজের সচলতার প্রমাণ

হিসেবেই একে দেখতে হয়, পূর্ববর্তী শতাব্দীর সমাজ-ভাবনায় যার পরিচয় প্রায় অমিল।

এতক্ষণের আলোচনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজের ইতিবাচক দিকগুলি দেখানো হল, এখন ঐ শতকের নেতির দিকগুলি আলোচনা করবো। সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে নগ্ন রুচিহীনতার যে প্রকাশ দেখা গিয়াছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। রাজদরবাবের রুচিহীনতা, কামনা-বিলাস, নীতিহীন জীবন জনজীবনে ভালমতো প্রভাব ফেলছিল। *অন্নদামঙ্গল*-এ বর্ণিত নলকুবর-এর কাহিনী তারই নিদর্শন। যেখানে অন্নদার পুজো না কবে কেন নলকুবর রমণী সম্ভোগে মত্ত তার ব্যাখ্যা করছে এই ভাষায়

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক
এ বস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥

বিদ্যাসুন্দব কাব্যে এই অনৈতিকতার ছবিটি বিস্তার পেয়েছে। সমাজ সেদিন 'কড়ি'-ব মহিমায় বাঁধা ছিল- তারই অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে এই পংক্তিগুলিতে

কড়ি ফটকা চিঁড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥

কামিনী ও কাঞ্চন যে সেদিন সমাজকে বেঁধে রেখেছিল তাব প্রমাণ এই পঙক্তিগুলি। নারীগণেব পতিনিন্দা অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোটা সমাজটাই উঠে এসেছে কবিব লেখনীতে। এই পতিরা সমাজেব বিভিন্ন বৃত্তিব মানুষজন—কেউ কেউ আবার রাজার সভাসদ। 'কৃষ্ণচন্দ্রেব সভাবর্ণন' অংশে কবি এদের বৃত্তির পরিচয় দিয়ে তাদের চরিত্র অনাবৃত করেছেন তাদের পত্নীদেব জবানীতে। এদেব মধ্যে বখ্‌শি-পত্নীর বয়ানে (নিন্দার) শ্লেষের চূড়ান্ত রূপটি প্রকাশিত। স্বামীর কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে মর্মের সব জ্বালাটুকু উজার করে দিয়েছে বখ্‌শি-পত্নী ·

পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে। ঘরে গরহাজিরা সে না পায় দেখিতে।
ফেবেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকিফুঁকি লেখে। কেবল আমাব গুণে পুত্রমুখ দেখে॥

নারীগণের পতিনিন্দার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বৃত্তিজনিত সঙ্কটের চেহারাটি কবি যেমন দেখালেন তেমনি এই শতকেব নারীদের সামাজিক অবস্থানটিও স্পষ্ট করলেন। এখানে হীরার কুট্টনী বৃত্তির কথাও স্মরণে আসে। অর্থের বিনিময়ে হীরার কুট্টিনী বৃত্তিকে বেছে নেওয়ার কারণ অবশ্যই জীবনধারণের অনিবার্যতায়। বৃত্তিগত সংকটের চেহারা ভারতচন্দ্রের কাব্যে বার বার উঠে এসেছে—সমাজের বাতাবরণটি তখন এরকমই ছিল।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি—রাজসভার বিলাস-বৈভব, জীবন-সম্ভোগের উপকরণ প্রাচুর্য, চোখ ধাঁধানো আলোকজ্জ্বল পরিবেশে তাঁকে কাব্যরচনা করতে হয়েছিল—সেই পরিবেশের অন্তঃসারশূন্যতা যেমন তার কাব্যে বর্ণিত হয়েছে তেমনি সমাজের অন্য প্রান্তের ছবিও তাঁর রচনায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুত অষ্টাদশ শতক তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে—ভারতচন্দ্রের কাব্য তাই সব অর্থেই সমাজের দর্পণ—যেখানে শুধুই চলমান মানুষের শোভাযাত্রা।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

শব্দার্থ ও টীকা

গণেশবন্দনা

গণেশায় নমঃ নমঃ : আদিব্রহ্ম নিরুপম : পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর : গজমুখ লম্বোদর : মহাযোগী পরমসুন্দর॥
বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে : তোমার অর্চ্চনা আগে : তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি : বিশ্বের জনক তুমি : সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে : দুর্গারে জননী কয়ে : ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া : সংসার সমুদ্র পিয়া : খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি : পুন কর বিশ্ব সৃষ্টি : ভাল খেলা খেল দয়াময়॥
বিধি বিষ্ণু শিব শিবা : ত্রিভুবন রাত্রি দিবা : সৃষ্টি পুন করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম : তুমি জপ কোন্ ব্রহ্ম : তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু : জানিতে না পারি কভু : বিধি হরি হর নাহি জানে।
তব নাম লয় যেই : আপদ এড়ায় সেই : তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে॥
আমি চাহি এই বর : শুন প্রভু গণেশ্বর : অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর : বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর : ইথে পার তবে সে পাইব॥
আপনি আসরে উর : নায়কের আশা পূর : নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে : ভারত সরস ভাষে : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **পরাৎপর**—মহতের থেকে মহৎ ; **বিঘ্নরাজ**—দেবতাদের অনুরোধে দৈত্যদের ক্রিয়া-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য শিব গণেশকে সৃষ্টি করেন বলে গণেশের নাম 'বিঘ্নরাজ'; **বিধি হরি হর**—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ; **চতুর্ব্বর্গ**—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ; **ইথে**—এতে; **উর**—অবতীর্ণ হও; **নায়কের**—এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বোঝাচ্ছে।

শিববন্দনা

শঙ্করায় নমঃ নমঃ : গিরিসুতাপ্রিয়তম : বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন : সুশোভিত ত্রিনয়ন : ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ : হর শোক হর পাপ : হিমকরশেখর শঙ্কর॥
গলে দোলে মুণ্ডমাল : পরিধান বাঘছাল : হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনীযোগিনীগণ : প্রেত ভূত অগণন : সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥
অতিদীর্ঘ জটাজূট : কণ্ঠে শোভে কালকূট : চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার : ফণিময় অলঙ্কার : শিরে ফণী ফণী উপবীত॥
যোগীর অগম্য হয়ে : সদা থাক যোগ লয়ে কি জানি কাহার কর ধ্যান।
অনাদি অনন্ত মায়া : দেহ যারে পদছায়া : সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব : মায়াযুক্ত তুমি জীব : কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায় : অনায়াসে জ্ঞান পায় : যারে তুমি দেহ পদছায়া॥
নায়কের দুঃখ হর : মোর গীত পূর্ণ কর : নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে : ভারত সরস ভাষে : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **গিরিসুতাপ্রিয়তম**—গিরিরাজ হিমালয়-কন্যার প্রিয়তম অর্থাৎ শিব; **হুতাশন**—অগ্নি; **ত্রিনয়ন**—শিবের তিন নেত্র ; **ত্রিগুণ**—সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ ; **ত্রিশূল**—সূর্যের শানিত তেজ, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ও ইন্দ্রের বজ্রে নির্মিতি; **ত্রিপুরারি**—ত্রিপুর

ধ্বংসকারী, মহাদেব ; **হিমকরশেখর**—হিমাংশু বা চন্দ্র যার কপালে শোভা পায়, অর্থাৎ মহাদেব; **কালকূট**—সমুদ্রমন্থনকালে বাসুকী-উদ্‌গারিত বিষ।

সূর্য্যবন্দনা

ভাস্করায় নমঃ : হর মোর তমঃ : দয়া কর **দিবাকর**।
চারি বেদে কয় : ব্রহ্ম তেজোময় : তুমি দেব পরাৎপর।।
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা : বেদে নাহি সীমা : অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে।।
বিশ্বের কারণ : বিশ্বের লোচন : বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্ব দেবময় : সর্ব্ব বেদাশ্রয় : আকাশ পাতাল ভূমি।।
একচক্র রথে : আকাশের পথে : উদয়গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি : এক দিনে ফিরি : কে পারে শক্তি কহিতে।।
অতিখর কর : পোড়ে মহীধর : সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে : হাসে হৃষ্টমনে : তোমার তত্ত্ব কে পায়।।
দ্বাদশ মূরতি : গ্রহগণপতি : **সংজ্ঞা ছায়া** নারী ধন্যা।
শনি যম মনু : তব **অঙ্গজনু** : যমুনা তোমার কন্যা।।
বিশ্বের রক্ষিতা : বিশ্বের সবিতা : তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার : মোরে কর পার : করিএ কোটি প্রণাম।।
কোকনদোপর : থাক নিরন্তর : অশেষ গুণসাগর।
বরাভয় কর : ত্রিনয়ন ধর : মাথায় মাণিকবর।।
স্মরিলে তোমায় : পাপ দূরে যায় : আসরে সদয় হবে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে : চাহিবে স্বরূপে : ভারতচন্দ্রের স্তবে।।

শব্দার্থ ও টীকা : **ভাস্করায়**—যিনি আলোকিত করেন, অর্থাৎ সূর্য; **দিবাকর**—সূর্য; **একচক্র রথে**—যে-রথে (সপ্ত অশ্ববাহিত) সূর্য উদয়াগিরি থেকে অস্তগিরি ভ্রমণ করেন; **দ্বাদশমূরতি**—সূর্যের দ্বাদশ মূর্তি : অরুণ, সূর্য, বেদজ্ঞ, তপন, ইন্দ্র, রবি গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু; **সংজ্ঞা ছায়া**—সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার কন্যা এবং সূর্যের স্ত্রী। সংজ্ঞা স্বামীর তীব্র তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজের অনুরূপ একটি মেয়েকে (ছায়া) তৈরি করে সূর্যের কাছে রেখে দিয়ে পালিয়ে যান। ছায়াকেই সূর্য সংজ্ঞা বলে জানতেন। **অঙ্গজনু**—যার জন্ম অঙ্গ থেকে।

বিষ্ণুবন্দনা

কেশবায় নমঃ নমঃ : পুরাণ পুরুষোত্তম : চতুর্ভূজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদঘটা : **হৃদয়ে কৌস্তভছটা** : **বনমালা** নানা আভরণ।।
কৃপা কর কমললোচন।
জগন্নাথ মুরহর : পদ্মনাভ গদাধর : মুকুন্দ মাধব নারায়ণ।।
রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন : লক্ষ্মীকান্ত সনাতন : হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন।
শ্রীনিবাস দামোদর : জগদীশ যজ্ঞেশ্বর : বাসুদেব **শ্রীবৎসলাঞ্ছন**।।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ : সুশোভিত চারি ভুজ : মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ : নিরুপম কোকনদ : রতন নূপুর বাজে তায়।।

পরিধান পীতাম্বর : **অধর বান্ধুলীবর** : মুখসুধাকরে সুধা হাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী : **নাভিপদ্মে প্রজাপতি** : রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব : চারি দিকে করে স্তব : সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে : মোহিত যে গুণগানে : পঞ্চ মুখে গান **পঞ্চানন**॥
কদম্বের কুঞ্জবনে : বিহর সানন্দ মনে : শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর : বসন্ত কুসুমশর : নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব : কুহরে কোকিল সব : পূর্ণ চন্দ্র শরদযামিনী।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে : গান করে কামতন্ত্রে : **ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী**॥
উর প্রভু শ্রীনিবাস : নায়কের **পূর** আশ : নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
ভারত ও পদ আশে : নূতন মঙ্গল ভাষে : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **বরণজলদ ঘটা**—ঘন মেঘের মতো; **হৃদয়ে কৌস্তুভচ্ছটা**—সমুদ্রমন্থনে পাওয়া মণি যা বিষ্ণুর বক্ষে শোভা পায়; **বনমালা**—শ্রীকৃষ্ণধৃত আজানুলম্বিত মালাবিশেষ ; **জগন্নাথ**—জগতের নাথ, বিষ্ণুর অন্য নাম; **মুরহর**—মুর নাম দৈত্যকে যিনি (বিষ্ণু) বধ করেছেন; **শ্রীবৎসলাঞ্ছন**—বুকে ভৃগুর পদচিহ্নধারণকারী বিষ্ণুর অন্য নাম; **অধর বান্ধুলীবর**—অধরে লাল বাঁধুলীফলের শোভা। লাল বাঁধুলীফলের সঙ্গে মেয়েদের অধরের (লাল ঠোঁট) তুলনা করা হয়; **নাভিপদ্মে প্রজাপতি**—পুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের যুগ শেষ হলে প্রলয় হবে। প্রলয়ের শেষে ১২০ ব্রহ্ম বছর পৃথিবী জীবশূন্য থাকবে। এই সময় শব্দহীন অনন্ত শূন্যে জলের ওপর বিষ্ণু একটি বটের পাতায় ঘুমিয়ে থাকবেন। নতুন সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষ্ণুর পুনরায় আবির্ভাব হবে। এই সময় বটের পাতায় শুয়ে বিষ্ণু ভাবছিলেন কে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি। এই সময় চতুর্ভুজা দেবী বিষ্ণুকে দেখা দিয়ে বললেন যে, তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্মফুল ফুটে উঠবে—সেই পদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব হবে। ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকবেন—বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি ক্ষমতা দান করবেন। **পঞ্চানন**—শিবের আর এক নাম; **ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব**—ভ্রমরের আওয়াজ; **ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী**—ছয়টি রাগের নাম যথাক্রমে ভৈরব, শ্রী, মেঘ, কৌশিক, হিন্দোল ও দীপক। এদের প্রত্যেকের ছটি করে মোট ছত্রিশটি রাগিণী আছে। **পূর**—পূরণ কর।

কৌষিকীবন্দনা

কৌষিকি কালিকে : চণ্ডিকে অম্বিকে : প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি : মুণ্ডনিপাতিনি : **শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি**॥
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষমর্দ্দিনি : **দুর্গবিঘাতিনি** : **রক্তবীজনিকৃন্তিনি**॥
দিনমুখরবি : **কোকনদ** ছবি : অতুল পদ দুখানি।
রতননূপুর : বাজয়ে মধুর : ভ্রমরঝঙ্কার মানি॥
হেমকরিকর : **উরু** মনোহর : রতন কদলিকায়।
কটি ক্ষীণতর : নাভি সরোবর : অমূল্য **অম্বর** তায়॥
কমল কোরক : কদম্বনিন্দক : **করিসুতকুম্ভ** উচ্চ।
কাঁচুলি রঞ্জিত : অতি সুশোভিত : অমৃতপূরিত কুচ॥
সুবলিত ভুজ : সহিত **অম্বুজ** : কনক মৃণাল রাজে।

নানা আভরণ : অতি সুশোভন : কনক কঙ্কণ বাজে।।
কোটি শশধর : বদন সুন্দর : ঈষদ্ মধুর হাস।
সিন্দুরমার্জ্জিত : মুকুতারঞ্জিত : দশনপাঁতি প্রকাশ।।
সিন্দুর চন্দন : ভালে সুশোভন : রবি শশী এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা : কি দিব উপমা : ত্রিভুবনে হেন নাই।।
শিরে জটাজুট : রতন মুকুট : অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতীমালায় : বিজুলি খেলায় : ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে।।
কহি জোড়করে : উরহ আসরে : ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে : রাখ রাঙ্গা পায়ে : অভয় দেহ অভয়া।।

শব্দার্থ ও টীকা : **কৌষিকি**—মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে কাত্যায়নীর দেহকোষজাত দেবী—তাই নাম কৌষিকী ইনি শুম্ভ নিশুম্ভকে হত্যা করেন; **দুর্গবিঘাতিনি**—দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন; **রক্তবীজনিকৃন্তিনি**—রক্তবীজ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন; **কোকনদ**—পদ্ম; **হিমকরিকর**—স্বর্ণময় হস্তিদণ্ডের মতো; **অম্বর**—বসন; **মৃণাল**—পদ্মের ডাঁটা বা নাল; **করিসুতকুম্ভ উচ্চ**—হস্তিশিশুর মাথার মাংস পিণ্ডদ্বয়ের মতো উঁচু; **অম্বুজ**—পদ্ম; **উরহ**—আবির্ভূত হও।

লক্ষ্মীবন্দনা

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী : ব্রহ্মার জননী : কমলা কমলালয়া।।
সনাল কমল : সনাল উৎপল : দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন : কমল ভূষণ : কমলমাল ললিত।।
কমল চরণ : কমল বদন : কমল নাভি গভীর।
কমল দু কর : কমল অধর : কমলময় শরীর।।
কমলকোরক : কদম্বনিন্দক : সুধার কলস কুচ।
করি অরি মাজে : জিনি করিরাজে : কুম্ভযুগচারু উচ।।
সুধাময় হাস : সুধাময় ভাষ : দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ।
লাক্ষার কাঁচুলি : চমকে বিজুলি : বসন লক্ষ্মীবিলাস।
রূপ গুণ জ্ঞান : যত যত স্থান : তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ : নাহি জানে দুখ : যে তব ভকতিলোভা।।
সদা পায় দুখ : নাহি জানে সুখ : তুমি হও যারে বাম।
সবে মন্দ কয় : নাম নাহি লয় : লক্ষ্মীছাড়া তার নাম।।
তব নাম লয়ে : লক্ষ্মীপতি হয়ে : ত্রিলোক পালেন হরি।
যাদোগণেশ্বর : হৈলা রত্নাকর : তোমারে উদরে ধরি।।
যে আছে সৃষ্টিতে : নাম উচ্চারিতে : প্রথমে তোমার নাম।
তোমার কৃপায় : অনায়াসে পায় : ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।।
উর মহামায়া : দেহ পদছায়া : ভারতের স্তুতি লয়ে।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে : থাক সদা হাসে : রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে।।

শব্দার্থ ও টীকা : **সনাল**—ডাঁটা সমেত; **করিঅরি**—সিংহ; **লাক্ষা**—কীটদেহনিসৃত লাল রস; **যাদোগণেশ্বর**—জলজন্তুদের অধিপতি, সমুদ্র; **রত্নাকর**—সমুদ্র; **তোমারে উদরে ধরি**—লক্ষ্মী সমুদ্র-সম্ভূত—এমনটাই বলা হচ্ছে।

সরস্বতীবন্দনা

উর দেবি সরস্বতি : স্তবে কর অনুমতি : **বাগীশ্বরি** বাক্যবিনোদিনি।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস : শ্বেত বীণা শ্বেত হাস : শ্বেতসরসিজনিবাসিনি॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র ; বেনু বীণা আদি যন্ত্র : নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ : সেবা করে অনুক্ষণ : ঋষি মুনি **কিন্নর কিন্নরী**॥
আগমের নানা গ্রন্থ : আর যত গুণপন্থ : চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত : কবি সেবে অবিরত : তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান॥
ছত্রিশ রাগিণী মেলে : ছয় রাগ সদা খেলে : অনুরাগ যে সব রাগিণী।
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম : **মূর্চ্ছনা একুশ নাম** : **শ্রুতি কলা** সতত সঙ্গিনী॥
তান মান বাদ্য **তাল** : নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল : তোমা হৈতে সকল নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে : তোমার করুণা বিনে : কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে : সবে মূঢ় বলে তারে : ধিক ধিক তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে : সবে ধন্য বলে তারে : গুণিগণে তাহার গণন॥
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া : পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া উর : নায়কের আশা পূর : দূর কর কুজ্ঞান সকল॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি : গীতে দিলা অনুমতি : করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয় : না জানি কেমন হয় . ভারতের ভারতী ভরসা॥

শব্দার্থ ও টীকা : **বাগীশ্বরী**—বাগ্দেবী, সরস্তীর অন্য নাম; **গন্ধর্ব**—দেবযোনী বিশেষ, স্বর্গের গায়ক ; **অপ্সর**—নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, দেবসভাব নর্তকী ও গায়িকা। এরা গন্ধর্বের স্ত্রী রূপেও পরিচিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে স্বর্গে অভিনয় করার জন্য ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করেছিলেন; **কিন্নর কিন্নরী**—এদের দুটি ভাগ—এক ভাগে মুখ ঘোড়ার মতো দেহ মানুষের, অপর ভাগে মুখ মানুষের দেহ ঘোড়ার—এরা নৃত্য বিশারদ, মধুরকণ্ঠ—বাদ্য এদের অত্যন্ত প্রিয়; **আগম**—বেদাদি আপ্তবাক্য, তন্ত্রশাস্ত্রের আর এক নাম। মহাদেবের মুখ থেকে 'আগ'ত পার্বতীর কানে 'গ'ত ও বাসুদেবের 'ম'ত সম্মত বলে নাম 'আগম' শাস্ত্র; **সপ্তস্বর**—ষড়ঙ্গ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদি—এই সাতটি স্বর সপ্তস্বর হিসেবে পরিচিত; **তিন গ্রাম**—উদারা, মুদারা ও দার—এই তিনটি স্বরগ্রাম; **মূর্চ্ছনা একুশ নাম**—স্বরগ্রামের সুরের আরোহণ ও অবরোহণ—এই আরোহণ-অবরোহণ ক্রমভেদ অনুসারে ২১ রকমের হতে পারে; **শ্রুতি**—স্বরগ্রামে একস্বর থেকে অন্য স্বরের মধ্যের সূক্ষ্ম অংশ; **কলা**—ছন্দ মাত্রা; **তান**—যার দ্বারা মূর্চ্ছনাসহ গীত প্রয়োগ করা হয়; **মান**—তালের বিরামস্থান—সম, বিষম, অতীত ও অনাগত; **তাল**—নৃত্যগীত-বাদ্যের কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণ।

অন্নপূর্ণা বন্দনা

অন্নপূর্ণা মহামায়া : দেহ মোরে পদছায়া : কোটি কোটি করিএ প্রণাম।
আসরে আসিয়া উর : নায়কের আশা পূর : শুন আপনার গুণগ্রাম॥
কৃপাবলোকন কর : ভক্তের **দুরিত হর** : দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ।
তুমি দেবী পরাৎপরা : সুখদাত্রী দুঃখহরা : অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ॥
রক্তসরসিজোপরি : বসি পদ্মাসন করি : পদতলে নবরবি দেখা।
রক্তজবাপ্রভাহর : অতিমনোহরতর : **ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ** উর্দ্ধরেখা॥
কিবা সুবলিত উরু : কদলীকাণ্ডের গুরু : নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।

শোভে নিরুপম বাস : দশ দিশ পরকাশ : ত্রিভুবনমোহনকারিণী॥
কটি অতি ক্ষীণতর : নাভি সুধাসরোবর : উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ রাজে : নানা অলঙ্কার সাজে : প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ॥
কিবা মনোহর কর : মৃণালের গর্ব্বহর : অঙ্গুলী চম্পকচারুদল।
ফণিরাজফণমণি : কঙ্কণের কণকণি : নানা অলঙ্কার ঝলমল॥
বাম করতলে ধরি : কারণ-অমৃত ভরি : পানপাত্র রতন নির্ম্মিত।
রত্ন হাতা ডানি হাতে : সঘৃত পলান্ন তাতে : কিবা দুই ভুজ সুললিত॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় : নানা রস অপ্রমেয় : বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া **কৃত্তিবাস** : মধুর মধুর হাস : মহেশের নাচন দেখিয়া॥
দেবতা অসুর রক্ষ : অপ্সর কিন্নর **যক্ষ** : সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর : সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর : **নবগ্রহ দিক্‌পাল** দশ॥
জিনি কোটি শশধর : কিবা মুখ মনোহর : মণিময় মুকুট মাথায়।
ললিত কবরীভার : তাহে মালতীর হার : ভ্রমর ভ্রমরী কল গায়॥
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন : আদি দেব ঋষিগণ : চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ : না জানে তোমার ভেদ : তুমি দেবী পুরুষ প্রধান॥
ঘটে কর অধিষ্ঠান : শুন নিজ-গুণগান : নায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর : রাজ্যের আপদ হর : গায়কের কণ্ঠে কর বাস॥
স্বপনে রজনীশেষে : বসিয়া শিয়রদেশে : কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি : নূতন মঙ্গল কহি : পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে : কত গুণ কর অল্পে : নিজ গুণে হবে **বরদায়**।
নূতন মঙ্গল আশে : ভারত সরস ভাষে : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

শব্দার্থ ও টীকা : **দুরিত**—পাপ; **রক্তসরসিজোপরি**—রক্তপদ্মের ওপর। **ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ**—বিষ্ণু চরণের তিনটি চিহ্ন—ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ ; **ফণিরাজফণমণি**—সাপের মাথার মণি; **কৃত্তিবাস**—বাঘের চামড়া যিনি পরিধান করেন—মহেশ্বর; **যক্ষ**—দেবযোনি বিশেষ—কুবেরের অনুচর। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বিকৃত মুখ, চোখ পিঙ্গল—বলা হয়েছে অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে রাগ করে ব্রহ্মা অন্ধকারে এদের সৃষ্টি করেছিলেন; **নবগ্রহ**—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। ধরে নেওয়া হয় রবি ও সোমের মতো মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি অন্যান্য নভোচারী গ্রহও পৃথিবীতে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটিয়ে থাকে। রাহু ও কেতু দুষ্ট গ্রহ হিসেবেই পরিচিত। এরা যেহেতু অল্পবিস্তর বিপদজনক গ্রহ হিসেবে প্রতিভাত তাই এদের স্বস্ত্যয়নে পুজো দেবার ব্যবস্থা আছে। **দিকপাল**—দিকগুলির অধিপতি; **বরদায়**—বরদাত্রী।

গ্রন্থসূচনা

অন্নপূর্ণা **অপর্ণা** অন্নদা **অষ্টভুজা**। **অভয়া অপরাজিতা** অচ্যুত অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা **অম্বা অম্বিকা** অজয়া। অপরাধ **ক্ষম** অগো **অব** গো অব্যয়া॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব। যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব॥
সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ। দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়। আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব। মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ্‌কুলি খাঁ নবাব ছিল। তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥

কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল। ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল।।
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে। মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে।।
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক। শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক।।
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর। যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর।।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া। উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া।।
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম। আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম।।
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান। দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান।।
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরত্ম্য করিল। দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল।।
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল। করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল।।
নিষেধ করিল শিব ত্রিশূল মারিতে। বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে।।
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর। না ছাড় সংহারশূল সংহর সংহর।।
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়। আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়।।
সেই আসি যবনের করিবে দমন। শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন।।
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত। পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত।।
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি। আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল। গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইল ধন **ঝিউড়ী বহুড়ী**।।
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল। কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল।।
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী। সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী।।
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।।
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি।।
প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাসিয়া। রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।।
রাজা রাজচক্রবর্তী ঋষি ঋষিরাজ। **ইন্দ্রের** সমাজ সম যাঁহার সমাজ।।
কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান। উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান।।
দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়। এহ পাপে সেহ রাজা ঠেকিলেন দায়।।
মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়। নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়।।
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ। **সাজোয়াল** হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।।
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন। নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন।।
বদ্ধ করি রাখিলেন মুরশিদাবাদে। কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে।।
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর। বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর।।
চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব। অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব।।
অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া। স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।।
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়। এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।।
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ। কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস।।
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়।।
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়।।
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও। রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে। অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে।।
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়।।
সেই আজ্ঞা মত কবি রায় গুণাকর। অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর।।

শব্দার্থ ও টীকা : **অপর্ণা**—শিবের তপস্যার সময় উমা পত্রভক্ষণও ত্যাগ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় অপর্ণা; **অষ্টভূজা**—মহাসরস্বতী—যাঁর আট হাতে ঘণ্টা, শূল, শঙ্খ, চক্র, লাঙ্গল, মুষল, ধনু ও বাণ থাকে; **অভয়া**—অভয় দান করেন বলে পার্বতীর অন্য নাম অভয়া; **অপরাজিতা**—চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমা। বিজয়া দশমীর দিন এঁর পূজো হয়; **অম্বা**—কাশীরাজ হিরণ্যবর্ণের বড় মেয়ে—ইনি ভীষ্মকে বিয়ে করতে চান—ভীষ্ম রাজি হন না, তখন ভীষ্মকে হত্যা করার মানসে মহাদেবের তপস্যা শুরু করেন, মহাদেব বর দেন যে, প্রথমে তিনি নারী হয়ে দ্রুপদের ঘরে জন্মাবেন, পরে পুরুষ হয়ে ভীষ্মকে হত্যা করবেন। ইনিই মহাভারতে বর্ণিত শিখণ্ডী—যাকে সামনে রেখে অর্জুন পিতামহ ভীষ্মকে নিহত করেন—এইভাবে অম্বা ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হন; **অম্বিকা**—বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী—নিঃসন্তান অবস্থায় বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হলে সত্যবতী ব্যাসদেবকে নির্দেশ দেন অম্বিকার গর্ভ উৎপাদন করতে—ব্যাসের চেহারায় ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করেছিলেন ফলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়; **অব**—রক্ষা কর ; **গারী**—ঘর-সংসার; **ঝিউড়ী বহুড়ী**—পরস্পর সংযুক্ত শব্দ—বৌ ঝি ; **ইন্দ্র**—ঋক্‌বেদে আর্যদের প্রধান দেবতা—তবে পরবর্তীকালে ইন্দ্রের প্রাধান্য কমতে থাকে; **দেবীপুত্র**—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবছর দুর্গা পুজো করতেন বলে প্রজারা তাঁকে ঐ নামে ডাকতেন; **সাজোয়াল**—প্রজাদের কাছ থেকে যে রাজকর্মচারী জোর করে কর আদায় করত। **চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া**—চৌত্রিশ চরণের আদ্যক্ষরে বর্ণানুক্রমে দেবীর স্তব—চৌতিশা নামে পরিচিত।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

নিবেদন অবধান কর সভাজন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥
চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে। কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল। কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন। পঞ্চ দেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার। চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই। ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়। মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম। সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী। আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম। মুখটী অনন্তরাম চট্ট বলরাম॥
বলরাম **চট্টসুত** ভাগিনা রাজার। সদাশিব রায় নাম শিব অবতার॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যের সুত। রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণদাম। **বাঁড়ুরি** গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥
মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার। পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার।
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর **চাটুতি**। তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন। কৃষ্ণানন্দ **মুখয্যা** পরম যশোধন॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর। মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর॥

প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়। শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়॥
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ। কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়। মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড়॥
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি। আর যত গণক গণিতে কি শকতি॥
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়। জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধায়॥
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ। হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ॥
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি। রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনশী প্রধান। তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান॥
কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি। মৃদঙ্গী সমজ্ঞ খেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্ত্তকপ্রধান শেরমামুদ সভায়। মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥
ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন। চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর। জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর॥
ভূপতির তীরেব ওস্তাদ নিরুপম। মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণসম॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেনসুত। ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত। ভোজপুরে সোয়ার বোঁদেলা শত শত॥
কুল্ল মালে বঘুনন্দন মিত্র দেয়ান। তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়। দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায়॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম। ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ। আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥
রত্নগজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়। উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান। হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা। খাড়ি জুড়ী আদি কবি দপ্তর গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার॥
ফরমানী মহারাজ মনসবদার। সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ। পাতশাহী শিরপা সুলতামী সুলতানৎ॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল। সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে। ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা। প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা॥
কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া। ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে। স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী। তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে। মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত। কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিল বাছা না করিহ ভয়। আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে। যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা। সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

শব্দার্থ ও টীকা : **চন্দ্রে...ষোলকলা**—ব্রহ্মা চন্দ্রকে ষোল ভাগে (কলায়) ভাগ করেন। এদের মধ্যে এক কলা শিবের মাথায় যাবে বাকি ১৫ কলা অমৃতা, মানদা, পুষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, সঙ্গিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা নিয়ে

চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধি হবে ; **চন্দ্রের...কলঙ্ক**—রাজসূয় যজ্ঞের পর চন্দ্র অহঙ্কারী ও কামাসক্ত হয়ে বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করেন। অপমানিত হয়ে তারা শাপ দেন চন্দ্র কলঙ্কী, মেঘাচ্ছন্ন, রাহুগ্রস্ত ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবেন।

দুই পক্ষ...সিত—চন্দ্রের দুই পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ—পুরাণে বলা হয়েছে দক্ষের ২৭টি কন্যার সঙ্গে চন্দ্রের বিবাহ হয়। এদের মধ্যে রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা ছিলেন, এই নিয়ে অন্য মেয়েরা দক্ষের কাছে অভিযোগ জানালে দক্ষ শাপ দেন—ফলে চন্দ্র তথা সমস্ত পৃথিবী ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মার অনুরোধে দক্ষ জগতের হিতার্থে চন্দ্রের ১৫ দিন ক্ষয় ও ১৫ দিন বৃদ্ধির নির্দেশ দেন; **চট্টসূত**—চট্টোপাধ্যায় বংশীয় সন্তান; **বাঁড়ুরি**—বন্দ্যোপাধ্যায়; **চাটুতি**—চট্টোপাধ্যায়; **মুখুয্যা**—মুখোপাধ্যায় ; **সহবতি**—অন্তরঙ্গ; **বক্সী**—সেনা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা; **খানেজাদ**—পুরুষানুক্রমে এক বংশের ক্রীতদাস; **শিরপা**—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গের জন্যে পাঁচখানি বিভিন্ন বস্ত্র ; **বোঁদেলা**—বুন্দেলখণ্ড থেকে আগত সৈন্য ; **কুল মালে**—সমস্ত রাজস্ব; **দেয়ান**—রাজস্ব সচিব; **পেশকার**—বিচারকের কাছে কাগজপত্র উপস্থানকারী কর্মচারী, তবে এখানে জরিপ করা জমির হিসেব লিখে রাখে—এমন কর্মচারীকে বোঝাচ্ছে; **আমীন**—জমি জরিপ করার কর্মচারী; **হাবশী**—আবিসিনীয় কৃষ্ণাঙ্গ দাস—মধ্যযুগে এরা ভারতে আসে, **খাড়ি**—জলাভূমি ; **ফরমানী...মনসবদার**—বাদশাহর লিখিত হুকুম অনুসারে যিনি মনসবদার হন ; **কাঙ্গুরা**—সরু উচ্চ চূড়া; **আড়ানী**—চাঁদোয়া; **মোরছল**—ময়ূরের পালকে তৈরি পাখা; **সরপোচ**—পাগড়ির ওপর মূল্যবান কাপড়; **কলগী**—পাগড়ির সামনে বাঁধা পাখির পালক; **তোষহ**—তুষ্ট করা।

গীতারম্ভ

অন্নপূর্ণা মহামায়া : সংসার যাঁহার মায়া : পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা : আপনি আপন সমা : সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান : অকর্ণ শুনিতে পান : অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি : মুখ বিনা বেদ পড়ি : সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানলরবি : প্রকাশি আপন ছবি : অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত **কারণ জলে** : বসি স্থল বিনা স্থলে : বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
গুণ সত্ত্বতমোরজে : **হরিহরকমলজে** : কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর : তিন জনে পরস্পর : করেন কারণ জলে জপ॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব : জানাইতে নিজ তত্ত্ব : শবরূপা হইলা কপটে।
পচাগন্ধ মাংস গলে : ভাসিয়া কারণ জলে : আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে॥
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি : উঠি গেলা ঘৃণা করি : বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচা গন্ধে ভাবি দুখ : ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ : চারি মুখ হইলা বিধাতা॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব : শিবের জানিতে তত্ত্ব : শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই : বসিতে হইল ঠাঁই : যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম : তাহাতে বসিল মর্ম্ম : ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি : দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি : ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥
বিধির মানস সুত : দক্ষ মুনি তপযুত : প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া।
তার গর্ভে সতী নাম : অশেষ মঙ্গল ধাম : জনম লভিলা মহামায়া॥

নারদ ঘটক হয়ে : নানামত বলে কয়ে : শিবেরে বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ : দেখি দক্ষ ঋষিরাজ : **বামদেবে** হৈলা **বামমতি**॥
সদা শিব নিন্দা করে : মহাক্রোধ হৈল হরে : সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম · না লয় শিবের নাম : সদা নিন্দা করে কটু ভাষে।
আরম্ভিয়া দেবযাগ : নিমন্ত্রিল দেবভাগ : নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।
যাইতে দক্ষের বাস : সতীর হইল আশ : ভারত কহিছে জোড় করে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **কারণ জলে**—সৃষ্টি সমুদ্রে ; **হরিহরকমলজে**—বিষ্ণু মহেশ্বর ও ব্রহ্মা ; **বামদেব**—শিব , **বামমতি**—বিরূপ।

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো।
অন্নদা ভুবনা বলা : মাতঙ্গী কমলা · দূর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা : জগতের সারা : উন্মুখী বগলা ভীমা ধুমা ভীতিহরা গো।
রাধানাথের দুঃখভবা : নাশ গো সত্বরা . কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন। যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে। নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম। আমারে না দিবে ভাগ এই তাব কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কব বেশ॥

কালীরূপা

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা **দন্তুরা**। শবারূঢ়া **করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা**॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে। গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ। দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বর দান॥
লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দু পাশে। ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **দন্তুরা**- বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট; **করকাঞ্চী**—নর করে যাঁর কটিবাস (কাঞ্চী) তৈরি; **শবকর্ণপুরা**- কালীর কর্ণভূষণ—শিশুশব।

তারারূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ। তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা। সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ **একজটা** বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচ খানি শোভিত কপাল। ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ **কাতি** সমুণ্ড **খর্পর**। চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **একজটা**—অন্য নাম নীলতারা, বৌদ্ধ মহাকাল মতানুসারে একজন শক্তিশালী দেবী; **কাতি**—কাটার অস্ত্র ; **খর্পর**—খড়্গ।

রাজরাজেশ্বরী

দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি। রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর। চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ। পঞ্চপ্রেত নিরমিত বসিবার মঞ্চ॥

ভুবনেশ্বরী

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা। হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা।।
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ। পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ।।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল। মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল।।

ভৈরবীরূপা

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে। ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে।
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল আসনা। মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা।।
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর। ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর।।
শব্দার্থ ও টীকা : অক্ষমালা—রুদ্রাক্ষমালা।

ছিন্নমস্তা

দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত। ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত।।
বিকসিত **পুণ্ডরীক** কর্ণিকার মাজে। তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে।।
বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি। **কোকনদবরণা** দ্বিভূজা দিগম্বরী।।
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে। খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে।।
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার। এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার।।
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী। দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী।।
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন। অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন।।
শব্দার্থ ও টীকা : পুণ্ডরীক—পদ্ম; **কর্ণিকা**—পদ্মের বীজকোষ; **কোকনদবরণা**—কমলাবরণ।

ধূমাবতী

দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন। ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন।।
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন। **কাকধ্বজরথারূঢ়া** ধূমের বরণ।।
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা। এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা।।
শব্দার্থ ও টীকা : কাকধ্বজরথারূঢ়া—কাকচিহ্ন আঁকা ধ্বজাযুক্ত রথে যিনি আরূঢ়।

বগলামুখী

ধূমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা। হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা।।
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা। পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা।।
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি। আর হস্তে মুদগর ধরিয়া উর্দ্ধ করি।।
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন। ললাটমণ্ডল চন্দ্রখণ্ড সুশোভন।।

মাতঙ্গী

দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া। পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া।।
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি। চতুর্ভূজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি।।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে। চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে।।

মহালক্ষ্মী

মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান। মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান।।
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ। দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ।।

চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে। রত্ন ঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥
ভারত কহিছে মা গো এই দশ রূপে। দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥

সতীর দক্ষালয়গমন

এ কি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া। সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥
নিগম আগমে তুমি নিরুপমকায়া। ত্রিগুণজননী পুন ত্রিদেবের জায়া॥
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে সহায়া। ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥

পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈলা হর। কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়। কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে। পূর্ব্ব সর্ব্ব জ্ঞান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেব দেখ মনে। প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিন জনে তোমরা কারণ-জলে ছিলা। তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে। শবরূপে আইলাম। ভাসিতে ভাসিতে॥
পচা গন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ। বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন। প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলা তুমি আমার ভজনে। সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥
এত শুনি শিবের হইল চমৎকার। প্রকাশ করিলা **তন্ত্র মন্ত্র** সবাকার॥
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হইলা সতী। গৌর বর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মুরতি॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়। যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে। রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীয়বরণ। কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন॥
আহা মরি বাছা সতি কালী হইয়াছ। ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে। শিবনিন্দা শুনে তুমি শরীর ছাড়িবে॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ। তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়। জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া। যজ্ঞ দেখিবারে গেল সত্বরা হইয়া॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে। শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বর্ণিবে। নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **নিগম**—আগমে শিবমুখ থেকে নির্গত তন্ত্রশাস্ত্র ; **তন্ত্রমন্ত্র**—তন্ত্রশাস্ত্রের অন্য নাম আগম নিগম বা রহস্য—যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধনা করলে জীব মোক্ষ লাভ করে সেই শাস্ত্রকে তন্ত্রশাস্ত্র বলে।

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ

সভাজন শুন : জামাতার গুণ : বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই : যেথা সেথা ঠাঁই : সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান : সুস্থান কুস্থান। অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম : নাহি মানে কর্ম্ম : চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে : কুক্কুরে আপনে : শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল : তবু না মরিল : ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥

সুখে দুঃখ জানে : দুঃখে সুখ মানে পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে : কারে নাহি মানে : সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ : কি আছে লক্ষণ · বেদাচারবহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয়কথন : না হয় ঘটন : জটা ভষ্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় : চাষী কেন নয় : নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা : দ্বিজ দেয় সেবা : নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায় : ভিক্ষা মাগি খায় : না করে অতিথিসেবা।
সতী ঝি আমার : গৃহিণী তাহার : সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে : নাহি লয় চিতে : কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনীবিহারী : নহে ব্রহ্মচারী : এ কি মহাপাপ হর॥
সতী ঝি আমার বিদ্যুৎ আকার বাতুলের হৈলা জায়া।
আমি অভাজন : পরম ভাজন : ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতী : কি দেখি দুর্গতি : অন্ন বিনা হৈলা কালি।
তোমার কপাল : পর বাঘছাল : আমার রহিল গালি॥
শিবনিন্দা শুনি : রোষে যত মুনি : দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া : চলিলা উঠিয়া : শ্রবণে কর আচ্ছাদি॥
তবু পাপ দক্ষ : নিন্দি কত লক্ষ : সতী সম্বোধিয়া কহে।
তার মৃত্যু নাই : তোর নাহি ঠাঁই : আমার মরণ নহে॥
মোর কন্যা হয়ে : প্রেত সঙ্গে রয়ে : ছি ছি এ কি দশা তোর।
আমি মহারাজ : তোর এই সাজ : মাথা খেতে আলি মোর॥
বিধবা যখন · হইবি তখন : অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে : তার মুখ না দেখিব॥
শিবনিন্দা শুনি : মহাদুঃখ গুণি : কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর : কি শকতি ধর : কেন বাপা হেন মতি॥
যারে কালে ধরে : সেই নিন্দে হরে : কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজনু : তেজিব এ তনু : তবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় : গালিতে কি হয় : মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল · যজ্ঞ যাবে তল : তোর রক্ষা আর নাই॥
যে মুখে পামর : নিন্দিলে শঙ্কর : সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া : শরীর ছাড়িয়া : উত্তরিলা হিমাচল॥
হিমগিরিপতি : ভাগ্যবান অতি : মেনকা তাহার জায়া।
পূর্ব্বতপবরে : তাহার উদরে : জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে : নন্দী মহা রাগে : সত্বরে গেলা কৈলাসে।
শূন্য রথ লয়ে : শোকাকুল হয়ে : নিবেদিলা কৃত্তিবাসে॥
শুনিয়া শঙ্কর . শোকেতে কাতর : বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে **নিজগণ** : করিলা গমন : করিতে দক্ষদমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় : রাজা ইন্দ্রপ্রায় : অশেষগুণসাগর।
তাঁর অভিমত · রচিলা ভারত : কবি রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **বনস্থ**—বনে বাস করে যে সন্ন্যাসী; **যারে কালে ধরে**—যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত; **নিজগণ**—শিব গণদেব, সেই গণেদের (সঙ্গীদের) সঙ্গে করে।

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।।
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা।।
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে। দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।।
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে।।
দলম্মল্ দলম্মল্ গণ্ডে মুণ্ডমালা। কটীকট্টসদ্যোমরা হস্তিছালা।।
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে। মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে।।
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে। উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।।
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা। হুহুঙ্কারে হাঁকে উড়ে সর্পবাণা।।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী। মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।।
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্তকেশে।।
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে। কথা না সবে দক্ষরাজে তরাসে।।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।।

শব্দার্থ ও টীকা . **গাজে**—গর্জন করে; **কটিকট্ট** কটিদেশের মধ্যস্থান; **হস্তিছাল**- হস্তিচর্ম - কটিদেশের মধ্যেস্থান হস্তিচর্ম আবৃত **পিনাক** -শিবধনু; **দানা**- –দানব, **ত্রিশূলী** - ত্রিশূলযুক্ত শিব অনুচর; **ভুজঙ্গপ্রয়াত**- সংস্কৃত ছন্দ—এই ছন্দে প্রতি চরণে ১২টি অক্ষর এবং লঘু গুরু ক্রমানুসারে তিনটি অক্ষর বার বার আবর্তিত হয়।

দক্ষযজ্ঞনাশ

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।।
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে। ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে।।
সৈন্যসূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি। জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি।।
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া। যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া।।
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি। দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি।।
রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া। ঘোরবেশে মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্গিয়া।।
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিণ্ডিল। পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল।।
বিপ্র সর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে। ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে।।
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে। হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে।।
যক্ষ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে। ঊর্দ্ধহাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে।।
মার মার ঘের ঘের হান হান হাঁকিছে। হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে। হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে।।
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে। লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে।
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে। ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে।।
হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মুতিছে। পাদ ঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হস্তি পুঁতিছে।
বাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হুল থূল কূল কূল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে। কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে।।
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে। ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে।।

শব্দার্থ ও টীকা . **প্রেতভাগ**—প্রেতেরা; **আত্মগায়**—নিজের অনুচরদের প্রতি; **ভার্গবের**—দক্ষের পুরোহিত; **পূষণের**—সূর্যের; **হব্য কব্য**—ঘৃত ইত্যাদি হোমদ্রব্য এবং পিতৃগণের

তৃপ্তির জন্যে উৎসর্গীকৃত অন্নাদি; **সর্পি**—ঘৃত; **হাস্যতুণ্ড**—হাসিমুখ; **ব্রহ্মডিম্ব**—ব্রহ্মাণ্ড; **তূণক**—সংস্কৃত ছন্দ—প্রতিটি চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে—গুরু ও লঘু অক্ষরের আবর্তনক্রম যথাক্রমে; গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + গুরু + লঘু + গুরু। প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা ২৩।

প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন

শিবনাম বল রে জীব বদনে। যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥
শিবনাম লয়ে মুখে : তরিব সকল দুখে : দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব : কোথায় তুলনা দিব : জীব শিব হয় শিব সেবনে॥
শিব শিব বলে যেই : এই দেহে শিব সেই : শিব নিজপদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর : পাপ তাপ সব হর : ভারতে রাখহ হর ভজনে॥

এইরূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়। প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায়॥
বিধি বিষ্ণু দুই জন নিজ স্থানে ছিলা। দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা॥
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর। দক্ষবাসে শিব পাশে আইলা সত্বর॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া। প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ। শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ॥
দূর গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়। প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী। অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই। সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়। সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ। দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল। যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি। ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী॥
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার। তথাপি বিধবা দশা হইল আমার॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি। তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়। আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা। রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা॥
ধরে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়। উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে **কবন্ধের** প্রায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ। প্রসূতি বলিছে প্রভু এ কি বিড়ম্বন॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা। কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব। ইহারে উচিত নহে এতেক **রৌরব**॥
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ। কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥
শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিলা হাসিয়া কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ। ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়। যেমন করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া। মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর। শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর। তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥

তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও। পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম। না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥
বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল। নিন্দিবার চিহ্ন রৈল.বদন ছাগল॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে হইয়া। যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর। বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন। গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিলা গদাধর। সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি। কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর। মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব। বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
একমত না হয় পুরাণমত যত। আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **কবন্ধ**—মুণ্ডগ্রীবাহীন দেহ; **চক্রপাণী**—বিষ্ণু—বিষ্ণুর হাতে চক্র থাকে বলে বিষ্ণুর আর এক নাম চক্রপাণি।

পীঠমালা

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে॥

ভূতময় দেহ : নবদ্বার গেহ : নরনারীকলেবরে।
গুণাতীত হয়ে : নানা গুণ লয়ে : দোঁহে নানা খেলা করে।॥
উত্তম অধম : স্থাবর জঙ্গম : সর্ব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে : দেহিদেহরূপে চরে॥
অভেদ হইয়া : ভেদ প্রকাশিয়া : এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের : কি করে এ ফের : কবি রায় গুণাকরে॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেলিলা কেশব। দেবতা কোট্টবী ভীমলোচন ভৈরব॥১
শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব [বৈভব?]। মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব॥২
সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা। ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা॥৩
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অনুভব। দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব॥৪
ভৈরব পর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়।। নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায়॥৫
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে। বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষরূপ যাহে॥৬
জনস্থানে চিবুক পড়িল অভিরাম। বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম॥৭
গোদাবরীতীরে পড়ে বাম গণ্ডখানি। বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী॥৮
গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায়। চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায়॥৯
উর্দ্ধ দন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম। সংক্রুর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম॥১০
পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্তসার। মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার॥১১
করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তাঁর। বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥১২
শ্রীপর্ব্বতে ডানি কর্ণ ফেলিলেন হরি। ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী॥১৩
কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ। উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ॥১৪
কিরীটকোণায় পড়ে কিরীট সুরূপা। ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ॥১৫

শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী। সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি॥ ১৬
কাশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়। ত্রিসন্ধ্য ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায়॥১৭
রত্নাবলী স্থানে ডানি স্কন্ধ অভিরাম। কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম॥১৮
মিথিলায় বাম স্কন্ধ দেবী মহাদেবী। মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি॥ ১৯/
চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব। ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব॥২০
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মানসরোবরে। দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে॥২১
উজানীতে **কফোণি** মঙ্গলচণ্ডী দেবী। ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি॥২২
মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার। স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর॥২৩
প্রয়াগেতে দু হাতের অঙ্গুলী সরস। তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ॥২৪ ইং ৩৩
বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব। বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব।
মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধে অভিরাম। সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম॥
জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন। ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ॥৩৬
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে। শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে॥৩৭
বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ। দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্ব সিদ্ধি সাথ॥৩৮
উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ যাহা সেবি। জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী॥৩৯
কাঞ্চী দেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম। বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম॥৪০
নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাঁহার। অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর॥৪১
নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়। ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায়॥৪২
মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়। রাবানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায়॥৪৩
নেপালে দক্ষিণ জঙঘা কপালী ভৈরব। দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব॥৪৪
জয়ন্তায় বাম জঙঘা ফেলিলা কেশব। জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব॥৪৫
দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়। নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়॥৪৬
ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব। যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব॥৪৭
কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানি পার। নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তার॥৪৮
কুরুক্ষেত্রে ডানি পার গুলফ্ অনুভব। বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব॥৪৯
বিভাসেতে বাম গুলফ্ ফেলিলা কেশব। ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব॥৫০
তিরোতায় পড়ে বাম পদ মনোহর। অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর॥৫১
শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান। হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

শব্দার্থ ও টীকা : নবদ্বার—মানবদেহের দুই চক্ষু, দুই কান, দুই নাসিকারন্ধ্র, মুখ, পায়ু ও উপস্থ.
কফোণি—কনুই।

[বিশদ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

শিববিবাহের মন্ত্রণা

উমা দয়া কর গো। বিষম শমনভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি। কাতর হয়েছি অতি। পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন : শুনিয়া না দেহ মন : গুহ গজাননে বুঝি ডর গো
তুমি গো তারিণী তারা : অসার সংসার সারা : নানারূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস : পূরাও তাহার আশ : তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর। মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর।৫…

ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব। শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥
নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব। মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা। মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা॥
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার। বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ। তবে সে **শর্ব্বের** হবে সংসার নির্ব্বাহ॥
আকাশবাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ। নারদেরে ডাকিয়া কহিলা **হৃষীকেশ**॥
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও। উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও॥
একে তো নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ। শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ॥
জনকের জননীর দেখিব চরণ। আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন॥
মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান। ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান॥

শব্দার্থ ও টীকা : **অমর**--দেবতা; **শর্ব্বের**--পাপনাশক শিব; **হৃষীকেশ** শিবের অপর নাম।

নারদের গান

জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি
শৈলসুতে করুণানিকরে।
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি .
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে॥
জয় কালি কপালিনি মস্তকমালিনি .
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌষিকি ভারত ভীতিহরে॥

শিববিবাহের সম্বন্ধ

এরূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া। উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাহিয়া॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে। চৌষট্টি **যোগিনী** কুমারীর বেশ সঙ্গে॥
মৃত্তিকার হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া। সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার। এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম। আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে। নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভর্ৎসনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়। আমারে প্রণাম কর, উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে। দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে। তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি। ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে। পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥
আনিব এমন বর বায়ে নড়ে দাঁত। ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত॥
বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে। কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আল্যা কবি কোলে বসি **ছেঁদে ধরি** গলে। ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া। ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হৈতে বুড়া এক **ডোকরা** বামন। প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥

নিষেধ কুরিনু তারে প্রণাম করিতে। কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥
দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান। বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া। দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ। সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে। সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়। কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে। অখিল ভুবন মাতা জানিতে কে পারে॥
বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা। শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে। ভবানী হলেন উমা পার পাব ভবে॥
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি। জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়। লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **আল্যা**—আদর করে ; **ছেঁদে ধরি**—জড়িয়ে ধরে : **চৌষট্টি যোগিনী**—এঁরা দেবী দুর্গার সখী অনুচরী—দুর্গাপূজার সময় এঁদের পুজো করা হয়—কালিকাপুরাণে ৬৪ যোগিনীর নাম উল্লেখিত হয়েছে; **ডোকরা**—পাঁড়াগাঁয়ের গালি বিশেষ—পুরুষকেই এই গালি দেওয়া হয়; **কন্দলিয়া**—ঝগড়ুটে; **লগ্নপত্র**—বিবাহের তারিখ ঠিক করার চুক্তিপত্র।

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম

শিবের সম্বন্ধ : করিয়া নির্ব্বন্ধ : আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন : আদি দেবগণ : পরম আনন্দ শুনি॥
সকলে মিলিয়া : শিব কাছে গিয়া : বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান : দেখি চিন্তাবান : হইলা বিধি কেশব॥
মন্ত্রণা করিয়া : মদনে ডাকিয়া : সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন বাণ : করিয়া সন্ধান : শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় : রতিপতি ধায় : পুষ্পশরাসন হাতে।
সমুখে সামন্ত : ধাইল বসন্ত : কোকিল ভ্রমর সাতে॥
মলয় পবন ; বহে ঘন ঘন : শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরু লতাগণ : ফুলে সুশোভন : জগতে লাগিল ধন্দ॥
যত দেবগণ : হৈল অদর্শন : হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব নিয়োজন : নিকট মরণ : মদন সমুখে রয়॥
আকর্ণ পুরিয়া : সন্ধান করিয়া : সম্মোহন বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি : দিল বাণ ছাড়ি : অনলে পতঙ্গ হয়ে॥
কিবা করে ধ্যান : কিবা করে জ্ঞান : যে করে কামের শর।
সিহরিল অঙ্গ : ধ্যান হৈল ভঙ্গ ; নয়ন মিলিলা হর॥
কামশরে ত্রস্ত : নারী লাগি ব্যস্ত : নেহারেন চারিপাশে।
সমুখে মদন : হাতে শরাসন : মুচকি মুচকি হাসে॥
দেখি পুষ্পশরে : ক্রোধ হৈল হরে : অটল অচল টলে।
ললাটলোচন : হৈতে হুতাশন : ধক ধক ধক জ্বলে॥
*মদন পলায় : পিছে অগ্নি যায় : ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া : মদনে পুড়িয়া : করিল ভস্মের রাশি॥

মরিল মদন : তবু পঞ্চানন : মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া : নারী তপাসিয়া : ফিরেন সকল স্থানে।।
কামে মত্ত হর : দেখিয়া অপ্সর : কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া : পশ্চাত তাড়িয়া : ফিরেন শিব চঞ্চল।।
মনে মনে হাসি : হেন কালে আসি : নারদ হইলা সমুখ।
নারদে দেখিয়া : সলজ্জ হইয়া হর হৈলা হেঁটমুখ।।
খুড়া খুড়া কয়ে : দণ্ডবত হয়ে : কহিছে নারদ হাসি।
দক্ষগৃহ ছাড়ি : হেমন্তের বাড়ি : জনমিলা সতী আসি।।
বিবাহ করিয়া : তাঁহারে লইয়া : আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন : ওরে বাছাধন : ঘটক হও তাহার।।
মুনি কহে দ্রুত : সকলি প্রস্তুত : বর হয়ে কবে যাবা।
কহেন শঙ্কর : বিলম্ব না কর : আজি চল মোর বাবা।।
শুনি মুনি কয় : এমন কি হয় সর্ব্ব দেবগণে কহ।
প্রায় হয়ে বুড়া : ভুলিয়াছ খুড়া : দিন দুই স্থির রহ।।
শান্ত হৈলা হর : যতেক অমর : এল যথা পশুপতি।
কামের মরণ : করিয়া শ্রবণ : কান্দিয়া আইলা রতি।।
কৃষ্ণচন্দ্র রায় : রাজা ইন্দ্রপ্রায় : অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত : রচিলা ভারত : কবি রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা : **সম্মোহন বাণ**—পঞ্চবাণের একটি; **পুষ্পশরাসন**—ফুলধেনু; **তপাসিয়া**—খুঁজে।

রতিবিলাপ

পতিশোকে রতি কাঁদে : বিনাইয়া নানা ছাঁদে : ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে : রুধির বহিছে ধারে : কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে।।
আলু থালু কেশবাস : ঘন ঘন বহে শ্বাস : সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ : আমারে করহ সাথ : তোমা বিনা সকলি আঁধার।।
তুমি কাম আমি রতি : আমি নারী তুমি পতি : দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল : শেষে তাহা না রহিল : পিরীতির এ নহে বিধান।।
যথা যথা যেতে প্রভু : মোরে না ছাড়িতে কভু : এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া : ভাল গেলা ছাড়াইয়া : এখন বুঝিনু মিছা খেলা।।
না দেখিব সে বদন : না হেরিব সে নয়ন : না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী : পশ্চাতে মরিব আমি : এত দিন ইহা নাহি জানি।।
আহা আহা হরি হরি : উহু উহু মরি মরি : হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান : করিতে কতেক মান : এখন দেখিতে আর নাই।।
শিব শিব শিব নাম : সবে বলে শিবধাম : বাম দেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে : তার দৃষ্টে প্রভু মরে : এমন না দেখি কোন কালে।।
শিবের কপালে রয়ে : প্রভুরে আহুতি লয়ে : না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে : আরের কপাল দহে : আগুনের কপালে আগুন।।
অনলে শরীর ঢালি : তথাপি রহিল গালি : মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার : উপায় না দেখি আর : মরিলেহ নাহি অব্যাহতি।।

অরে নিদারুণ প্রাণ : কোন্ পথে পতি যান : আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে : মনঃশিলা পাছে বাজে : হৃদে হরি লহ রে বহিয়া॥
অরে রে মলয় বাত : তোরে হৌক বজ্রাঘাত : মরে যা রে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও : বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও : প্রভু বধি সবে পলাইলা॥
কোথা গেলা সুররাজ : মোর মুণ্ডে হানি বাজ : সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি : আমি তাহে দেহ গালি : অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম॥
বিরহ সন্তাপ যত : অনলে কি তাপ তত : কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয় : কাঁদিলে কি আর হয় : এই ফল বিরহীর শাপে॥

রতির প্রতি দৈববাণী

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়। হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন। শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন॥
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার। কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥
রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া। তাঁর গর্ভে এই কাম জন্মিবে গিয়া॥
শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জ্জন। মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে। লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে॥
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন। জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন॥
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়। মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে। হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥
মৎস্যে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া। না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥
সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে। ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥
কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে। তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥
পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ। মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত॥
শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ। শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান॥
শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে। কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে॥
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া। নিবায় অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া॥
কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ। বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ॥
শিবের বিবাহ সব শুন ইতঃপর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **শম্বর**—দানব—মদনদেব একে হত্যা করেন। **নিয়োজন**—নির্ধারিত; **তপোধন**-তপস্যা যার ধন—এখানে নারদকে গৌরবান্বিত করা হচ্ছে।

শিব বিবাহ যাত্রা

শিবের বিবাহ : পরম উৎসাহ : সবে হৈলা যত্নবান
পরম সন্তোষে : দুন্দুভি নির্ঘোষে : ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান॥
নিজগণ লয়ে : বরযাত্র হয়ে : চলিলা যত অমর।
অপ্সর নাচিছে : কিন্নর গাইছে : পুলকিত মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা পুরোহিত : চলিলা ত্বরিত : বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে : মরত ভুবনে : চলে যত রাজগণ॥
কুবের ভাণ্ডারী : যক্ষগণ ভারি : নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল : আপনি অনল : হইলা আতস বাজি॥

নারদ রসিয়া : হাসিয়া হাসিয়া : সাজাইতে গেলা বর।
বসি ছিলা হর : উঠিলা সত্বর : নারদ কহে তৎপর॥
জটুজুটে চূড়া : সাপে বান্ধ খুড়া : মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় : হাড়ের মালায় : কন্যার মা হবে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে : চন্দনে কি করে : ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে : যে শোভা ফণীতে : হেন বর কোথা পাই॥
ফুলমালা যত : শোভা দিবে কত : যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা : জগমনোলোভা : যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ হস্তী আর : কি কাজ তোমার : যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ : কব কোটি গুণ : আমি মেনকার কাছে॥
অধিক করিয়া : সিদ্ধি মিশাইয়া : ধুতুরা খাইতে হবে।
যাবত বিবাহ : না হবে নির্ব্বাহ : উপবাস তবে সবে॥
এরূপ করিয়া : বর সাজাইয়া : হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ : ধায় অগণন : আন্ধার কৈল ধুলায়॥
ঝুপ ঝুপ ঝাপ : দুপ দুপ দাপ : লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম : হাঁকে হুম হাম : জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার : বিকট আকার : সহিতে না পারে আলো।
থাবায় থাবায় : মশাল নিবায় : আন্ধারে শোভিল ভালো॥
করতালি দিয়া : বেড়ায় নাচিয়া : হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি : করে জড়াজড়ি : লক লক লক জিহি॥
করে চড়াচড়ি : ধায় রড়ারড়ি : কিলাকিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে : কে কারে পাছাড়ে : কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপড়িয়া : গিরি উখাড়িয়া : কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ : লইয়া জীবন : পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায় : অন্য কেবা তায় : দেখিয়া আনন্দ হবে।
আগে ভাগে হরি : বিধি সঙ্গে করি : গেলা হেমন্তের ঘরে॥
হিমগিরিরাজ : করিয়া সমাজ : বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া : শিঙ্গা বাজাইয়া : এল বর ভূতনাথ॥
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র : বলে এ কেমন বর।
বরযাত্রগণে : দেখি ভয় মনে : না সরে কারো উত্তর॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায় : রাজা ইন্দ্রপ্রায় : অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত : রচিলা ভারত : কবি রায় গুণাকর।

শব্দার্থ ও টীকা : **কুবের**—ধন ঐশ্বর্যের দেবতা; **ভাণ্ডারী**—রসদের ভাণ্ডার যাঁর অধিকারে থাকে; **কস্তুরী**—সুগন্ধযুক্ত মৃগনাভি, **কেশর**—পুষ্পরেণু; **উখাড়িয়া**—উৎপাটন করে।

শিববিবাহ

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥

লক লক ফণী জটবিরাজ
তক তক তক রজনিরাজ :
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনীবোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল
প্রমদ প্রথম সঙ্গিয়া।।
ভভম ভবম ববম ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেই বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ
পুলকে পূরল সকল দেশ
ভারত যাচত ভকতিলেশ
সরস অবশ অঙ্গিয়া।।

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে। বসিয়াছে দানসজ্জা বাম দিকে লয়ে।।
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন। পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ।।
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান। সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান।।
বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি। ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি।।
কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে। ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে।।
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া। গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া।।
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম। তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম।।
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত। হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত।।
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ। কিবা গোত্র কয় বা প্রবব বর কহ।।
হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা। বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা।।
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর। পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর।।
শিব গোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর। শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর।।
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা। স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা।।
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে। নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে।।
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া। শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া।
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া। লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া।।
বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা। পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা।।
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া। মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া।।
বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর। এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর।।
মেনকা দেখিল চেয়ে জামাই লেঙ্গটা। নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।।
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই। মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই।।
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়। শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।।
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ। মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ।।

শুন শুন এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও। কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও॥
মেনকা নারদবাক্যে দুনা মনদুখে। পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়। আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ও রে বুড়া **আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে**। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ। নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥
ভারত কহিছে আর কি আছে আটক। কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক॥

শব্দার্থ ও টীকা : **ভূতশুদ্ধি**—শুভ অনুষ্ঠানের প্রাথমিক শাস্ত্রাচার; **নিছনি ডালা**—আরতি বা বরণডালা; **সামাই**—মিশে যাই; **আঁটকুড়া**—সন্তানহীনা: **নারদা**—নারদকে ব্যঙ্গ করে সম্বোধন; **অল্পেয়ে**—অল্পায়ু।

কন্দল ও শিবনিন্দা

আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা ·
তামার শলা বুড়ার জটা :
তাই বেড়িয়া ফোফায় ফণী :
দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া :
বুড়ার দাড়ি শণের লুড়া :
ছারকপালে ছাইকপালে :
দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার :
বুড়ার গলে হাড়ের ভার :
কেমনে করে ও মা উমা :
করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়েব চূড়া :
ভাঙ্গড় পাগল ওই লো বুড়া :
ভারত কহে পাগল নহে :
ওই ভুবনেশ্বর লো॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে। নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি। **আঁকশলী** পোয়া **মোনা** গড়ে মেকামেকি॥
পাখ নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়। কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র। দাড়ি লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়েগুলা মাথা **কোড়ে** তোরে রক্ত দিব॥
বেনা **ঝোড়ে** ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া। এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া॥
ঘুরূলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে। **সেহাকুল কাঁটা** হাতে ঝাট এস চলে॥

এক ঠাই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়। দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল। পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেটা। আর জন বলে সই এই বটে সেটা॥
যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা। আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঢেঁটা। গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে। পথিকেরে ভুলাইয়া আনি আঁখিঠারে॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর। গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥
চারিমুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন। তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রইল কেন॥
সে বলে নাফানী আ লো না জান আপনা। চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥
এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি। ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥
দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাসেন পশুপতি। হেঁট মুখে মৃদু মন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত। হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত॥
ভূতভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে। ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল। বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ। বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকতাগঞ্জন। বায়ে লড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা। বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁফ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন। ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা। বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে। বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে। বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে॥
নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়। সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়॥
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে। কেমন উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়। কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে। সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মৃতে। ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইলো ভূতে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **ছারকপালে**—লক্ষ্মীছাড়া; **ছাইকপালে**—ছাইমাখা কপাল. **আঁকশলী**—ঢেঁকির নেমি; **পোয়া**—ঢেঁকির অঙ্গবিশেষ; **মোনা**—ঢেঁকির মুষলির সামনের অংশের লোহা; **কোড়ে**—ফুটে বা ঠুকে; **ঝোড়ে**—ছোট গাছের ঝোপ; **এয়ো সুয়া**—সধবা, পতিসোহাগিনী; **সেহাকুল কাঁটা**—শিয়ালকাঁটা; **চারিমুখা রাঙ্গাটা**—চতুর্মুখ ব্রহ্মা; **ঠেটা**—খল; **নাফানী**—যৌবন-গর্বিতা নারী ; **রাকা**—প্রতিপদে পূর্ণিমা তিথির চাঁদ ; **কুড়**—একরকমের ওষুধ।

শিবের মোহন বেশ

আমার শঙ্কর করুণাকর গো। নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥
কালকূট পিয়া : বিশ্ব বাঁচাইয়া : মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল · শিরে গঙ্গাজল : অনলে জলে সৌসর॥
ভালে সুধাকর · গলে বিষধর : সুধা বিষে বরাবর।
ভারত কহিছে : মোরে না সহিছে : এ শিবে নিন্দে পামর॥

শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে। দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে।।
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়। এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়।।
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই। তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই।।
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ। কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ।।
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়। মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়।।
জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি। বাঘছাল দিব্য বস্ত্র পৈতা ফণী।।
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ। মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।।
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই। মেনকা আনন্দে ঘরে লইয়া জামাই।।
এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল। হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল।।
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ। ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন।।
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর। অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর।।
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস। বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস।।
নিত্যসখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল। ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল।।
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা : সুছাঁদ—সুরূপ; **হুলাহুলি**—উলুধ্বনি

সিদ্ধিঘোটন

বড় আনন্দ উদয়। বহু দিনে ভগবতী আইলা আলয়।।
শঙ্খঘণ্টারব : মহামহোৎসব : ত্রিভুবনে জয় জয়।
নাচিছে **নাটক** · গাইছে গায়ক : রাগ তাল মান লয়।।
যত চরাচর : হরিষ অন্তর : পরম আনন্দময়।
রায় গুণাকর : কহে পুটকর : মোর যেন দয়া হয়।।

উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ। নন্দীরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ।
শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত। সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত।।
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই। বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই।।
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো। ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু **ভেকো**।।
নূতন ঘোটনা **কুঁড়া** দিয়াছে **বিশাই**। আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই।।
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর। সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার।।
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া। ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া।।
তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি। আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি।।
অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার। ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার।।
মহুরী মরিচ **লঙ্গ** প্রভৃতি মশলা। অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা।।
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও **ঘোটনা**। দুধ **কুসুম্ভায়** আজি হয়েছে বাসনা।।
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত। সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট তারি মত।।
শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে। নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে।।
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া। ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া।।
দু হাতে ঘোটনা দুই পায়ে কুঁড়া ধরি। ত্রিপুরমর্দ্দন নাম মনে মনে স্মরি।।
তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক। ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক।।
রাশি রাশি তাল তাল পর্ব্বতপ্রমাণ। গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান।।

সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে। বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল। ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কি ফল॥

শব্দার্থ ও টীকা : **নাটক**—কৌতুকরঙ্গ; **ভেকো**—কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; **কুঁড়া**—সিদ্ধি বাটার পাত্র ; **বিশাই**—বিশ্বকর্মা; **মহুরী**—মৌরি; **লঙ্গ**—লবঙ্গ ; **ঘোটনা**—সিদ্ধি গোলার দণ্ড; **কুসুম্ভায়**—সিদ্ধি দিয়ে তৈরি বিশেষ একরকম খাদ্য।

সিদ্ধিভক্ষণ

মহাদেবের আঁখি ঢুলু ঢুল। সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল॥
নয়নে ধরিল রঙ্গ : অলসে, অবশ অঙ্গ : লট পট জটাজুট গঙ্গা হুল থুল।
খসিল বাঘের ছাল : আলু থালু হাড়মাল : ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥
হাসি হাসি উতরোল : আধ আধ আধ বোল : ন ন্ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন্ন নকুল।
ভারতের অনুভবে : ভাঙ্গে কি ভুলাবে তবে : ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল॥

সিদ্ধি ঘুটি আসি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়। বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায়।।
সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন। বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন।।
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে। ভবানীর নামে দিল একভাব হয়ে।।
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ। একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ।।
হুঙ্কার ছাড়িয়া রসে মগন হইয়া। আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া।।
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীরে। ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে।।
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত। মেনকা **মেলানী ভার** দিয়াছে কিঞ্চিত।।
হাসিয়া কহেন হব ভালা মোর ভাই। বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই।।
অসংখ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল। সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল।।
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও। সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও।।
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত। সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত।।
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা। নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা।।
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ। অগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ।।
এমন মেলানীভার দিল **আই বুড়ী**। জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি।।
আমরা নকুল করি এমন কি আছে। তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে।।
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা সব। তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব।।
আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই। যে বুঝি তাহার চালে খড় ববে নাই।।
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে। ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে।।
কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন। আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন।।
মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ। পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন।।
দেখিয়া আনন্দ ভূত ভৈরব সকলে। খাইতে লাগিল সবে মহাকুতুহলে।।
জয় জয় হর গৌরী বলিয়া বলিয়া। নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া।।
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা : **নকুল**—সিদ্ধি খাবার পর যা খেতে হয়; **মেলানী ভার**—বিদায়ের সময় দেওয়া উপহার; **আই বুড়ি**—বুড়ি মা।

হরগৌরীর কথোপকথনম্

আমারে ছাড়িও না। ভবানি।
সুশীলা হইয়া : শিলায় জন্মিয়া . শিলাময় হিয়া হইও না।
এ ঘোর পাথারে : ফেলিয়া আমারে : দোষ বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা : যেন খেলা দিলা · তেমন এখানে খেলিও না।
তব মায়াছান্দে : বিশ্ব পড়ি কান্দে ভারতে এ ফেরে ফেলিও না॥

আনন্দসাগরে হর মগন হইলা। বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার। কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি। এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ী॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার। সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই। শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে। হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে।
হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়। সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন। পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে। তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়। অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা। কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম। তোমার সহিত নহে এমন মরম॥
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া। দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া। মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥
অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে। ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া। আর বার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে। সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে॥
পাঁচ মুখ তোমার আমার এক মুখ। সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে তুমি পাবে দুখ॥
দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত। সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে হইবে উৎপাত॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার। এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥
ঊর্দ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই। দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥
চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে। চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥
পঞ্চ তালে নাচিতে অধিক আট হাত। দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত॥
এত বলি একমুখ দ্বিভুজ হইলা। সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান। হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥
দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে। হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার। **গজানন ষড়ানন** হইল কুমার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **গজানন**—গণেশ; **ষড়ানন**—কার্তিক।

হরগৌরী রূপ

কি এ নিরূপম শোভা মনোরম
হর গৌরী এক শরীরে।

শ্বেত পীত কায় রাঙ্গা দুটি পায়
নিছনি লইয়া মরি রে।।
আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজালা
আধ কণ্ঠে শোভে গরল কালা
আধই সুধামাধুরী রে।।
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ
এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ
আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন
কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দুর পরি রে।।
কপাল লোচন আধই আধে
মিলি এক হইল বড়ই সাধে
দুই ভাগে অগ্নি এক অবাধে
হইল প্রণয় করি রে।।
দোঁহার আধ আধ আধ শশী
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি
আধ জটাজুটে গঙ্গা সরসী
আধই চারু কবরী রে।।
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল
এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল
আধই গন্ধকস্তুরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়
কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়
হরগৌরী বিয়া পালা হইল সায়
সবে বল হরি হরি রে।।

শব্দার্থ ও টীকা : **নিছনি**—আরতি, বরণ ; **পট্টাম্বর**—পট্টবস্ত্র ; **উজালা**—উজ্জ্বল।

কৈলাস বর্ণন

কৈলাশ ভূধর . অতি মনোহর : কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর : যক্ষ বিদ্যাধর : অপ্সরগণের বাস।।

রজনী বাসর : মাস সংবৎসর : **দুই পক্ষ সাত বার**।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ · কিছু নাহি ভেদ : সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি : ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ : শিখরে শিখরে : সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে . ভ্রমর ঝঙ্কারে : মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল : শার্দ্দূল রাখাল . কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে . ক্রীড়া করে রঙ্গে · ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সব পিয়ে সুধা · নাহি তৃষা ক্ষুধা : কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক . সে তার রক্ষক : সার অসার সংসারে॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম : সম কর্ম্মাকর্ম্ম : ছোট বড় সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই : অপরূপ ঠাঁই : কেবল **কৈবল্য** মূল॥
চৌদিকে দুস্তর : সুধার সাগর : কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে : চিন্তামণি ঘরে · বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥
শিব শক্তি মেলা · নানা বসে খেলা : **দিগম্বরী দিগম্বর**।
বিহার যে সব সে সব কি কব . বিধি বিষ্ণু অগোচর॥
নন্দী দ্বারপাল ভৈরব বেতাল কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ : গণিতে কার শকতি॥
এক দিন হর . ক্ষুধায় কাতর : গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ . করে নিবেদন : দয়া কর কাশীবাসি॥

শব্দার্থ ও টীকা **দুই পক্ষ সাত বার**—শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ এবং সপ্তাহের সাতটি দিন, **কৈবল্য**— তিরোধানের পর আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়, **দিগম্বরী দিগম্বর**- পার্বতী ও হর।

হরগৌরীর বিবাদসূচনা

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে : বিধি যার বিবাদী কি সাধ তার সাদে॥

এ বড় বিষম ধন্দ
যত করি ছন্দ বন্দ
ভাল ভাবি হয় মন্দ
পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়
তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়
তবু তাই স্বাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে
মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা কয়ে
সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের
আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের
গুরুর প্রসাদে॥

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি। ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই। **সাদ** করে একদিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে। **সরম ভরম** গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল। তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ॥
নীচ লোকে **উচ্চ ভাষে** সহিতে না পারি। ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি। গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়। রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর। খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা। কত মতে স্বামীর সেবন করে তাঁরা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়। আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র। স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥
এইরূপে দুই জনে বাড়িছে বাকছল। ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল॥

শব্দার্থ ও টীকা : **সাদ**—সাধ; **সরমে ভরম**—লজ্জায় সম্মান নষ্ট; **অনির্ব্বাহে**—অভাবে, **উচ্চভাষে**—গলা তুলে কথা বলা।

হরগৌরীকন্দল

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া। এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই : আমারে কহেন তাই : কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি : অন্ন চাহে ভূমে লুটি : কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে॥
বিষপানে নাহি লয় : কথা কৈতে ভয় হয় : উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া : ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া , ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে। ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী। চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের নাহিক সীমা রূপে ততোধিক। বয়সে না দেখি গাছ পাথর **বল্মীক**॥
সম্পদের সীমা নাই বুনা গরু পুঁজি। রসনা কেবল কথা সিন্দুকের **কুঁজি**॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া। কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। উঁহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন।
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়। কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই। মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই।
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে। গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু। ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু।
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন। তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা। কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান। সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ **কোণ** যে পান ঠাকুর। তাহাব ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়। উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন। সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে। তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া। নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।।
ভারত কহিছে মা গো কত বল আর। শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার।।

শব্দার্থ ও টীকা : **দামাল ছাবাল**—দুরন্ত শিশু; **বল্মীক**—উইঢিপি; **কুঁজি**—চাবি; **গুয়া**—সুপুরি; **কোণ**—চালের বিক্ষিপ্ত কোণাংশ ; **আচাভুয়া**—এয়োতির চিহ্ন— তেল সিঁদুর-শাঁখা-শাড়ি ইত্যাদি—আচাভুয়া অর্থে অদ্ভুতও বোঝায়।

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্‌যোগ

ভবানীর কটুভাষে : লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে : ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত : পিত্তে হৈলা গলা তিক্ত : বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে।।
হেঁটমুখে পঞ্চানন : নন্দীরে ডাকিয়া কন : বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল : ডমরু বাঘের ছাল : বিভূতি লেপিযা দেহ গায়।।
আন রে ত্রিশূল ঝুলি : প্রমথ সকলগুলি : যতগুলি ধুতুরার ফল।
থলি ভরা সিদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া : জটায় আছয়ে গঙ্গাজল।।
ঘর উজাড়িয়া যাব : ভিক্ষায় যে পাই খাব : অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা : সে জন জীয়ন্তে মরা : তাহার উচিত বনবাস।।
বৃদ্ধকাল আপনার : নাহি জানি রোজগার : চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় : ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয় : নাম মাত্র রহিয়াছে সার।।
যত আনি তত নাই : না ঘুচিল খাই খাই : কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।।
এত বলি দিগম্বর : আরোহিয়া বৃষবর : চলিলেন ভিক্ষাব লাগিয়া।।
শিবের দেখিয়া গতি : শিবা কন ক্রোধমতি : কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই : বাপের মন্দিরে যাই : গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে।।
যে ঘরে গৃহস্থ হেন : সে ঘরে গৃহিণী কেন : নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে : খন খন ঝন ঝনে : আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই।।
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস : তাহার অর্দ্ধেক চাষ : রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত : সকলের এই মত : ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ।।
হইয়া বিরসমন : লয়ে গুহ গজানন : হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয় : এমন উচিত নয় : নিষেধ করিয়া কহে জয়া।।

শব্দার্থ ও টীকা : **হাড়মাল**—হাড়ের মালা; **ঘর উজারিয়া যাব**—ঘর ছেড়ে শিব চলে যাবেন; **স্বতন্তরা**—যে নারী সংসারমুখী নয়—এখানে কলহপরায়ণা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে, গুহ- -কার্তিক।

জয়ার উপদেশ

কহে সখী জয়া : শুন গো অভয়া : এ কি কর ঠাকুরালি।
ক্রোধে করি ভর : যাবে বাপঘর : খেয়াতি হবে কাঙ্গালী।।
মিছা ক্রোধ করি : আপনা পাসরি : কি কর ছাবাল খেলা।
সুখমোক্ষধাম : অন্নপূর্ণা নাম : সংসাব সাগরে ভেলা।।
অন্নপূর্ণা হয়ে : অন্ন দেহ কয়ে : দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালী : সবে দিল গালি : রহিতে না দিবে নাছে।।
জননীর আশে : যাবে পিতৃবাসে : ভাজে দিবে সদা তাড়া।

বাপে না জিজ্ঞাসে : মায়ে না সম্ভাষে · যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।।
যা বলি তা কর : নিজ মূর্ত্তি ধর : বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাসশিখর : অন্নে পূর্ণ কর · জগতের অন্ন লয়ে।।
তিন ভূমণ্ডলে : যে স্থলে যে স্থলে : যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া : আনহ হরিয়া রাখহ আপন কাছে।।
কমল আসন : আদি দেবগণ : কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি : যতেক প্রকৃতি : এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য।।
ফিরি ঘরে ঘর : হইয়া ফাঁফর . কোথাও অন্ন না পেয়ে।
আপনি শঙ্কর : আসিবেন ঘর · তোমার এ গুণ গেয়ে।।
অন্ন দিয়া তাঁরে · সকল সংসারে : আপনা প্রকাশ কর।
প্রকাশিয়া তন্ত্রে : অন্নপূর্ণামন্ত্রে : লোকের যন্ত্রণা হর।।
তিন ভূমণ্ডলে : পূজিবে সকলে : চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে।
দ্বিতীয়া অন্বিত : অষ্টাহ সঙ্গীত : বিসর্জ্জন নবমীতে।।
পূজিবে যে জনে : তাহার ভবনে . হইবে লক্ষ্মী অচলা।
আর যত আছে : সব হবে পাছে : কহিবে অষ্টমঙ্গলা।।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ : দেবীপুত্ররূপ : অন্নপূর্ণা ব্রতদাস।
ভারত ব্রাহ্মণ : কহে সুবচন . অন্নদা পুরাও আশ।।

শব্দার্থ ও টীকা : **ঠাকুরালি**—রহস্য, ঠাকুরের মতো ব্যবহার ; **খেয়াতি হবে কাঙ্গালী**—জয়া দেবীকে উপদেশ দিচ্ছেন যে এইভাবে বাপের বাড়ি গেলে কাঙ্গালী নাম হবে; **ছাবাল খেলা**—ছেলেখেলা, **ভাজে**—ভ্রাতৃজায়া; **নাছে**—সদর দরজা ; **কমল আসন**—ব্রহ্মা; **দ্বিতীয়া অন্বিত**—দ্বিতীয়া তিথি থেকে।

অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ

অন্নপূর্ণা জয় জয়। দূর কর ভবভয়।।
তুমি সর্ব্বময় : তোমা হৈতে হয় : সৃজন পালন লয়।
কত মায়া কর : কত মায়া ধর : বেদের গোচর নয়।।
বিধি হরি হর : আদি চরাচর : কটাক্ষেতে কত হয়।
ছাড ছায়া মায়া : দেহ পদছায়া : ভারত বিনয়ে কয়।।

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ। বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ।।
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ। জোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন।।
শুন রে বিশাই বাছা লহ মোর পান। পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।।
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র। রতননির্ম্মিত দিলা হাতা পানপাত্র।।
রতনমুকুট দিলা নানা অলঙ্কার। অমূল্য কাঁচুলি শাড়ী উড়নি যে আর।।
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ। আশিস করিলা মাতা হও নিরাপদ।।
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে। হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে।।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ। কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন।।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়। কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয়।।
দেবী দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত। সৃষ্টি কৈলা কোটি কোটি কোটি কোটি শত।।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই। কেমন হইল মেনে মনে আসে নাই॥
অন্নেব পর্ব্বত পরমান্নসরোবব। ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায। কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই॥ জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র বায গুণাকব॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা। বাজত ডমরু পিনাক বসালা॥
নাচত ভূত : বাজাওত ভৈরব : গাওত তাল বেতালা।
নন্দী কহে তাতা · কার মনোহর : ভৃঙ্গী বাজাওত গালা॥
গঙ্গা ঝরে জল চাঁদ সুধারস : অনল হলাহল জ্বালা।
ভাবতকে হর শঙ্কর মূরতি · নাশ কপাল কপালা॥

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চডিয়া। ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিযা॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান। হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
ববম্ ববম্ বম ঘন বাজে গাল। ভভম্ ভভম্ ভম শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে। তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা। শিব এল বলে ধায যত **রঙ্গচিঙ্গা**॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া **কাপ**। কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কব জল। কেহ বলে জ্বালি দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও। কেহ বলে ডমরু বাজাযে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া। ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইযা॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল। কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ্ গবল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই। ও দিন **ওদন** বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ। চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী। যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব। সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল। অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া। কোথায পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারী। কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পাবি॥
এইরূপে শঙ্কর ফিবিয়া ঘর ঘর। অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতব॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ। বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মীনারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর। ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **রঙ্গচিঙ্গা**—রং তামাসা; **কাপ**—কৌতুককারী . **ওদন**—অন্ন , **চেত রে** চেতন হও।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে : অন্ন নাহি মোর ঘরে : আজি বড় দৈবের দুর্গতি॥
আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই : মোর ঘরে অন্ন নাই : ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।

শুনিয়া শঙ্কর কন : ফিরিলাম ত্রিভুবন : এই কথা সকলের ঘরে॥
গুমান হইল গুঁড়া : না মিলিল খুদ কুঁড়া : ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি চায় : সাগর শুকায়ে যায় : হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই : আর যাব কার ঠাঁই : ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাঁই : তবু অন্ন নাহি পাই : কপালে দিলেক বিধি ছাই॥
কত সাপ আছে গায় · হাভাতারে নাহি খায় : গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে : সেহ না পোড়ায় বলে : না জানি মরিব কি ঔষধে॥
ঘরে অন্ন নাহি যার : মরণ মঙ্গল তার : তার কেন বিলাসের সাদ।
যার নারী সুতা সুত : সদা অন্নকষ্টযুত : সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥
দেখিয়া শিবের খেদ : লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ : কেন শিব করহ বিষাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে : সে কান্দে অন্নের তরে : এ বড় মায়ার পরমাদ॥
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে : জগতের অন্ন লয়ে · কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে : সকলি তাঁহার কাছে : তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা॥
আমার যুকতি ধর : কৈলাস গমন কর : আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে : আমি আছিলাম ঘরে : এই আমি যাই সেইখানে॥
এত বলি হরিপ্রিয়া : কৈলাসে রহিলা গিয়া : শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখিয়া অন্নদার সাজ : শিবের হইল লাজ : তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া॥
কত কোটি হরি হর : পদ্মাসন পুরন্দর : কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায় : স্তুতি পড়ে নাচে গায় : দেখি শিব হইলা মোহিত॥
দেখি কোটি কোটি হরে : স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে : অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে : বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে : অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শব্দার্থ ও টীকা : গুমান—অহঙ্কার, দেমাক।

শিবে অন্নদান

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥
কারণ-অমৃত পূরিত করি। রত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা। পরশেন হরে হরিষে মাতা॥
পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত। পুরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া। পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া। কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া। চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া। নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে। নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে পায়। ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী। দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক ধক ধক ভালে অনল। তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল। দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল। তাতা থেই থেই বলে বেতাল।
ববম ববম বাজায়ে গাল। ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল॥
ভভম ভভম বাজয়ে শিঙ্গা। মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥

পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে। নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর। হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাচে। ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥
শব্দার্থ ও টীকা : নাটক—কৌতুকরঙ্গ।

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য

জয় জগদীশ্বর জয় **জগদম্বে**। ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া হর হরজায়া **পরিহর** মায়া অব অবলম্বে।
যদি কর মমতা হত হয় যমতা দিবি ভূবি সমতা **গুহ** হেরম্বে॥
তব জন যেবা তসু রিপু কেবা যম দেই সেবা শিরপরিলম্বে।
ভবজল তরণে রাখহ চরণে ভারত চরণে করি কাদম্বে॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি। হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি॥
বসিলা গিরিশ গৌরী কৌতুক অশেষ। সমুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥
দু দিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল। ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল॥
অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর। প্রকাশ করিলা তন্ত্রমন্ত্র বহুতর॥
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত। কিঞ্চিত কহিনু নিজ বুদ্ধিশুদ্ধিমত॥
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা। বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা॥
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন। পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন॥
অন্নপূর্ণা মহামায়ায় **মহাবিদ্যামাজ**। যার বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যার করি উপাসনা। বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যার করিয়া মাননা॥
শিবের শিবত্ব যার উপাসনা ফলে। নিগম আগমে যারে আদ্যাশক্তি বলে॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী। দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া **হেরম্বজননী**। হেমহীরাহারময়ী হিরণ্যবরণী॥
হইয়া নন্দের সুতা হরিসহায়িনী। হেরি হাহাকার হর হরিণীহেরিণী॥
কামরিপু কামিনী কামদা কামেশ্বরী। করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল। যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর। অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর॥
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়। ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
শব্দার্থ ও টীকা : জগদম্বে- জগন্মাতা; **পরিহর**—পরিত্যাগ কর ; **ভবজল**—সমুদ্রে; সংসার সমুদ্র; **তরণে**—পার হতে; **মহাবিদ্যামাজ**—দশমহাবিদ্যার মূল ; **হেরম্ব**—গণেশ ; **গায়নে-বায়নে**—গান-বাজনায়।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা

পুণ্যভূমি বারাণসী : বেষ্টিত বরুণা অসি : যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিতা।
আনন্দকানন নাম : কেবল কৈবল্যধাম · শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিতা॥
বাপী যাহে জ্ঞানবাপী : নামে মোক্ষ পায় পাপী : মহিমা কহিতে কেবা পাবে।
মনিকর্ণী পুষ্করিণী : মোক্ষপদবিধায়িনী, সার বস্তু অসার সংসারে॥

দশাশ্বমেধের ঘাট : চৌষট্টি যোগিনীপাট : নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে : এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে : সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশের রাজধানী : দুর্গা যাহে মহারাণী : যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার : না হয় স্মরণে যার : ভবসিন্ধু তরিবার তরি॥
যাহে জীব ত্যজি জীব : সেই ক্ষণে হয় শিব : পুন নহে জঠরযাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ : দনুজ মনুজ রক্ষ . সবে যার করয়ে মাননা॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত : যাহে সদা অধিষ্ঠিত : যাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম : প্রকাশি আপন নাম : শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর॥
দেবতা কিন্নর নর : সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর : তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা : মহেশের মনোলোভা : বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে॥
সর্ব্বসুখময় ঠাঁই : সবে মাত্র অন্ন নাই : দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস : সকলের অন্ন আশ : কি প্রকারে অন্ন যোগাইব॥
আপন আহার বিষ : ধ্যানে যায় অহর্নিশ : অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা : অন্নজীবী হবে তারা : অন্ন বিনা না রবে জীবন॥
এত ভাবি ত্রিলোচন . সমাধিতে দিয়া মন : বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে : অন্নে পূর্ণ কর স্থানে : ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **শমন**—এখানে যমরাজাকে বোঝাচ্ছে; **ভবসিন্ধু**—সংসার সমুদ্র; **দনুজ**—দানব; **মনুজ**—মানব; **জঠরযাতনা**—গর্ভযন্ত্রণা—এখানে পুনর্জন্মের যন্ত্রণাকে বোঝানো হচ্ছে; **বিশ্বেশ্বর**—কাশীতে প্রধান শিবলিঙ্গ।

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি

ভব ভাবি চিতে : পুরী নির্ম্মাইতে : বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি : প্রবেশিলা কাশী : জোড়হাতে সাবধান॥
বিশ্বকর্ম্মে হর : কহিলা সত্বর : শুন রে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি : বসিবেন কাশী : দেউল দেহ বনাই॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি : নিজ পুণ্য গুণি : দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা মূরতি : নিরুপম অতি : নিরাময় সাবধান॥
রতন দেউল : ভুবনে অতুল : কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ বন্ধান : অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ : দেখি সুখী কৃত্তিবাস॥
দেউল ভিতরে : মণিবেদীপরে : চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গপ্রদা : গড়িল অন্নদা : অনন্ত নামমহিমা॥
মণিময়চ্ছদ : গড়ে কোকনদ : অরুণচিকণশোভা।
ভুবনমণ্ডল : করয়ে উজ্জ্বল : মহেশের মনোলোভা॥
তাহার উপরি : পদ্মাসন করি : অন্নদামূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে : দেখি অষ্ট অঙ্গে : অরুণ চরণে পড়ে॥
অতি নিরমল : চরণ যুগল : সুশোভিত নখ ছাঁদে।
দিনে দিনে ক্ষীণ : কলঙ্কে মলিন : কত শোভা হবে চাঁদে॥
মণিকরিকর : উরু মনোহর : নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে : অনঙ্গের অঙ্গে : বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণী॥
শোভাসরোবর : নাভি মনোহর : মদনশফরীধাম।

কামের কুন্তল : অতি সুকোমল : রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভু শঙ্কর : উচ কুচবর . সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে।
রতনকমল : মৃণাল কোমল : সুবলিত ভুজ সাজে॥
কারণ অমৃত : পলান্ন সঘৃত : পানপাত্র হাতা শোভে।
সমুখে **শঙ্কর** : নাচেন সুন্দর : অন্ন খেয়ে অন্নলোভে॥
কোটি সুধাকর : বদন সুন্দর : রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধ শশী ভালে : কেশ মল্লীমালে : অলি মধুলোভে ফিরে॥
অন্নদা মূরতি : দেখি পশুপতি : বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র মত : রচিলা ভারত : কবি রায় গুণাকর।

শব্দার্থ ও টীকা : **দেউল**—মন্দির; **কৃত্তিবাস**—শিব; **মদনশফরীধাম**—কামরূপ পুঁটি মাছের বাসা; **কামের কুন্তল**—যোনিকেশ।

অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ

কি এ শোভা হয়েছে কাশী মাঝে॥
দেখ রে আনন্দ কাননশোভা। সরোবর মনোহর হরমনোলোভা॥

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল। চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মিল॥
সমুখে করিলা সরোবর মনোহর। মাণিক্যে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ। দিয়া কৈল চারি পাড় অতি সুশোভন॥
তুলিল পাতালগঙ্গা **ভোগবতী** জল। সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল॥
গড়িল স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ। প্রবালে গড়িল ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ॥
সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া গড়িল কমল। চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িল উৎপল॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকরপাঁতি। নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাতি॥
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন। সারসা সারসী গড়ে বক বকীগণ॥
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী। কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥
কাদাখোঁচা দলপিপী কামি কোড়া কঙ্ক। পানিতর বেণেবউ গড়ে **মৎস্যরঙ্ক**॥
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর। নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর॥
চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল। বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা। গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই। কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোণা। চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা॥
গাঙ্গদাড়া ভেদ চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা। খরশুলা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা॥
চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মায় উদ্যান। নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান॥
অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর। করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর॥
শেহলী পীয়লী দোনা পারুল রঙ্গন। মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন॥
জবা জুতি জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন। চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন॥
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী। চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ। পারিজাত মধুমল্লী ঝিটী মুচকুন্দ॥
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল। খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিলম্ব আমলকী। পাকুড় অশ্বত্থ বট বালা হরিতকী॥

ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুলফলধর। তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর।।
ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া। চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।।
ময়ূর ময়ূরী সারী শুক আদি খগ। কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ।।
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী। কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়াধুতী।।
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল। শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।।
ঠেটী ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়। নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।।
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল। ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।।
চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি। বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি।।
বউ কথা কহ আর দেশের কি হবে। বনশোভা যে সব পক্ষীর কলরবে।।
ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি। গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি।।
সরভ কেশরী বাঘ বারণ গণ্ডার। ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার।।
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু। বরাহ কুক্কুর ভেড়া খটাস সজারু।।
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশিয়ালি ঘোড়ারু। বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু।।
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল। হোড়ার নকুল গৌলা গবয় বিড়াল।।
কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা আজনাই। সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে গড়িলা বিশাই।।
বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ। নানামত নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ।।
কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল। বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সুঁচে ব্রহ্মজাল।।
শাঁখিনী চামর কোষা সূতার সঞ্চার। খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার।।
তক্ষক উদয়কাল ডাড়াশ কানাড়া। লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া।।
ছাতারে শীয়ড়চাঁদা নানাজাতি বোড়া। ঢেমনা মেটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।।
বিছা বিছু পিপিড়া প্রভৃতি বিষধর। সৃষ্টিহেতু জোড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর।।
সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব। জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব।।
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা : **ভোগবতী**—পাতালে বহমান গঙ্গার নাম; **নানা ভাতি**—নানা রকম; **মৎস্যরঙ্ক**—মাছরাঙা; **গাঙ্গদাড়া**—দীর্ঘচঞ্চু বিশিষ্ট লম্বা সরু মাছ; **খরশুণ্ড**—ভাঙন জাতীয় দ্রুতগামী মাছ; **কাহাকুহী**—হাঁড়িচাচা; **ঘোড়ারু**—ঘোড়ার মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন হরিণ; **বারসিঙ্গা**—প্রতি শৃঙ্গে ছয়টি শাখাযুক্ত হরিণ ; **বাওটাদি**—দ্রুতগামী হরিণ; **তুলারু**—এক ধরনের লোমশ পশু; **জীবন্যাসমন্ত্র**—দেবমূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র।

দেবগণনিমন্ত্রণ

চল কাশী মাঝে সবে যাব। অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব।।
মণিকর্ণিকার জলে : স্নান করি কুতূহলে : অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন : নানা রস সুসম্পন্ন : অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব।
শিব শিব শিব কয়ে : জ্ঞানবাপীকূলে রয়ে : সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব।
শিবের করুণা হবে : দেখিব ভবানীভবে : ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব।।
শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে। নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে।।
হংসপৃষ্ঠে আইলা সগণ প্রজাপতি। গণ সহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী।।
গণ সহ গণেশ আইলা গজানন। দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন।।
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ। ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ।।

নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা। পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা॥
নৈর্ঋত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ। বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ॥
সগণ পবনবেগে আইলা পবন। কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ॥
শিবের বিশেষমূর্ত্তি আইলা **ঈশান**। মূর্ত্তিভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান্॥
আইলা ভুজঙ্গপতি ত্যজিয়া পাতালে। আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে॥
দ্বাদশ মূরতি সহ আইলা ভাস্কর। ষোল কলা সহিত আইলা শশধর॥
আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা। বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা॥
দেবগণগুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য। দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রাচার্য্য॥
মন্দগতি মহাবেগে আইলা **শনৈশ্চর**। আইলা রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর। অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ। একে একে সবে শিবে দিলা দরশন॥
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন। সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ॥
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ। নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ॥
আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস। শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ॥
যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম। দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল। **জামদগ্ন্য** ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল॥
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ। বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস॥
ভার্গব চ্যাবন ঔর্ব্ব মনু শাতাতপ। উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ॥
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ। বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন॥
জয় শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টারব। বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব॥
অন্নপূর্ণাপুরী আর মূরতি দেখিয়া। পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া॥
তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব। তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব॥
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর। পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর॥
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে। এত দিন যাঁর ধ্যান না শুনি শ্রবণে॥
নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥
ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়। কেবল কৈবল্যরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলা তুমি শিব। তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব॥
ভবদুঃখসাগরে সকলে কৈলা পার। বিশ্বনাথ বিনা কার লাগে বিশ্বভার॥
তন্ত্রে অন্নপূর্ণামন্ত্র তুমি প্রকাশিলা। মুরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥
মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে। নির্ম্মাণ সদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম। এখনো আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে। তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা। তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবে ত মহিমা॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ। কৈলা **পুরশ্চরণ** কতেক কত জপ॥
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **সগণ**—অনুচরসহ; **ইন্দ্রাণী**—ইন্দ্র-পত্নী। **নৈর্ঋত**—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ; **ঈশান**—পৌরাণিক শিবের একটি নাম, ঈশান কোণের দেবতা, পৌরাণিক যুগে শিবের অষ্টমূর্তি—এই অষ্টমূর্তির মধ্যে ঈশান হচ্ছেন সূর্য—তন্ত্রে শিবের পাঁচ মূর্তি—এদের মধ্যে ঈশান একজন ; **শনৈশ্চর**—শনিগ্রহ ; **জামদগ্ন্য**—পরশুরামের অন্য নাম ; **পুরশ্চরণ**—মন্ত্রসিদ্ধির জন্য জপ তপ হোম ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গ অনুষ্ঠান।

শিবের পঞ্চতপ

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া। লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া।।
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈলো বড়। ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈল দড়।।
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে। করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে।।
দিগম্বর বিভূতিভূষিত কলেবর। গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর।।
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুস্কর। চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে **ভাস্কর**।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে এইরূপে **পঞ্চতপ** করি। অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী।।
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত। একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত।।
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর। একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর।।
ভাদ্র মাসে **আট দিকে** পরিপূর্ণ বান। রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান।।
আশ্বিনে অশেষ কষ্ট করেন কঠোর। ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর।।
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়। অনশনে রজনী দিবস কত যায়।।
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে **নীহার**। উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার।।
পৌষ মাসে দারুণ **হিমানী** পরকাশ। রাত্রি দিন জলে বসি নিত্য উপবাস।।
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির। রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর।।
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর। উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর।।
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা। ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা।।
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব। পঞ্চ মুখে বিবিধ বিধানে কৈল স্তব।।
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও। কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও।।
আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান। তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মশান।।
তুমি মূলপ্রকৃতি সকল বিশ্বমূল। সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল।।
তুমি সকলের সার অসার সকল। যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে। সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে।।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ প্রসবিয়া তুমি। সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি।।
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর।।
আনন্দকানন কাশী সানন্দ করিয়া। বিহার করত মোরে সদয়া হইয়া।।
এইরূপ তপস্যায় গেল কত কাল। শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল।।
চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ। তথাপি না হয় অন্নদার দয়ালেশ।।
এইরূপ তপ করে যত সহচর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা : **ভাস্কর**—সূর্য; **পঞ্চতপ**—কঠোর তপস্যা— গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে আগুন জ্বেলে, বর্ষায় বৃষ্টিতে এবং শীতকালে সিক্তবসনে এই তপস্যা করতে হয়; **আটদিক**—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-ঈশান-অগ্নি-নৈঋত-বায়ু—এই আট দিক। **নীহার**—শিশির; **হিমাণী**—তুষারপুঞ্জ।

ব্রহ্মাদির তপ

শিবের দেখিয়া তপ : করিতে অন্নদাজপ : ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে : অন্নদার ধ্যান মনে : অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী।।
গদা চক্র তেয়াগিয়া : পাঞ্চজন্য বাজাইয়া : অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি : তপস্যা করেন হরি : রমা বাণী সংহতি করিয়া।।
সুখমুণ্ডে হানি বাজ : তপ করে দেবরাজ : সহস্রলোচনে জল ঝরে।

সঙ্গে লয়ে দেবীগণে : অন্নদা ভাবিয়া মনে : ইন্দ্রাণী দারুণ তপ ধরে।
ঊর্দ্ধে দুই পদ ধরি : হেটে অগ্নি দীপ্ত করি : অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে : অন্নদা ধেয়ান মনে : সম শীত বরিষা আতপ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার : সঙ্গে লয়ে পরিবার : শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ : অস্থি হৈল অবশেষ : বল্মীক জন্মিল কলেবরে॥
নৈর্ঋত রাক্ষস রীত : কঠোর তপেতে প্রীত : নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান।
পুনর্ব্বার মাথা হয় : নিজ রক্ত মাংসময় : বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান॥
বরুণ আপন পাশ : গলায় বান্ধিয়া ফাঁস : প্রাণ বলিদান দিতে মন।
অন্নদার অনুগ্রহে : পরাণ বিয়োগ নহে : অস্থিমধ্যে অস্ত্যথ জীবন॥
পবন আহার করি : নিয়মে পরাণ ধরি : পবন করয়ে ঘোর তপ।
ঊনপঞ্চাশত ভাগে : এক ভাবে অনুরাগে : দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ : আশ্রয় করিয়া যোগ : অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ : অস্থি চর্ম্ম অবশেষ : সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান॥
শিবের বিশেষ কায় : ঈশানের তপস্যায় : ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি : শিরোঘৃত ঘৃত ঢালি : ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল॥
প্রজাপতি রূপভেদে : উচ্চারিয়া চারি বেদে : ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিক দিক ভেদ নাই : টলমল সর্ব্বঠাঁই : ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে॥
সহস্রমুখের স্তবে : নিজগণ কলেরবে : তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ : ব্রহ্মঋষি যত জন : বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ॥
যত দেবঋষিগণ : সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন : রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে : তপস্যা অনন্যমনে : দেহে তরু জন্মিল সফল॥
সকলের তপস্যায় : দয়া হৈল অন্নদায় : অবতীর্ণা হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর : প্রতিমায় কৈলা ভর : সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে॥
সকলে চেতনা পেয়ে : চৌদিকে দেখেন চেয়ে : অনুকম্পা হৈল অনুভব।
দূরে গেল হাহাকার : জয় শব্দ নমস্কার : ভুবন ভরিল কলরব॥
চারি সমাজের প্রতি : কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি : দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তার সভাসদবর : কহে রায় গুণাকর : অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

শব্দার্থ ও টীকা : **পাঞ্চজন্য**—কৃষ্ণের শঙ্খের নাম, **আতপ**—গ্রীষ্ম।

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান

কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমলপরিমল : লয়ে শীতল জল : পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্তরাজা আনি : ছয় রাগিণীরাণী : করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥
কুসুমে পুন পুন : ভ্রমর গুণ গুণ : মদন দিল গুণ ধনুক হুলে।
যতেক উপবন : কুসুমে সুশোভন : মধুমুদিত মন ভারত ভুলে॥

মধু মাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন। সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় উপবন॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে। গুন গুন গুন গুন ভ্রমরে ঝঙ্কারে॥
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে। তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনীকোলে। সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে॥

ঘরে ঘরে নানা যন্ত্রে বসন্তের গান। সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান্॥
শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে। মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে। তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস। ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্যা নাম জয়া। অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাত অভয়া॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে। প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা। বিশ্বকর্ম্মাসুনির্ম্মিত অপার মহিমা॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার। দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটি গুণ তার॥
প্রতিমাপ্রভাবে যত দেবঋষিগণ। ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন॥
দৃষ্টি সুধাবৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া। কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া॥
শুন শুন যত দেবঋষি আদিগণ। এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ॥
কম্পমান কলেবর করি যোড়কর। সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর॥
করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে। কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে॥
চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ সুখ। অনশনে সকলের সুখায়েছে মুখ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও। শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও॥
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন। অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন॥
বাম করে পানপাত্র রতননির্ম্মিত। কারণ অমৃত পরিপূর্ণ অতুলিত॥
সঘৃত পলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা। ডান করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান। পরশেন কখন না হয় অনুমান॥
সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি। আমারে দিছেন অন্ন অন্নদা জননী॥
পিষ্টকপর্ব্বত পরমান্ন সরোবর। ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর॥
চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস। সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া। সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া॥
আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া। প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া॥
অন্নে পূর্ণ হৈল বিশ্ব বিশেষত কাশী। করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী॥
পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি। তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি॥
তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে। লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস অন্তর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের অন্নদাপূজা

আনন্দে ত্রিনয়ন : সহিত দেবগণ : পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস : অষ্টমী সুপ্রকাশ : বিশদ পক্ষ শুভ ক্ষণে॥
বিরিঞ্চি পুরোহিত : বিধান সুবিদিত : পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি : যোগান দ্রব্য আনি : নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥
সূর্য্যাদি নব গ্রহ : আপন গণ সহ : ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায় : অপ্সর নাচে তায় : গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥
নারদ আদি যত · দেবর্ষি শত শত : চৌদিকে করে বেদ গান।
বিবিধ উপচার : অশেষ উপহার : অনেকবিধ বলিদান॥
অন্নদা জয় জয় : সকল দেবে কয় : ভুবন ভরি কোলাহল।
আনন্দে শূলপানি : করিয়া যোড়পাণি : পূজেন চরণকমল॥

দেউলবেদীপর : প্রতিমা মনোহর : তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম : মণ্ডল চিত্রধাম : লিখিলা আপনি বিধাতা।।
সম্মুখে হেমঘট : আচ্ছাদি চারু পট · পড়িয়া স্বস্তি ঋদ্ধি বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি : গন্ধাধিবাস করি : বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি।।
পূজিয়া গজানন : ভাস্কর ত্রিলোচন : কেশব কৌষিকী চরণ।
পূজিয়া নব গ্রহ : দিক্‌পাল দশ সহ : বিবিধ আবরণগণ।।
চরণ সরসিজ : পূজিয়া জপি বীজ . নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ : প্রভৃতি বলিভাগ · বিবিধ উপচার যত।।
সমাপি হোমক্রিয়া : অন্নাদি নির্বেদিয়া : মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ : করিয়া জাগরণ : দক্ষিণা বিবিধ বিধানে।।
পূজার সমাধানে : প্রণমি সাবধানে : সকলে পাইলেন বর।
অন্নদা পদতলে : বিনয় করি বলে : ভারত রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা : **বিরিঞ্চি**—শিবেব অন্যনাম: **গন্ধাধিবাস**—দেবতাব পুজোব আগে চন্দন, তেল, হবিদ্রা প্রভৃতি সামগ্রী দ্বারা অনুষ্ঠেয় কৃত্যবিশেষ; **আবরণগণ**--মূল দেবতার পরে পূজ্য দেবতারা, **সরসিজ**--রক্তপদ্ম।

অন্নদার বরদান

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবানী : সুমধুর বাণী : ভবানী ভবের সার।।

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর। শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর।।
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি। ইহার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি।।
এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ। এইস্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস।।
কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন। মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ।।
এই চৈত্র মাস হইল মোর ব্রতমাস। শুক্ল পক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস।।
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি। ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি।।
অষ্টাহ মঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস। তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস।।
একমনে মোর গীত যে করে মাননা। আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা।।
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী পাইয়া। গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া।।
দ্বিতীয়ায় দেখি নব শশীর উদয়। আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়।।
অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ। নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন।।
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে। ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে।।
ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া। যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া।।
তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম। করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।।
কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল। গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল।।
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়। সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়।।
পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা। গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা।।
যেই জন উপাসনা করিবে আমার। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার।।
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ। করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ।।
বিদায় হইয়া যত দেবঋষিগণ। আপন আপন স্থানে করিলা গমন।।

নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে। করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহ মঙ্গলে॥
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ। সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে। করুণা আকর বিনা কেবা কৃপা করে॥
মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী। মহিষমর্দ্দিনী মোহরূপা মহেশ্বরী॥
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়। নন্দের নন্দিনী হয়ে গেল মথুরায়॥
কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ। যাহে অবতরি হরি ভারাবতারণ॥
আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈলা স্তব। যে কালে সারথি তার হইলা কেশব॥
সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের জননী। অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল। যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

শব্দার্থ ও টীকা : **বারি**—বিগ্রহ, মূর্তি ; **ব্রতদাস**—ভক্ত; **মহামায়া......মহেশ্বরী**—এগুলি মহেশ (শিব) পত্নীর বিভিন্ন নাম।

ব্যাসবর্ণন

ব্যাস নারাযণ অংশ : ঋষিগণ অবতংস : যাঁহা হইতে আঠার পুরাণ।
ভারত **পঞ্চম বেদ** : নানা মত পরিচ্ছেদ : বেদভাগ বেদান্ত বাখান॥
সদা বেদপরায়ণ : প্রকাশিলা পারায়ণ . শিষ্যগণ বৈষ্ণবসংহতি।
পিতা যাঁর পরাশর : শুকদেব বংশধর : জননী যাঁহার সত্যবতী॥
দাঁড়াইলে জটাভার : চরণে লুটায় তাঁর : **কক্ষলোমে** আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি : পায়ে পরে দিলে ছাড়ি : চলনে কতেক **আঁটুবাটু**॥
কপালে চড়ক ফোঁটা : গলে উপবীত মোটা : বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত **ছাবা** . **কলি** মৃগ বাঘথাবা : সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে : লম্বি মালা করতলে : হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন : কক্ষতলে সুশোভন : তাহে **কৃষ্ণসার** মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি : তাহাতে কুপীন পরি : বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু **তুম্বীফল** : **করঙ্গ** পিবারে জল : হাতে **আশা** হিঙ্গুলবরণ॥
এই বেশে শিষ্যগণ : সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ : পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত : পুরাণ সংহিতা যত : তর্কাতর্কি নানামত কয়ে॥
কে কোথা কি করে দান : কে কোথা কি করে ধ্যান : পূজা করে কেবা কিবা দিয়া
কে কোথা কি মন্ত্র লয় : কোথা কোন যজ্ঞ হয় : আগে ভাগে উপস্থিত গিয়া॥
জগতের হিতে মন : ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন : ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয় : দারা আপনার নয় : সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে . সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে : চিরজীবী নরাকার লীলা।
এক দিন দৈববশে : শিষ্য সহ শাস্ত্ররসে : নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ : পূজা করে ত্রিলোচন : গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষমালা : অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল : কলেবরে বিভূতি মাখিয়া॥
শিব **ভর্গ** ত্রিলোচন : বৃষধ্বজ পঞ্চানন : চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব শর্ব্ব ব্যোমকেশ : বিশ্বনাথ প্রমথেশ : দেবদেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ : কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ : মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর : **ত্র্যম্বক** ভূতেশ হর : রুদ্র **পুরহর স্মরহর**॥

এইরূপে ঋষি যত : শিবের সেবায় রত : দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয় : ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয় : বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন।।

শব্দার্থ ও টীকা : **পঞ্চম বেদ**—মহাভারত; **কক্ষলোম**—বগলের চুল; **আঁটুবাটু**—জড়তা (জড়সড়) ; **ছাবা**—ছাপা; **কলি**—কালিকাটার তিলক; **মৃগ**—হরিণমুদ্রা; **মালা**—এখানে বৈষ্ণবের জপমালা, **কৃষ্ণসার**—বিশেষ প্রজাতির হরিণ ; **তুম্বিফল**—লাউ; **করঙ্গ**—ভিক্ষাপাত্র , **আশা**—দণ্ড ; **ভর্গ**—শিবেব অন্য নাম ; **ত্র্যম্বক, পুরহর, স্মরহর**—শিবের নানা নাম।

শিবপূজা নিষেধ

কি কর নব হরি ভজ রে। ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে।।
তরিবারে পরিণাম : হর জপে হরিনাম : হরি ভজি পূর্ণকাম কমলজ বে।
ভব ঘোর পারাবার : হরিনাম তরী তার : হরিনামে লয়ে পার হৈল গজ রে।।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম . এ চারি বর্গের ধাম : বেদে বলে হরি নাম সুখে যজ রে।
গুরুবাক্য শিরে ধরি : গিয়াছে সার করি · ভারতের ভূষা **হরি-পদরজ** রে।।

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ। কি ফলে বিফল কব শিবের সেবন।।
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই। ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই।।
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম। মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম।।
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে। মোক্ষ ফল পাবে যদি ভজ নাবায়ণে।।
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার। **সত্ত্বরজস্তমোগুণ** প্রকৃতি তাহার।।
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়। তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কাবময়।।
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়। যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়।।
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে। মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে।।
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি। অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি।।
সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সব্ব দেবে হরি।।
বেদে রামায়ণে তার সংহিতা পুরাণে। আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে।।
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে। কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে।।
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়। ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয়।।
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে। অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে।।
সত্ত্বরজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়। তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয়।।
বজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব। সত্ত্বগুণে পালন বিবিধ উপদ্রব।।
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম। বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম।।
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে। তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে।।
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান। সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান।।
তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়। ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়।।
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ। তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান।।
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়। তোমার এমন কথা এত বড দায়।।
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া। তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া।।
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে। বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে।।
ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ। পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্ত্তন।।

আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **হরি-পদরজঃ**—হরির পদধূলি; **সত্ত্বরজস্তমোগুণ**—প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণ—প্রথমটি সত্ত্ব—শ্রেষ্ঠ গুণ, মধ্যমাটি রজ এবং শেষেরটি তম—তম গুণটি নিকৃষ্ট।

শিবনামাবলী

জয় শিবেশ শঙ্কর . **বৃষধ্বজেশ্বর** : **মৃগাঙ্কশেখর** দিগম্বর।
জয় **শ্মশাননাটক** . বিষাণবাদক : **হুতাশভালক** মহত্তর॥
জয় সুরাবিনাশন . বৃষেশবাহন : ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক : ত্রিলোকপালক : ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর॥
জয় **রবীন্দুপাবক** ত্রিনেত্রধারক **খলান্ধকান্তক** : **হতস্মর**।
জয় **কৃতাঙ্গকেশব** : কুবের বান্ধব : **ভবাজ** ভৈরব পরাৎপর॥
জয় **বিষাক্তকণ্ঠক** : **কৃতান্তবঞ্চক** : ত্রিশূলধারক হতাধ্বর।
জয় পিনাকপণ্ডিত : পিশাচমণ্ডিত . বিভূতিভূষিত কলেবর॥
জয় কপালধারক : কপালমালক : চিতাভিসারক শুভঙ্কর।
জয় শিবামনোহর সতীসদীশ্বর : গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥
জয় কুঠারমণ্ডিত : কুরঙ্গরঙ্গিত : বরাভয়ান্বিত **চতুষ্কর**।
জয় সরোরুহাশ্রিত : বিধিপ্রতিষ্ঠিত : পুরন্দরর্চিত **পুরন্দর**॥
জয় হিমালয়ালয় মহামহোময় . বিলোকনোদয়চরাচর।
জয় পুনীহি ভারত · মহীশভারত : উমেশ **পর্ব্বতসুতাবর**॥

শব্দার্থ ও টীকা : **বৃষধ্বজেশ্বর**—শিব; **মৃগাঙ্কশেখর**—যাঁর শিবে চন্দ্রের অধিষ্ঠান—শিব; **শ্মশান-নাটক**—শ্মশানে যিনি নৃত্য করেন (শিব); **হুতাশভালক** - যাঁর কপালে ত্রিনয়নের অগ্নি (শিব); **রবীন্দুপাবক**—সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি; **খলান্ধকান্তক**—খল ও অন্ধকাসুর যিনি বধ করেন (শিব); **হতস্মর**—মদনকে যিনি ভস্ম করেন (শিব); **কৃতাঙ্গ-কেশব**—বিষ্ণু যাঁব কণ্ঠে বিষ আছে অঙ্গীভূত; **ভবাজ**—ভব ও অজ; বঞ্চক; **বিষাক্তকণ্ঠক**—যাঁর কণ্ঠে বিষ আছে , **কৃতান্তবঞ্চক**—কৃতান্ত ও বঞ্চক ; **চতুষ্কর** — চারটি হাত যাঁর; **পুরন্দর**- ইন্দ্র পূজিত ত্রিপুরনাশী শিব ; **পর্ব্বতসুতাবর**—পর্বতকন্যা বা পার্বতীর পতি।

ঋষিগণের কাশীযাত্রা

এইরূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ। শিবগুণ গান করি করিলা গমন॥
হাতে কানে কণ্ঠে শিরে রুদ্রাক্ষের মালা। বিভূতিভূষিত অঙ্গ পরি বাঘছালা॥
রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা ভালে। ববম্ ববম্ বম্ ঘন রব গালে॥
কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে। কমণ্ডলু **করঙ্গ** পূরিত গঙ্গাজলে॥
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরূপর। নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁপে বিশদ চামর॥
করেতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম। চলে মাহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম॥
ব্যাসদেব চলিলা বৈষ্ণবগণ লয়ে। উর্দ্ধভুজে উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ কয়ে॥
একেবারে হরি হবি হর হর রব। ভাবেতে অধীরা ধবা মানি মহোৎসব॥
বৈষ্ণব শৈবের দ্বন্দ্ব হরি হর লয়ে। দেবগণ গগনে শুনেন গুপ্ত হয়ে॥
অভেদে হইল ভেদ এ বড় দুর্ব্বোধ। কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ॥
ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে। ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **করঙ্গ**—ভিক্ষাপাত্র বা জলপাত্র।

হরিনামাবলী

জয় **কৃষ্ণ কেশব** : রাম রাঘব : কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন : নন্দনন্দন : **কুঞ্জকানন রঞ্জন**॥
জয় **কেশিমর্দ্দন** : **কৈটভার্দ্দন** : গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপবালক : **বৎসপালক** : **পুতনাবক নাশন**॥
জয় গোপবল্লভ : **ভক্তসল্লভ** দেবদুর্লভ বন্দন॥
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক পদ্মনন্দক মণ্ডন॥
জয় শান্তকালিয় : রাধিকাপ্রিয় . নিত্য নিষ্ক্রিয় মোচন।
জয় সত্য চিন্ময় : গোকুলালয় : দ্রৌপদীভয় ভঞ্জন॥
জয় দৈবকীসুত : মাধবাচ্যুত : শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় : সজ্জনোদয় · ভারতাশ্রয় জীবন॥

শব্দার্থ ও টীকা : **কৃষ্ণ কেশব**--বিষ্ণুর অবতার; **কুঞ্জকানন রঞ্জন**- -কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণ; **কেশীমর্দ্দন**-- কেশীমামক দৈত্যের নিধনকারী (কৃষ্ণ); **কৈটভার্দ্দন** -কৈটভনামক দৈত্য বিনাশক (কৃষ্ণ); **বৎসপালক**—রাখাল (কৃষ্ণ); **পুতনাবক নাশন**—পুতনা ও বকাসুরের নিধনকর্তা (কৃষ্ণ); **ভক্তসল্লভ**—ভক্তের কাছে লভ্য (কৃষ্ণ)।

ব্যাসের বা.াণসী প্রবেশ

এইরূপে ব্যাস গিয়া : বারাণসী প্রবেশিয়া : আদিকেশবেরে প্রণমিয়া।
সংহতি বৈষ্ণবগণ . হবিনাম সংকীর্ত্তন : নানা রসে নাচিযা গাইয়া॥
কীর্ত্তনিয়াগণ সঙ্গে : গান করে নানা রঙ্গে : বাল্য গোষ্ঠ দান বেশ রাস।
পূর্ব্বরঙ্গ বসোদগার : মাথুর বিরহ আর : হরিভক্তি যাহাতে প্রকাশ॥
বাজে খোল করতাল : কেহ বলে ভাল ভাল : কেহ কাঁদে ভাবে গদগদ।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে . বেদ পুরাণাদি তন্ত্রে : নানামতে গান বিষ্ণুপদ॥
কীর্ত্তনে ঢালিয়া দেহ · গড়াগড়ি দেয় কেহ . কেহ তারে ধরে দেয় কোল।
উর্দ্ধভুজে উর্দ্ধপদে . কেহ নাচে প্রেমমদে : কেহ বলে হরি হরি বোল॥
গোপকুলে অব.বি : যে যে ক্রীড়া কৈলা হরি : আদি অন্ত মধ্যে সে সকল।
এ মনে ব্যাস কন : শুনেন ভকতগণ : আনন্দে লোচনে ঝরে জল॥
গোলোকেতে গোপীনাথ : রাধা আদি গোপী সাথ · শ্রীদামাদি সহচরগণ।
নন্দ যশোদাদি যত : সব নিত্য অনুগত : কপিলাদি যতেক গোধন॥
সুধাসমুদ্রের মাঝে : চিন্তামণি দেবী সাজে : কল্পতরু কদম্ব কানন।
নানা পুষ্প বিকসিত · নানা পক্ষী সুশোভিত : সদানন্দময় বৃন্দাবন॥
কাম সদা মূর্ত্তিমান : ছয় ঋতু অধিষ্ঠান : রাগিণী ছত্রিশ আর যত।
ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে . সদা রাসরসরঙ্গে : নৃত্য গীত বাদ্য নানামত॥
গোলোক সম্পদ লয়ে : ভকতে সদয় হয়ে : অবতীর্ণ হৈলা ভূমণ্ডলে।
কংস আদি দুষ্টগণ : করিবারে নিপাতন : দৈবকীজঠরে জন্ম ছলে॥
বসুদেব কংসভয় : নন্দের মন্দিরে লয় : খ্যাত হৈলা নন্দের নন্দন।
পুতনা বধিতে চলে : বিষস্তনপান ছলে : কৃষ্ণ তার বধিলা জীবন॥
শকট ভাঙ্গিয়া রাঙ্গি : **যমল অর্জ্জুন** ভঙ্গি : **তৃণাবর্ত্তে** নিধন করিলা।
মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে . যশোদারে কুতূহলে : বিশ্বরূপ মুখে দেখাইলা॥
ননী চুরি কৈলা হরি : যশোদা আনিল ধরি : **উদূখলে** লইলা বন্ধন।

গোচারণে বনে গিয়া : **বকাসুরে** বিনাশিয়া : অঘ **অরিষ্টের** বিনাশন॥
বধ কৈলা **বৎসাসুর** : **কেশীরে** করিলা চুর : বল হাতে **প্রলম্ব** বধিলা॥
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি : গোবর্দ্ধন গিরি ধরি : বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা॥
ব্রজ পোড়ে দাবানলে : পান করিলেন ছলে : করিলেন কালিয়দমন।
সহচর পাঠাইয়া : যজ্ঞ অন্ন আনাইয়া : করিলেন কাননে ভোজন॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি : শিশু বৎসগণ হরি : রাখিলেন পর্ব্বত গুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি : শিশু বৎসগণ করি : বিধাতারে মোহিলা মায়ায়॥
গোপের কুমারী যত : করে **কাত্যায়নীব্রত** : হরি নৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে : মধুর মুরলী গেয়ে : রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া॥
করিতে আপন ধ্বংস : **অক্রুরে** পাঠায়ে কংস : হরি লয়ে গেল মথুরায়।
ধোপা বধি বস্ত্র পরি : কুব্জারে সুন্দরী করি : সুশোভিত মালীর মালায়॥
দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া : **চাণুরাদি** নিপাতিয়া : **কংসাসুরে** করিলা নিধন।
বসুদেব দৈবকীরে : নতি কৈলা নতশিরে : দূর করি নিগড়বন্ধন॥
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া : পড়িলা অবন্তী গিয়া : দ্বারকাবিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার : কতেক কহিব তার : বিখ্যাত ভারত ভাগবতে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **গোলক**—স্বর্গে কৃষ্ণের বাসস্থান; **পুতনা**—বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষ প্রচলিত কাহিনীতে কংশের অনুচরী, স্ত্রীবেশে নন্দের গৃহে প্রবেশ করে শিশু কৃষ্ণকে বিষ-মাখানো স্তন্য পান করাবার চেষ্টা করলে কৃষ্ণ স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনীশক্তিও শোষণ করতে থাকে, যন্ত্রণায় নিজ মূর্তি ধারণ করে আর্তনাদ করতে করতে মৃত্যু বরণ করে। **শকট**—কংসের অনুচর এক অসুর; **যমল অর্জুন**—বৃন্দাবনের দুটি গাছের নাম, **উদুখলে**—দড়ি; **বকাসুর**—কংসের অনুচর। কংসের নির্দেশে বক সেজে ব্রজধামে গিয়ে কৃষ্ণকে গিলে খেতে চেষ্টা করলে কৃষ্ণের স্পর্শে বকের গলদেশ আগুন লেগে পুড়তে থাকলে বকাসুরের মৃত্যু হয়। **অরিষ্ট**—বৃষভাকৃতি অসুর; **বৎসাসুর**—কংসের অনুচর-অসুর; **কেশী**—দনুর পুত্র—কংসের অনুচর দানব– কৃষ্ণকে হত্যা করতে কংস একে পাঠান; **প্রলম্ব**—কংসের আশ্রিত অসুর ; **কাত্যায়নি**—দশভূজা ভগবতী মূর্তি। ব্রহ্মাদি দেবতাদের তেজ মিলিত হয়ে দেবীর সৃষ্টি হয় মহিষাসুর বধের নিমিত্ত। অন্য একটি পুরাণে দেখা যায় রাবণ বধের নির্মিত দেবী রামের অস্ত্রে প্রবেশ করেন। ঋষি কাত্যায়ন প্রথম এঁর পুজো করেন বলে দেবীর নাম হয় কাত্যায়নী। **অক্রুর**—সম্পর্কে কৃষ্ণের কাকা—অন্য এক মতে উগ্রসেনের জামাতা, কৃষ্ণের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী—কৃষ্ণকে হত্যা করার মানসে কংস ধনুর্যজ্ঞ করেন—ঐ যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামকে উপস্থিত থাকার জন্য কংস অক্রুরকে বৃন্দাবনে পাঠান ওদের নিয়ে আসার জন্যে। অক্রুর অবশ্য কংসের মতলব আগেই কৃষ্ণকে জানিয়ে দেন; **চাণুরাদি**—কংসের মল্লযোদ্ধা; **উগ্রসেন**—কংসের পিতা।

ব্যাসের শিবনিন্দা

হরি হরি করে ভেদ : নর বুঝে না রে : অভেদ কহে চারি বেদ।
অভেদ ভাবে যেই : পরম জ্ঞানী সেই : তারে না লাগে পাপক্লেদ॥
যে দেহে হরি হরে : অভেদরূপে চরে : সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর : হইলা হরি হর : বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ॥

যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে . ভাবতে নাহি এই খেদ॥

এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ। উর্দ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন॥
সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি। সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ সার সর্ব্বদেহে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের **গোসাঁই**। মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে। শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল। **ভুজস্তম্ভ** কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস। শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারি দিকে শিষ্যগণ কাঁদিয়া বেড়ায়। কোন মতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥
গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িলা সঙ্কটে। কুণ্ঠভাবে উত্তরিলা ব্যাসের নিকটে॥
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা। আমার বন্দনা কবি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব। শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী। শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে কষ্ট। শিবেবে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়। শিব পূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে। শিবস্তব কব তবে উদ্ধার পাইবে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে। কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া। বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব **কাশীখণ্ডে**তে প্রকাশ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর। যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর॥
এই স্তব যে জন পড়িবে একমনে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে॥
এত শুনি বেদব্যাস পরম উল্লাস। তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে। অর্দ্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপালফলকে॥
ছিঁড়িয়া তুলসীকণ্ঠী লম্বিমালা যত। পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত॥
ফেলিলা তুলসীপত্র বিল্বপত্র লয়ে। ছাড়িলা হবির গুণ হরগুণ কয়ে॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হৌক পরিণাম। অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম॥
এইরূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা। অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

শব্দার্থ ও টীকা : **গোঁসাই**—শিরোমণি; **ভুজস্তম্ভ**—হাত যখন নড়ানো যায় না সেই অবস্থা ; **কাশীখণ্ড**—স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড অধ্যায়ে ব্যাসের শিব বিরোধিতার কাহিনী থাকলেও ব্যাসকাশীর উল্লেখ নেই।

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর। বিভূতিভূষিত কলেবর॥
তরঙ্গভঙ্গিত : ভুজঙ্গরঙ্গিত : কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
কুবের বান্ধব · বিভূতিবৈভব : ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল : পিশাচমণ্ডল : মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃপ্রভাযত : পদাম্বুজানত : সুদীন ভারত শুভঙ্কর॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে। নন্দীরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥

যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল। যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়। কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসীমালায়॥
হের দেখ তুলসীপত্রের গড়াগড়ি। বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম। রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে। কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা যেই ধরে গলে। তার গলে হরিহরে থাকি কুতূহলে॥
অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস। উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা। কাশীতে ব্যাসের অন্ন শিব কৈলা মানা॥
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর। ভিক্ষাহেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত। কিঞ্চিত না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন। গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন॥
বালক কুক্কুর সয়ে করে তাড়াতাড়ি। ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥
ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন। ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়। হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায়॥
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত। মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী। ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া। অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও। কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল। ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥
পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া। শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস। শিষ্য সহ সে দিন করিলা উপবাস॥
পরদিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইলা। ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা। কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

কাশীতে শাপ

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে। শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে॥

তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে॥
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।

ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে।

*ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী। আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ। কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥

অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী। কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে। ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে। যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়। ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায়॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া। আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা। ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥
জগতজননী মাতা সবারে সমান। শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী। সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা। তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা॥
মেঘে করে যেমন সকলে জলদান। তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া। তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরি হর প্রভৃতিরো শত্রু মিত্র আছে। শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া। আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া॥
হেন কালে পথে আসি কহেন মহেশ। কোথায় চলেছ থুয়ে কার্তিক গণেশ॥
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক। ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক॥
একে বুড়া তাহে **ভাঙ্গী** ধুতুরায় ভোল। অন্ন অপবাধে কব মহাগণ্ডগোল॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস। ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে। অদ্যাপি সে পাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥
কি হেতু কবিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে। সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥
এখনো যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়। আব বাব দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিযা। আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান। সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান॥
সভয় দেখিয়া **ভীমে** হাসেন অভয়া। বুড়াটির **ঠাট** হেদে দেখ লো বিজয়া॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান। তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান॥

শব্দার্থ ও টীকা : **আকাশ পবন জল অনল অবনী**—পঞ্চভূত ; **ভাঙ্গী**--সিদ্ধিখোর , **ভীমে** শিবকে **ঠাট** --চালচলন।

অন্নদার মোহিনী রূপ

এ কি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণরঙ্গিমা॥
হইতে সোঁসর শম্ভু হৈলা হর
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা।
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা॥
ফুলধনুতনু লাজে তেজে ধনু
দেখি ভুরু ধনু বক্রিমা।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি কবে মহিমা॥

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥

কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া। লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে। ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে। পদনখে রহিয়াছে দশগুণ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দুরে মাজিয়া। হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী। ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে যিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা। চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলি শাড়ী বিজুলী চমকে। মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি। ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সে রূপ কিরূপ কব আমি। যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবের নিকটে আসিয়া॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া। অতিবৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমসুন্দরী। কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥
শুন ব্যাস গোসাঁই আমার নিবেদন। নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথিভক্তিমান। অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান॥
তপস্বী তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর। ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল। কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল॥
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী। কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি॥
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয়া। নিরুপমগুণা তুমি নিরুপমদয়া॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি। পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী। ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি। ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানি॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী। সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই। অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে। কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদুমধুস্বরে॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি। শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া। অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পুরিয়া॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত। ভোজন করিলা সবে বাসনার মত॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা। হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে। হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও। বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও॥

শব্দার্থ ও টীকা : **মৃগমদবিন্দু**—কস্তুরিটিপ; **মৃগ কোলে**—মৃগাকৃতি চাঁদের গায়ের কালো দাগ; **নিরুপমবয়া**—অপূর্ব অবয়ব ; **আচমন**—পুজোর আগে জলদ্বারা বিধি-অনুযায়ী দেহশুদ্ধি, খাওয়ার পর হাতমুখ ধোওয়া।

শিবব্যাসে কথোপকথন

নন্দনন্দিনি সুরবন্দিনি
রিপুনিন্দিনি গো॥

জয়কারিণি ভয়হারিণি
ভবতারিণি গো॥
জটজালিনি শিরমালিনি
শশিভালিনি সুখশালিনি
কববালিনি গো।
শিবগেহিনি শিবদেহিনি
শিবরোহিণি শিবমোহিনি
শিবসোহিনি গো॥
গণতোষিণি ঘনঘোষিণি
হঠদোষিণি শঠরোষিণি
গৃহপোষিণি গো।
মৃদুহাসিনি মধুভাষিণি
খলনাশিনি গিবিবাসিনি
ভাবতাশিনি গো॥

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমি ত পণ্ডিত। কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা কর্ম্ম তার। কি কর্ম্ম করিলে পায় পবলোকে পাব॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস। তপস্যার নানা ভেদ প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য। স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া। আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি যত তপঃ ক্রিয়া। জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়। সেই রূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয়॥
উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর। উছলিয়া গঙ্গাজল ঝবে ঝর ঝব॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহি লক লক। অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল। অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ। ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক। শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
বধিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে। ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জনে গর্জ্জনে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর। অভেদ যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ। কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে। আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ। কোন্ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ। কেন শাপ দিলি, অরে বিটলা বামন॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও। এই ক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর। পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে। ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে। চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ। বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥

জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
জগৎপিতা মহাদেব তুমি জগন্মাতা। হরি হর বিধাতার তুমি যে বিধাতা॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়। যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয়॥
পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম। বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল। সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে। এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে। শঙ্করি করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্ব্বদা। কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা। শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা। কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান। নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী হৈতে যান॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়। লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায়॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়াতাড়ি। শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : বিটলা—দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন।

ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ

কাশীতে না পেয়ে বাস · মনোদুখে বেদব্যাস : বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা : কাশীতে রহিল তারা : আমার না হৈল কাশীবাস॥
এ বড় রহিল শোক · কলঙ্ক ঘুষিবে লোক . ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত · সকলি হৈল হত : ভাঙ্গড় করিল দর্প চূর॥
তেজোবধ হয় যার : প্রাণবধ ভাল তার : কোনখানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস : ইনি সেই বেদব্যাস : কাশীতে না হৈল যাব ঠাঁই॥
যদি করি বিষপান . তথাপি না যাবে প্রাণ : অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় : মরণ না হবে তায় : চিরজীবী করিলা গোসাঁই॥
ভবিতব্য ছিল যাহা . অদৃষ্টে করিল তাহা : কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস · এইখানে পরকাশ : করিব দ্বিতীয় বারাণসী॥
করিয়াছি যত তপ . করিয়াছি যত জপ : সকলি করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব · এইখানে প্রকাশিব : কাশীর যে কিছু আয়োজন।
কাশীতে করিলে জীব : রামনাম দিয়া শিব : কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই · সদ্যমুক্ত হবে সেই : না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে॥
অসাধ্য সাধন যত : তপস্যায় হয় কত : তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া : তপস্যায় ভর দিয়া : বিশ্বামিত্র না করিল কিবা॥
মোরে খেদাইল শিব · তার সেবা না করিব : বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন : কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই॥
বিধাতা সবার বড় তাঁহারে করিব দড় : যাঁহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন · অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি।
তাঁরে তুষি তপস্যায় · বর মাগি তাঁর পায় : সকল পাইব এথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম : জাগাইব নিজ নাম : নাম থুব ব্যাসবারাণসী॥

গঙ্গা মহাতীর্থ জানি : গঙ্গারে এখানে আনি : আগে ত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি : মোক্ষ-কপাটের কুঁজি : গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই।।
গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম : জানিত কে তার নাম : আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে : অবশ্য আসিতে পারে : ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস।।
এত করি অনুমান : গঙ্গারে আনিতে যান : বেদব্যাস মহাবেগবান্।
গঙ্গার নিকটে গিয়া : ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া : গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান।।
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি : করিলেন অনুমতি : রচিবারে অন্নদামঙ্গল।
ভারত সরস ভণে : শুন সবে একমনে : ব্যাসদেব গঙ্গার কন্দল।।

শব্দার্থ ও টীকা : **ভাঙ্গড়**—ভাঙ খায় যে—এখানে শিব; **কুঁজি**—চাবি।

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

ব্যাস কন গঙ্গে · চল মোর সঙ্গে : আমি এই অভিলাষী।
কাশী মাঝে ঠাঁই · শিব দিল নাই : করিব দ্বিতীয় কাশী।।
তমোগুণী শিব : তারে কি বলিব : মত্ত ভাঙ্গ ধুতুরায়।
ডাকিনীবিহারী : সদা কদাচারী : পাপ সাপগুলা গায়।।
শ্মশানে বেড়ায় : ছাই মাখে গায় : গলে মুণ্ডঅস্থিমালা।
বলদ বাহন : সঙ্গে ভূতগণ : পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা।।
যত অমঙ্গল : সকল মঙ্গল : তাহারে বেড়িয়া ফিরে।
কেবল আপনি : **পতিতপাবনী** : তুমি আছ তেঁই শিরে।।
জটায় তাহার : তব অবতার : তাই সে সকলে মানে।
তোমার মহিমা : বেদে নাহি সীমা : অন্য জন কিবা জানে।।
যত অমঙ্গল : শিবে যে সকল : মঙ্গল তোমার প্রেম।
নানা দোষময় · লোহা যেন হয় : পরশ পরশি হেম।।
যে কারণ নীর : ব্রহ্মাণ্ড বাহির : যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে।
বিধি হরি হর : আদি চরাচর কত হয় কত নাশ।।
সে কারণ নীর : তোমার শরীর তুমি ব্রহ্মা সনাতন।
সৃজন পালন · নাশের কারণ : তোমা বিনা কোন জন।।
যেই **নিরঞ্জন** : চিৎরূপী হন : জনার্দ্দন যারে কয়।
দ্রবরূপে সেই : গঙ্গা তুমি এই : ইহাতে নাহি সংশয়।।
তোমা দরশনে : মোক্ষ সেই ক্ষণে : না জানি স্নানের ফল।
প্রায়শ্চিত্তভয় : সেখানে কি হয় : যেখানে তোমার জল।।
তুমি নারায়ণী : পতিতপাবনী : কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি : প্রকাশহ কাশী : তারহ সঙ্কট ঘোর।।
যে মরে কাশীতে · তারে মোক্ষ দিতে : রামনাম দেন শিব।
আর কত দায় : ভোগ হয় তায় : তবে মোক্ষ পায় জীব।।
কাশীতে আমার কৃপায় তোমার : এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি : নির্ব্বাণ তখনি : বিচার না রবে তাহে।।
ব্যাসের এমন : শুনিয়া বচন : গঙ্গার হইল হাসি।
ভারত কহিছে : মোরে না সহিছে : তুমি কি করিবে কাশী।।

শব্দার্থ ও টীকা . **পতিতপাবনী**—গঙ্গা এই নামেও পরিচিত। **নিরঞ্জন**—কলঙ্কহীন, নির্মল।

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস। কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস॥
কে তুমি কি শক্তি আছে তোমার। শিব বিনা কাশী কে করে আর॥
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল। লীলায় **অন্ধক** সেই বধিল॥
কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই। কামিনী লইয়া বিহরে সেই॥
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার। ভব নাম ভব করিতে পার॥
যাঁহার জটায় পাইয়া ধাম। গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম॥
কারণজল মোরে বল যেই। কারণজলের কারণ সেই॥
না ছিল সৃষ্টির আদি যখন। কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥
থুইলা আপন শূলের আগে। পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে॥
করিবেন যবে প্রলয় হর। রাখিবেন কাশী শূল উপর॥
তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী। পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি॥
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত। জলনাশে নহে তার নিপাত॥
তবে যে কহিলা তারক নামে : মোক্ষ দেন শিব কাশীব ধামে॥
তুমি কি বুঝিবা তার চলনি। আপনার নাম দেন আপনি॥
আমার বচন শুন হে ব্যাস। কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥
শিবনিন্দা কর এ দায় বড়। শিবপদে মন করহ দড়॥
শিবনিন্দা তুমি কর কেমনে। দক্ষযজ্ঞ বুঝি না পড়ে মনে॥
পুন না নিন্দিহ আমার কাছে। যে শুনে তাহার পাতক আছে॥
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী। এ সব কথায় না থাকি আমি॥
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ। ভারত কহিছে এ বড় দোষ॥

শব্দার্থ ও টীকা : **অন্ধক**—শক্তিমান অসুর, যার এক হাজার হাত, দু হাজার চোখ এবং দুহাজার পা ছিল ; **কারণ জল**—পবিত্র বারি।

ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার

ব্যাসের হইল ক্রোধ : তেয়াগিয়া উপরোধ : গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম : বুঝিনু তোমার মর্ম্ম : তুমি মোরে হাস উপহাসে॥
তোরে অন্তরঙ্গ জানি . করিনু যুগলপাণি : উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত : আর কহ অনুচিত : দৈবে করে কি দোষ তোমার॥
আমি যারে প্রকাশিনু : আমি যারে বাড়াইনু : সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে : পতঙ্গ প্রহার করে : এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥
উচিত কহিব যদি · নদীমধ্যে তুমি নদী : পূর্ণতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু যেই : পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই : নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥
জহ্নু মুনি করে ধরি : পিলেক গণ্ডুষ করি : কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে : জানাইনু তিন পুরে : জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥
শান্তনু রাজারে লয়ে : ছিলি তার নারী হয়ে : তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা : হয়েছ শিবের দারা : তোর সমা পূণ্যবতী কেটা॥
পেয়েছ শিবের জটা : তাহাতে সাপের ঘটা : কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল : ভূতভৈরবের রোল : কোন্ সুখে আছ কোন্ রাগে॥
স্বভাবতঃ নীচগতি : সতত চঞ্চলমতি : কভু নাহি পতির নিয়ম।

যে ভাল ভজিতে পারে : পতি ভাব কর তারে : সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ : জাতি কুল নাহি বাছ : রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই : ক্ষীর পান করে যেই : পতি কর কোলে মাত্র পাও॥
আপনার পক্ষ জানি : কহিলাম তোরে আনি : তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা : তোমার শকতি কিবা : **বিষ্ণুপাদোদক** বিনা নহ॥
শাপ দিয়া করি ছাই · অথবা গণ্ডুষে খাই · ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই : ব্রহ্মতেজ জানে সেই · অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥
ব্যাসদেব এইরূপে : মজিয়া কোপের কূপে · গঙ্গার করিলা অপমান।
ভারত সভয়ে কহে : মোরে যেন দয়া রহে . স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥

শব্দার্থ ও টীকা : মাতঙ্গ—হাতি ; **দরে**—গর্তে ; **বিষ্ণু পাদোদক**—বিষ্ণুর পা ধোওযা জল।

গঙ্গাকৃত ব্যাস তিরস্কার

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে। ব্যাসেরে ভর্ৎসিয়া কন মহাক্রোধ মনে॥
শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা। এই অহঙ্কারে কাশী বাস না পাইলা॥
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা। শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি। বেদমত পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ। আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী। সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা। শিবঅংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি। আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥
আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে। কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ। রচিয়াছ আপনি পরমজ্ঞানবান॥
তাহে কহিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম। ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥
পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই। ব্রাহ্মণের লক্ষণে ব্রাহ্মণ বটে সেই॥
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণী তো নহে। তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥
পরাশর **অপসর** তোর জন্ম নিয়া। শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈলা বিয়া॥
বৈপিত্র দুই ভাই তাহে জন্মিল তোমার। একটি **বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ** আর॥
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈলা তারা। যৌবনে মরিল দুটি বউ রৈল সারা॥
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী। তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি॥
তুবি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন। জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র **পাণ্ডু** দুই জন॥
কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া। সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন। তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার। উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল। সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল॥
তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া। পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥
জন্ম কর্ম্ম কথা সব সমান তোমার। তুমি কলঙ্কের ডালি কলঙ্ক আমার॥
ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়। ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥
ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়। ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥
তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ। সে জানে মহিমা মোর তারে গিয়া কহ॥
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান। গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥

ভারত কহিছে ব্যাস ধিরি ধিরি ধিরি। গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥
দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে। দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান। ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী। নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

শব্দার্থ ও টীকা : **অপসর**—অপসৃত হলেন; **বৈপিত্র**—একই মায়ের গর্ভে বিভিন্ন পিতার ঔরসে জাত সন্তান; **বিচিত্রবীর্য**—সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর পুত্র—স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা, বিবাহের সাত বছরের মধ্যে সন্তানহীন অবস্থায় যক্ষ্মারোগে মারা যান; **চিত্রাঙ্গদ**—ইনিও সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর পুত্র। ভীষ্ম উভয়ের বৈমাত্র ভাই। শান্তনুর মৃত্যু হলে ভীষ্ম অপ্রাপ্তবয়স্ক চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসান। একই নামে এক গন্ধর্ভরাজের সঙ্গে যুদ্ধে এঁর মৃত্যু হয়। এঁর মৃত্যুব পর বিচিত্রবীর্য সিংহাসনে বসেন; **পাণ্ডু**—বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র অম্বালিকার গর্ভে জন্ম—সত্যবতীর নির্দেশে অম্বালিকা ব্যাসের কাছে যান—কুৎসিৎ দর্শন ব্যাসকে দেখে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে পড়েন—গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হলে নাম রাখা হয় পাণ্ডু ; **নারসিংহী**—সিংহের পিঠে অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গিতে বসা—দেবীব সিংহ মুখ—বাহনও হা করে গর্জন করে যাচ্ছে—এ ধরনের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে, ইনি নৃসিংহ-অবতাররূপী নারায়ণের লক্ষ্মীরূপেও কল্পিত।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা

আসনে বসিয়া . উন্মনা হইয়া : ভাবেন ব্যাস গোঁসাই।
এই বড় শোক . হাসিবেক লোক : মোর কাশী হৈল নাই॥
বিশ্বকর্ম্মা আছে . তারে আনি কাছে : সে দিবে পুরী গড়িয়া।
মোক্ষের উপায : শেষে করা যায় : ব্রহ্মার বর লইয়া॥
করি আচমন : যোগে দিয়া মন : বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে বিশাই সত্বরে : আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥
বিশাই দেখিয়া . সানন্দ হইয়া : বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্ম · জান বিশ্বমর্ম্ম : তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ॥
তুমি বিশ্ব গড : তুমি বিশ্বে বড় : তেঁই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা : কেবা জানে সীমা : কেবা জানে গুণগ্রাম॥
বিধাতা হইয়া . বিশ্ব নিরমিয়া : পালহ হইয়া হরি।
শেষে হয়ে হর : তুমি লয় কর : তুমি ব্রহ্ম অবতরি॥
আমাতে কাশীতে : না দিলে রহিতে : ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে : আমি এখানে : করিব দ্বিতীয় কাশী॥
ঠেকিয়াছি দায় : চাহিয়া আমায় : নির্ম্মাহ পুরী সুসার।
মোক্ষের নিদান : করিতে বিধান : সে ভার আছে আমার॥
এ সঙ্কট ঘোরে : তার যদি মোরে : তবে ত তোমারি হব।
ত্রিদেবে ছাড়িয়া : ব্রহ্মপদ দিয়া : তোমারে পুরাণে কব॥
বিশাই শুনিয়া : কহিছে হাসিয়া : তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাসবারাণসী : গড়ি দেখ বসি : আমারে ব্রহ্মা করিবা॥
যে হয় পশ্চাৎ : দেখিবে সাক্ষাৎ : মোরে পুরীভার লাগে।

কাশীর ঈশ্বর : খ্যাত বিশ্বেশ্বর : তাঁর পুরী গড়ি আগে॥
বিশ্বেশ্বর নাম : সর্ব্বশুভধাম : বিশাই যেই কহিল।
দৈব রুষ্ট যার : বুদ্ধি নাশে তার : ব্যাসের ক্রোধ হইল॥
অরে রে বিশাই : তুই ত বালাই : কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ : যার সঙ্গে বাদ : তাহারে আনিতে চায়॥
সভয় অন্তর : নহ স্বতন্তর : ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি : যারে তারে মানি . বেগার খাটিতে জান॥
তপোবলে কাশী : দেখ পরকাশি : দূর হ রে দুরাচার।
তোর গুণধর : যত কারিকর : হইবে দুঃখী বেগার॥
বিশাই শুনিয়া : কহিছে হাসিয়া : বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা : কাশী প্রকাশিবা : কেন কর হেন আশ॥
নাহি জান তত্ত্ব : নাহি বুঝ সত্ত্ব : শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর : অনন্ত অজর : আদ্য বিভু নিরঞ্জন॥
কার্য্য সাধিবারে : এই যে আমারে : এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার : কি দেখ আমার : কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন : দেখহ দুর্জ্জন · তাহারে ব্রহ্মা বলহ।
এইরূপে কত : কয়ে নানা মত : লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান : গেলা নিজ স্থান : ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত : এ নহে ভারত . কবিবে কথামথায়।

শব্দার্থ ও টীকা : সুসার—সুসজ্জিত; **ত্রিদেবে**—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বব।

ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥
রঙ্গ তবঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয়
অর্পয় সর্পকলাপম্।
মহিষবিষাণরবেণ নিবাবয়
মম রিপুশমনলুলাপম্॥
কনক কুসুম পরিশোভিত কর্ণে
কর্ণয় ভক্ত কপালম্।
নিগদতি ভারতচন্দ্র **উমাধব**
দেহি পদং **দুরবাপম্**॥

ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন। অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া। বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া। কহিছেন প্রজাপতি পিরীত কবিয়া॥
অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল। শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে। তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥
শিবনাথ জপ কর যেথা সেথা বসি। যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে। কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥

শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা। আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা।।
আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন। এক মাথা কাটিয়া লইলা পঞ্চানন।।
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর।।
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে। বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে।।
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল। কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল।।
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল। অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল।।
তার সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই। জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোঁসাই।।
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজস্থানে। ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে।।
যে হৌক সে হৌক আরো কবিব যতন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন।।
অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার। কাশীর ঈশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর।।
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা। বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা।।
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা। শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা।।
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়। অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়।।
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি। তবে সে হইবে মোর ব্যাসবারাণসী।।
এত ভাবি ব্যাসদেব মনে কৈলা স্থির। অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর।।
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ। কত **পুরশ্চরণ** করিলা কত জপ।।
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।।

শব্দার্থ ও টীকা . **নিগদতি**—জপ করছেন; **উমাধব**—উমাপতি; **দূরবাপম**—দুষ্প্রাপ্য। **পুরশ্চরণ**—তান্ত্রিক অনুষ্ঠান; অনুষ্ঠানের পাঁচটি অঙ্গ : মন্ত্রজপ, মন্ত্রদ্বারা হোম, মন্ত্রদ্বারা তর্পণ, মন্ত্রদ্বারা অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন।

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য

গজানন ষড়ানন : সঙ্গে করি পঞ্চানন : কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী : অন্ন দেন হৃষ্টমতি : ভোজন করিছে ভূতগণ।।
ছয় মুখ কার্ত্তিকের : গজমুখ গণেশের · মহেশের নিজে মুখপঞ্চ।
কত মুখ কত জন : বেতাল ভৈরবগণ . ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ।।
লেগেছে সিদ্ধিব লাগি : খেতে বড় অনুরাগী : বার মুখ তিন বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি : অন্ন দেন গুটি গুটি : থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে।।
অন্নদা বুঝিলা মনে : কৌতুক আমার সনে : বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় : পাতে পাতে অপ্রমেয় : পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ।।
খাইবেন কেবা কত : সবে হৈলা বুদ্ধিহত : অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি : কে রাখিবে করি বাসি : খেতে হবে খাও খাও খাও।।
এইরূপে অন্নপূর্ণা : খেলারসে পরিপূর্ণা : নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ : অন্নদার লয়ে পাছ : ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে।।
ব্যাস জপে অনশনে : অন্নদা জানিলা মনে : ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে : হাত হৈতে হাতা পড়ে : উছট লাগিয়া পদ টলে।।
দুর্দ্দৈব যখন ধরে : ভাল কর্ম্মে মন্দ করে : অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ : নিগ্রহে ঠেকিলা ব্যাস : ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ।।
ভাবে বুঝি ক্রোধভর : জিজ্ঞাসা করিলা হর : কেন দেবি দেখি ভাবান্তর।
অন্নদা কহেন হরে : ব্যাস মুনি তপ করে : অনশন কৈল বহুতর।।

তুমি ঠাঁই নাহি দিলে : কাশী হৈতে খেদাইলে : তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী : হইয়াছে অভিলাষী : সেই হেতু করে মোর ধ্যান॥
হাসিয়া কহেন হর : বুঝি তারে দিবা বর : মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই : জানি নাই তোমা বই : এক মুটা অন্ন মেনে দিও॥
সক্রোধে কহেন শিবা : কৌতুক করহ কিবা : কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ . তোমা সনে করি বাদ : করিবেক ব্যাসবারাণসী॥
তবে যে কহিবে মোর : তপস্যা করিলে ঘোর : কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময় : না বুঝিয়া দুরাশয় : বিরক্ত করিল অত্যাচারে॥
বলি রাজা ভগবানে : ত্রিপাদ ধরণী দানে : অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া : শাপ দিব বর দিয়া : শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন॥
মহামায়া মায়া করি : জরতী শরীর ধরি। ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণাপদতলে : ভারত বিনয়ে বলে : রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা॥

শব্দার্থ ও টীকা : **প্রপঞ্চ** —বিস্তার, মায়া; **অপ্রমেয়**—সুপ্রচুর ; **উছট**—হোঁচট।

অন্নদার ভারতীবেশে ব্যাস ছলনা

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা। বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর : কত কায়া ধর : হেরি হরি হর হারে।
জিতজরামর : হয় সেই নর : তুমি দয়া কর যারে॥
এ ভব সংসারে : যে ভজে তোমারে : যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে · যদি না চাহিবে : ভারত ডাকিবে কারে॥

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি **আঁদি সাঁদি**। হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন **কেয়াকাঁদি**।
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি। কুটকুটি **কানকোটারির** কিলিকিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিয়া অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত **গাঁটি** ছিঁড়া **টেনা** করি পরিধান। ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী **লড়ি** আহা উহু কয়ে। জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়। কুঁজভরে **পিঠডাঁড়া** ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া। অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে। পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই। কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে কত ভোগ আছে। তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই। মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয়. কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়। সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হইতে বড়। মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর। সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া। মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥

তোর মনে আমি বুঝি এখনি মরিব। সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
উৰ্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত। অন্ন বিনা অন্ন বিনা সুখায়েছে **আঁত**॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি। বাতে করিয়াছে খোঁড়া **চলি গুড়ি গুড়ি**॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে। কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে॥
কানকোটারিতে মোর কান কৈল কালা। কেটা মোরে বুড়ী বলে এ ত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান। আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের। শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া। পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও। এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধৰ্ম্ম অল্পে হয় রোষ। ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে। পুন কহ কি হইবে এখানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে। সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥
বুড়ী কন হায় বিধি করিলেক কালা। কি বল বুঝিতে নারি এ ত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি। ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিল। পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত। ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥
দৈবযোগে ব্যাসদেব উপজিল ক্রোধ। বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি **সুঝে**। বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কানের কুহরে। গৰ্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কান। তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তৰ্দ্ধান॥
বুড়ি না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা। হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু। হায় যে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়। মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল। কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া। কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি। বাক্যদোষে হইল গৰ্দ্দভবারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়। ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়॥

শব্দার্থ ও টীকা : **জিতজরামর**—জরা জয় করে যিনি অমর; **আঁদি-সাঁদি**—গোছানো, শৃঙ্খলা; **কেয়াকাদি**—কেতকী ফুলের মঞ্জরী; **ডেঙ্গর**—বড় উকুন; **নীক**—ছোট উকুন; **ইলিবিলি**—চলাফেরা; **কানকোটারি**—এক ধরনের ছোট পতঙ্গ; **কোটরে**—গর্তে; **গাঁটি**—গিট দেওয়া, গ্রন্থিযুক্ত; **টেনা**—বস্ত্র; **লড়ী**—লাঠি; **পিঠভাঁড়া**—মেরুদণ্ড; **উৰ্দ্ধগ বিকারে**—বায়ুর উর্ধ্বচাপ জনিত রোগ; **আঁত**—অন্ত্র, নাড়ি; **চলি গুড়ি গুড়ি**—হামাগুড়ি দিয়ে চলা; **শিরঃশূলে**—মাথার ব্যথায়। **সুঝে**—দেখে; **ভবিতব্যং ভবত্যেব**—যা হবার তা এভাবেই হয়।

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী

ভুল না রে অরে নর . শঙ্কর সার কর : শমনেরে কেন ডর॥
দূর হবে পাপ . চূর হবে তাপ : গঙ্গাধারে ধ্যানে ধর॥

শঙ্কর শঙ্কর : এ তিন অক্ষর : মালা করি গলে পর।
এ ভব সাগরে : না ভজিয়া হরে : কেন মিছা ডুবি মর॥
ভারতের মত : শুন রে ভকত : ভবে ভজি ভব তর।

বিরসবদন দেখি ব্যাস তপোধনে। কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ। এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ॥
জ্ঞানঅহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া। শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে। শিবে স্তুতি করি পাব পাইলা সঙ্কটে॥
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে। সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আরো কৈলা পাপ। না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ॥
অন্ন বিনা শিষ্য সহ উপবাসী ছিলে। আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে॥
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর। নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর॥
আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া। সে দিন রুদ্রেব ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥
তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ। কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলীর। যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥
ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল। জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার। নিগম আগম আদি কেবা জানে পার॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত। খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ। অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে। মণিকর্ণিকাব স্নানে পাইবে আসিতে॥
এখানে মরিবে যেই গর্দ্দভ হইবে। এই হৈল গর্দ্দভকাশী অন্যথা নহিবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন। উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া। বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাসবদনে। নরলোকে মোব পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যৎ বাণী। কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর। দিবেক পুষ্পেব ভার তাহার উপর॥
বমণীসম্ভোগ তার কাননে হইবে। সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে। ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার। কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে। হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার। তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায়॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়। হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড়॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **খুঁয়ে তাঁতী**—তিসি গাছের বাকলের সুতোয় যে বস্ত্র বয়ন করা হয়।

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ

কুবেরের অনুচর : নাম তার বসুন্ধর : বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুই জনে হৃষ্টমনে : ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে : নানা রস জানে নানা মায়া॥

চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে : অন্নদার পূজা দিতে . নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবারে তরে : ডাক দিয়া বসুন্ধরে · কুবের দিলেন অনুমতি॥
কুবেরের আজ্ঞা পায় : বসুন্ধর বেগে ধায় : কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।
নানা জাতি তুলে ফুল : যাহে মত্ত অলিকুল : যার গন্ধে মদন মোহিত॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা . বসুন্ধরা রতিলোভা : বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুলগুণে ফুলবাণ . ফুলধনু দিয়া টান · ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত : কামানল কর শান্ত . মোরে আর বিলম্ব না সহে।
কোকিলহুঙ্কার কাল : ভ্রমর ঝঙ্কার শাল : মলয়পবনে তনু দহে॥
বসুন্ধর বলে প্রিয়া : আগে আসি ফুল দিয়া · অন্নপূর্ণা পুজিবে কুবের।
পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে : বিহার করিব রঙ্গে · এ সময় নাহি দিও ফের॥
অষ্টমীরে **পর্ব্ব** কয় . ইথে রতি যুক্ত নয় : অন্নদার ব্রততিথি তায়।
আমার বচন ধর : আজি রতি পরিহর : পূজা কর অন্নদার পায়॥
বসুন্ধরা বলে প্রভু : এমন না শুনি কভু . এ কথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায় : রোঝা গিয়া ঝাড়ে তায় . তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে।
কাম কাল বিষধর : বিষে আমি জর জর . তুমি সে ঔষধ জান তার।
অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে : অন্নদার নাম লয়ে : আরম্ভিলা কত ফের ফার॥
অন্নপূর্ণা কি করিবে : অষ্টমী কি সুখ দিবে · যে সুখ পাইবে রতিসুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি : সিন্ধু মথি দুঃখভাগী . সে সুধা সঘনে পেও মুখে॥
এই যে তুলিলা ফুল : কে জানে ইহার মূল : বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।
দেখ দেখি মহাশয় : সম্ভোগে কি সুখ হয় . তোমায় আমায় গলে দিলে॥
মালা গাঁথি এই ফুলে : দিয়া দেখ মোর চুলে : মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত রতি রঙ্গে : পড়িলে তোমার অঙ্গে : ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে॥
এইরূপে বসুন্ধরে · বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে : বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যানে জ্ঞানে : যে করে কামের বাণে : বসুন্ধর মদনে মাতিল॥
সেই ফুলে শয্যা করি : সেই ফুলে মালা পরি : রতি রসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি : অন্নদাপূজায় মাতি : একমনে ধ্যান আরম্ভিল॥
সংহতি বিজয়া জয়া : কুবেরে করিয়া দয়া : অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুষ্পের **ব্যাজ** : কুবের যক্ষের রাজ : সভয় হইল কম্পমান॥
অন্নদা অন্তরে জানি : কুবেরে নিকটে আনি : দয়ায় অভয়দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে : বান্ধি আনিবার তরে : ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা॥
ডাকিনী যোগিনীগণ : প্রবেশিলা কুঞ্জবন : বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে।
সেই ফুলমালা সঙ্গে : বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে : আনি দিল অন্নদা গোচরে॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে : শাপ দিল দুই জনে : যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভূবনে যাও : মনুষ্যশরীর পাও : ভারতের এই যুক্তি সার॥

শব্দার্থ ও টীকা : **পর্ব্ব**—চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি— এই পাঁচদিন পর্ব নামে অভিহিত হয়। পর্বদিনে মৈথুন নিষিদ্ধ ; **ব্যাজ**—বিলম্ব করা।

বসুন্ধরের বিনয়

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা।
অন্নপূর্ণা মহামায়া : দেহ চরণের ছায়া : শাপে কৈলা জিয়ন্তেতে মরা॥

অজ্ঞানে করিনু দোষ : ক্ষমা কর **অভিরোষ** : তুমি দেবী জগতজননী।
ভস্ম না করিলে কেন : কেন শাপ দিলে হেন : কোন সুখে যাইব ধরণী।।
অপরাধ অল্প মোর : শাপ দিলা অতি ঘোর : নরলোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুখে : উর্দ্ধপদে হেঁটমুখে : মূলমূত্রে ভূষিত থাকিব।।
ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ : না পাব জ্ঞানের লেশ : পরদুঃখে হইব দুঃখিত।
মহাপাপ থাকে যার : গর্ভবাস হয় তার নিগম আগমে সুবিদিত।।
গর্ভবাস পাছে হয় : ব্রহ্মাদিরো এই ভয় . সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে।
ভব ঘোর পারাবারে : তোমা বিনা কেবা পারে : যে তোমা না ভজে সেই মজে।।
অপরাধ হইয়াছে : আর কত শাস্তি আছে : **কুম্ভীপাক রৌরব** ভৃতি।
তাহে যেতে মন লয় : মরতে যাইতে ভয় : বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি।।
ক্রন্দনেতে দুহাঁকার : দয়া হৈল অন্নদার . কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্ত্যলোক : না পাইবে রোগ শোক : না পাইবে গর্ভের যাতনা।।
হয়ে মোর ব্রতদাস : মোর পূজা পরকাশ · মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি : পুন হবে স্বর্গবাসী : আমি সঙ্গে রব নিরন্তর।।
শুনি বসুন্ধর কয় : ইহা যদি সত্য হয় তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ যথা : কৈলাস কৌশল তথা : চতুর্ব্বর্গ সেইখানে হয়।।
যদি সঙ্গে যাহ তুমি : তবে আমি যাই ভূমি : এই বর দেহ দাঁড়াইয়া।
পাতালেতে গিয়া বলি : ছিল যেন কুতূহলী : গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া।।
এত বলি বসুন্ধর : যোগাসনে করি ভর : জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে : চলিলা দুজনে লয়ে : রায় গুণাকর বিরচিল।।

শব্দার্থ ও টীকা : অভিরোষ— ক্রোধ; **কুম্ভীপাক রৌরব**—নরকের নাম।

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে। সমাধিতে দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে।।
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে। আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে।।
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার। কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার।।
সপ্ত-দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ।।
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান। সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান।।
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান। তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান।।
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী। সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী।।
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া। এ গ্রামে কে বড় দুঃখী দেখহ ভাবিয়া।।
তার ঘরে জন্মিবে আমার বসুন্ধর। বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর।।
হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।।
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন। ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।।
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার। গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার।।
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি। মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি।।
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া। হের আস বলি তারে ডাক দিল জয়া।।
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়। মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়।।
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে। হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে।।
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন। কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন।।

পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী। পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে। যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়। কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়।
বাহান্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে। বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥
এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে। সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥
যে বল সে বল আমি যাব নাহি কাছে। অভাগীর ঠাঁই বল কিবা কার্য্য আছে॥
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা। কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা॥
আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে। সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর। কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায়। হইবেক নাম ডাক রাজায় প্রজায়॥
মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে। বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিয়া তাহাতে॥
কানে কানে কহিলেন যতনে রাখিবে। ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে।
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান। দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে। হায় রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে॥
পেয়েছিনু মানিক আঁচলে না বান্ধিনু। নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু॥
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা। অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা॥
হরিষ বিষাদে রামা গেল নিজালয় । দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়॥
স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল। পতিসঙ্গে রতিরঙ্গে গর্ব্ভিণী হইল॥
শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস। এক দুই দিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা। দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই। ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥
আপনি দিলেন ছলু নাড়ীচ্ছেদ করি। দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **আশা**—দণ্ড ; **খড়ি উড়ে গায়**—গায়ে তেল না থাকায় গা দিয়ে ধুলো উড়ছে; **শ্রীফল**—বেল।

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত

অন্নদার দাস হয়ে : হরিহোড় নাম লয়ে : বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ : বিষ্ণুহোড় পায় সুখ : পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় : ছয় মাসে অন্ন খায় : যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া : কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া : বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে॥
একদিন শূন্য পথে : অন্নপূর্ণা সিংহরথে : কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে : কথোপকথনরঙ্গে ; হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে॥
মনে হৈল পূর্ব্বকথা : আপনি আসিয়া তথা : মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাট খড় জড়াইয়া : সব ঘুঁটে কুড়াইয়া : রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ি॥
হরিহোড় যেথা যান : কাট ঘুঁটে নাহি পান : আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি : হরি হরি স্মরে হরি : বুড়ীটিরে দেখিতে পাইলা॥
দেখেন বুড়ির কাছে : ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে : বোঝাবান্ধা কাট আছে তায়।
হরিহোড় কান্দি কহে : বুড়ী মজাইল দহে : আজি বড় দেখি অনুপায়॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী : ঘুঁটে লয়ে ভরে ঝুড়ি : সর্ব্বনাশ করিল আমার।

কাড়ি নিলে হবে পাপ : বুড়ী পাছে দেয় শাপ : এ দুঃখের নাহি দেখি পার॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে : আকুল অন্নের তরে · ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু . মিছা বেলা মজাইনু : এ ছার জীবনে কিবা ফল॥
দয়া করি হরপ্রিয়া : হরিহোড়ে ডাক দিয়া : ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া · রাখিয়াছি সাজাইয়া : অরে বাছা না পারি বহিতে॥
মঙ্গল হইবে তোর : অতিদূরে ঘর মোর : ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।
অর্দ্ধেক আমার হবে · অর্দ্ধেক আপনি লবে : দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরিহোড় এত শুনি : অর্দ্ধ লাভ মনে গুনি : মাথায় লইলা ঘুঁটেঝুড়ি।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে : লড়ী ধরে থেকে থেকে : আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘর : নহে অতি দূরতর : সাঁঝ কৈলা সেইখানে যেতে।
তাহারি উঠানে গিয়া : বসিলেন হরপ্রিয়া : কহেন চলিতে নাবি রেতে॥
কহিলা মধুর স্বরে : থাকিলাম তোর ঘরে : হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে : বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে : ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে॥
অতিথি আপনি হবে · উপোসী কেমনে রবে : অন্নের সংযোগ মোব নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি · অতিথি সেবন করি : এই বেলা দেখ আর ঠাঁই॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ : অন্ন বিনা পান তাপ : বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারিপব দিন : অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ : যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে॥
হবির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী : অরে বাছা না ভাবিহ দুখ।
ভারত সান্ত্বনা করে : অন্নদা আইলা ঘরে · ইতঃপর পাবে যত সুখ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া

ভবানী বাণী বল এক বার। ভবানী ভবের সার॥
ভবানী ভবানী : সুমধুর বাণী : ভবনদী করে পার।
ভবানী ভাবিয়া : ভবানী পাইয়া : তব তরে ভবভার॥
ভবানী যে বলে : এ ভবমণ্ডলে : ভবনে ভবানী তার।
ভবানীনন্দন : ভারত ব্রাহ্মণ : ভবানী ভরসা যার॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি। না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী।
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে। সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে॥
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়। ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়॥
অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়। অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী। অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া। অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পার গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে। কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল। অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল॥
হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি। দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে কবে আসি॥
হরিহোড় বলে তুমি কে বট আপনি। পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী॥
বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও। শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥
হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত। পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া। দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া॥

হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি। পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি।
আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ। এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ॥
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে। দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥
ঘুঁটে হৈল হেমঘুটে দেবীর পরশে। লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে।
ঘুঁটে দেখি হেমঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়। এ কি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোনা হয়॥
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী। জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি॥
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে। ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে॥
হেমঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর। **অনিমিক** নয়নে সলিল ঝর ঝর॥
এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া। কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ্ হাসিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : অনিমিক—অনিমেষ।

হরিহোড়ে বরদান

ভয় কি রে অরে বাছা হরি। আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী॥

অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়। আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়॥
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর। ধন পুত্র লক্ষ্মী পবিপূর্ণ হবে ঘর॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমাব পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে। মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥
দেবীর অমৃতবাক্যে পাইয়া আনন্দ। প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদু মন্দ॥
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে। কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে॥
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব আদি দেবে। দেখিতে না পায় যাঁবে ধ্যান করি সেবে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়। তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয়॥
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান। সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ॥
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়। ভেলকীতে কত ভাত ঘুঁটে সোনা হয়॥
হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া। বসিলেন অন্নপূর্ণা মূবতি ধরিয়া॥
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মসনা হয়ে। দুই হাতে পানপাত্র বত্নহাতা লয়ে॥
কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে। শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে॥
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে। ভূমে পরে হরিহোড় একবার চেয়ে॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া। প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিযা॥
হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা। এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥
হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে। কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥
হরিহোড কহে মা গো কর অবধান। চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ কবিতে বিস্তর ক্ষণ নহে। নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর। বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা। ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর। মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর॥
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়। দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥
মুখপদ্মগন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে। মহানন্দে অন্ন বাড়ি দিলা হরিহোড়ে॥
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস। ভোজন কবিল হরিহোড় মহাযশ॥
বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়। কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায়॥

এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর। অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শব্দার্থ ও টীকা : **পদ্মিনী পদ্মিনী হইল**—অন্নদার বরে পদ্মিনী শ্রেষ্ঠ নায়িকাব গুণসম্পন্ন পদ্মগন্ধযুক্ত রমণীতে পরিণত হল।

বসুন্ধরার জন্ম

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর। ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল। নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর। বাহান্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা। বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ। জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া। রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন। স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে। জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম। তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়। কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায়॥
হেন কালে বসুন্ধরা অব্যাহতরূপে। কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে॥
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া। আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া। এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার। সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়। সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী। ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি॥
পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে। অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি। তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি॥
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য। হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনাশূন্য॥
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভর্ৎসনে। কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায়। ইহারে মানুষী কবি বিভা দেহ তায়॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে। তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে॥
যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা। বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা॥
আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত। তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত॥
ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া। তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ। এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া। সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে। বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈলা তারে॥
শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈলা আসি॥ লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া। আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে স্বর্ব্বদা চান ছল। চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥
ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে। নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার। ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে। যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা। কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥

ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল। ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল॥
কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে। কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে।
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

শব্দার্থ ও টীকা : মজুন্দার—রাজস্বের হিসাবলেখক।

নলকূবরে শাপ

কুবেরের সুত : রূপ গুণযুত : বিখ্যাত নলকূবর।
তাহার কামিনী : চন্দ্রিণী পদ্মিনী : দুঁহে প্রেম অতিভর॥
চৈত্র মধু মাস : বসন্ত প্রকাশ : তরু লতা সুশোভিত।
কোকিল হুঙ্কারে : ভ্রমর ঝঙ্কারে : সৌরভে বিশ্ব মোহিত॥
কুঞ্জবনে গিয়া : রমণী হইয়া : বিহরে নলকূবর।
রমণী সঙ্গেতে : বিহরে রঙ্গেতে : আর যত সহচর॥
শুক্র অষ্টমীতে : ভুবন ভ্রমিতে : পূজা লইবার মনে।
অন্নদা জননী : চলিলা আপনি : লয়ে সহচরীগণে॥
যাইতে যাইতে : পাইলা দেখিতে : নলকূবরের খেলা।
দেখি বনশোভা : মন হৈল লোভা : কৌতুক দেখিতে গেলা॥
নৃত্য বাদ্য গীত : গন্ধে আমোদিত : নানা ভোজ্য আয়োজন।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা : প্রফুল্ল মল্লিকা : শীতল মন্দ পবন॥
কহেন অভয়া : দেখ লো বিজয়া : কে বুঝি পূজে আমারে।
এ কৈল যেমন : না দেখি এমন : এই সে ধন্য সংসারে॥
হাসি জয়া কহে : ও মা এ সে নহে : এ ত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে : কারে বা ও মানে : উহারে আঁটয়ে কেটা॥
ধনমত্ত অতি : লইয়া যুবতী : ও করে কামবিহার।
পূজিছে তোমারে : বল কি বিচারে : কি কব আমি ইহার॥
ধনমত্ত যেই : সে কি সেবা দেই : আপনি না জান কিবা।
নিকট হইয়া : জিজ্ঞাসহ গিয়া : এখনি মর্ম্ম পাইবা॥
পুরুষ আকারে : যাহ ছলিবারে : না যেও নারীর বেশে।
মত্ত মধুপানে : বিদ্ধ কামবাণে : লজ্জা দেই পাছে শেষে॥
শুম্ভনিশুম্ভারে : বধ করিবারে : মোহিনী হইয়াছিলে।
গৃহিণী করিতে : আইল লইতে : মো সবারে লাজ দিলে॥
জয়ার বচনে ; হাসি মনে মনে : আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে : কৌতুক অশেষে : নিকটেতে উত্তরিলা॥
কহেন ব্রাহ্মণ : শুন হে সুজন : কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া : পর্ব্ব না মানিয়া : করিছ রতিবিহার॥
এই যে অষ্টমী : পুণ্যদা এ তমী : অন্নদার ব্রততিথি।
ইহাতে অন্নদা : অবশ্য বরদা : তাঁহারে কর অতিথি॥
এই দিব্য স্থল : এ দ্রব্য সকল : অন্নদাপূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে : যুবতীবিহারে : কেন কর প্রেতভোগ্য॥
এমন শুনিয়া : হাসিয়া ঢুলিয়া : ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া : অঙ্গ দোলাইয়া : জড়িমযুক্ত বচনে॥

অতিমত্ত মদে : না গণে আপদে : কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে : ছাড়িয়া এ রসে : কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখযামিনী : এ নব কামিনী : এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া : পূজিয়া বসিয়া : ধ্যানে রব যেন বক।
জানি অন্নদারে : সে জানে আমারে : কি হবে পূজিলে তারে॥
অন্নদা যেমন : কতেক তেমন : আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী : সে ত তারি নারী আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে : অন্ন চাহিবারে . দিনে আসে তিন বার॥
কি বলে বামণ : অরে চরগণ : বধ রে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া : সক্রোধ হইয়া : দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া : জয়ারে ডাকিয়া . বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনী যোগিনী : শাঁখিনী পেতিনী যুদ্ধে হৈল আগুয়ান॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে : বন্দি যক্ষগণে : নলকূবরেরে ধরে।
রমণী সঙ্গেতে : বান্ধিয়া রঙ্গেতে · দিল অন্নদা গোচরে॥
অন্নদা ভাবিয়া : ব্রতের লাগিয়া : শাপ দিলা তিন জনে।
মর্ত্ত্যলোকে যাও : নরদেহ পাও : রায় গুণাকর ভণে॥

শব্দার্থ ও টীকা : **অতিতর**—অতিশয , **তমী** - রাত্রি, তমসা।

নলকূবরের প্রাণত্যাগ

কান্দে নলকূবর দুঃখিত। চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ। দয়াময়ি দূব কব রোষ॥
কেন দিলা নিদারুণ শাপ। ভূমে গেলে বাড়িবেক তাপ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে। সঁপে দেহ শমনেব কাছে॥
কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব। তথাপি ভূতলে না যাইব॥
ভূমে কলি বড় বলবান। নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥
পাতকী লোকের মাঝে গিয়া। পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া। মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া॥
ভয় নাহি ও নলকূবর। চল তুমি অবনী ভিতর॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস। ব্রতকথা করিবে প্রকাশ॥
পুনরপি এখানে আসিবে। কলি তোমা ছুঁতে না পারিবে॥
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে। আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে॥
কান্দি কহে কুবেরের বেটা। এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা॥
অধম নরের ঘরে যাব। কোন্ গুণে অন্নদারে পাব॥
ব্যস্ত হব উদর ভরণে। কি জানিব ভজন পূজনে॥
সন্তান কেমন মেনে হবে। তাহে কি দেবীর দয়া রবে॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি। ভয় নাহি চল রে অবনী॥
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে। মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে॥
আপনি তোমার ঘরে যাব। বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাবো॥
তোমার সন্তানে রাজা হবে। তাহাতে আমার দয়া রবে॥

এত শুনি কুবেরনন্দন। জায়া সহ ত্যজিল জীবন॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে। অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়। রচিল ভারতচন্দ্র রায়॥

শব্দার্থ ও টীকা : **কলি**—চার যুগের শেষ যুগ কলিযুগের অধিষ্ঠাতা হিসেবে কলির নাম করা হয়।

ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত

অভয়া দয়া কর আমারে গো। বিপাকে ডাকি তোমারে গো॥
দানবদমনী : শমনশমনী : ভবানী ভবসংসারে গো।
সঙ্কটতারিণী : লজ্জানিবারণী . তোমা বিনা কব কারে গো॥
জঠরযন্ত্রণা : যমের মন্ত্রণা : কত সব বারে বারে গো।
দয়াদৃষ্টে চাহ : ত্বরায় তরাহ : ভারতেরে ভবভারে গো॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে। উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম। গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম। যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥
রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে। এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে॥
তাহে রাম সমদ্দার নাম এক জন। শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী। ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা। নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা॥
শুভ ক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস। এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশ মাস॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে। ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে॥
লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়। বিস্তার বর্ণিতে তার পুথি বেড়ে যায়॥
চন্দ্রিণী পদ্মিনী দুহে কত দিন পরে। জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দু জনার। বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার॥
চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে। গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে।
পদ্মমুখী যুবতী রহিলা অই মত। সুয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥
নানা রসে মজুন্দার দুহে অভিলাষী। সাধী মাধী নামে দুঁহে দিল দুই দাসী॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি। আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা। দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥
এক দিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে। তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে। জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে। ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে। চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান ধরে। বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল। অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়। দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায়॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে। স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত। রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত॥

শব্দার্থ ও টীকা : **রাম সমাদ্দার**—কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের পিতা ; **সুয়াভাবে**—পতিসোহাগিনী ভাবে।

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা

কে জানিবে তারানাম মহিমা গো। ভীম ভজে নাম ভীমা গো।।
আগম নিগমে : পুরাণ নিয়মে : শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম : মোক্ষ ধাম নাম : শিবের সেই সে **অণিমা** গো।।
নিলে তারা নাম : তরে পর্বিণাম : নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর : কহে নিরন্তর কি কর কৃপাময়ী মা গো।।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে। পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী। ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী। একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার। ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার।।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।।
গোত্রের প্রধান পিতা **মুখবংশ জাত**। পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি **সিদ্ধিতে নিপুণ**। **কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন**।।
কুকথায় পঞ্চমুখ **কণ্ঠভরা বিষ**। কেবল আমার সঙ্গে **দ্বন্দ্ব অহর্নিশ**।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে **পাষাণ বাপ** দিলা হেন বরে।।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনা ভাবি তারি ঘরে যাই।।
পাটুনি বলিছে আমি বুঝিনু সকল। যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।।
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল। দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল।।
যার নামে পার করে ভবপারাবার। ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার।।
বসিলা **নায়ের বাড়ে** নামাইয়া পদ। কিবা শোভা নদীতে ফুটিল **কোকনদ**।।
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে। পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল। আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল।।
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন। **সেঁউতী** উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।।
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে। রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়। হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়।।
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে। তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে।।
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।
সোনার সেঁউতী দেখি পাটনীর ভয়। এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা। পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।।
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী। পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।।
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল। দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।।
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ। কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা **অষ্টাপদ**।।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়। দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়।।
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর। তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার।।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়। সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া। কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।।

আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে। চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে। ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব। বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান। দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়। পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।।
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল। ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল।।
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়। সোনার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়।।
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি। দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি।।
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান। কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান।।
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা। হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা।।
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে। তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে।।
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার। দণ্ডবত হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার।।
অন্নপূর্ণাপূজা কৈলা কত কব তার। নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার।।
করুণাকটাক্ষ চয় উত্তর উত্তর। সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর।।
ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর। প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর।।

শব্দার্থ ও টীকা · **অনিমা**—অষ্টসিদ্ধির ফলে অণুর মতো ছোট হওয়ার গুণ; **মুখবংশজাত**—কুলীন শ্রেষ্ঠ মুখোপাধ্যায় বংশে জন্ম—হিমালয়-কন্যা অন্নপূর্ণা। **বন্দ্যোবংশখ্যাত**—বন্দ্যোপাধ্যায়রা বিশিষ্ট কুলীন, আর মহাদেব কুলীনের নয়টি শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী; **পিতামহ**—ব্রহ্মা; **সিদ্ধিতে নিপুণ**—বৃদ্ধ স্বামী একজন সিদ্ধিখোর; **কোন গুণ......আগুন**—এখানে শিবের তৃতীয় নেত্রর কথা বলা হয়েছে—লৌকিক অর্থে পোড়া কপাল বা মন্দভাগ্য। **কণ্ঠভরা বিষ**—সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃত ও বিষ উঠেছিল—মহাদেব দেবতাদের বাঁচাতে গিয়ে উত্থিত বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এখানে অন্য একটি অর্থও দ্যোতিত—অন্নপূর্ণার স্বামী তাঁকে সব সময় কটু কথা বলেন—তাঁর কথা যেন বিষ মাখা; **দ্বন্দ্ব অহর্নিশ**—সব সময়ে ঝগড়া হয়; **সতা**—সতীন; **পাষাণ বাপ**—এখানে হিমালয়ের কথা বলা হয়েছে পার্বতী হিমালয়ের কন্যা—তাই অন্নপূর্ণার এই উক্তি ; **অভিমানে সমুদ্রতে ঝাঁপ দিলা ভাই**—পার্বতীর ভাই হিসেবে মৈনাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারত ও সিংহলের মাঝে সমুদ্রস্থিত এক কল্পিত পাহাড়ের নাম মৈনাক। সত্যযুগে পাহাড়দের পাখা ছিল—এঁরা উড়ে বেড়াতেন--এঁদের ভয় করত সকলেই। কারণ কখন যে কোথায় এঁরা উড়ে এসে বসবেন তা কারোর জানা ছিল না। হিমালয়-পুত্র এবং পার্বতীর ভাই মৈনাক ছিলেন এইরকম একটি পাহাড়। সকলের অনুরোধে ইন্দ্র একবার এইসব পাহাড়ের পক্ষচ্ছেদ করেন যাতে তাঁরা আর উড়তে না পারেন। এই সময় পবনদেবের সাহায্যে মৈনাক সমুদ্রে আত্মগোপন করে পক্ষচ্ছেদ থেকে রক্ষা পান—সেই থেকে মৈনাকের সমুদ্রবাস। পুরাণের এই কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। **নায়ের বাড়ে**—নৌকার পালে ; **সেঁউতী**—নৌকার জলসেচে-পাত্র; **অষ্টাপদ**— সোনা।

অন্নদামঙ্গল : কাব্যপাঠ

অন্নদামঙ্গল কাব্য ● প্রথম খণ্ড : কাহিনী বিন্যাস

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথমখণ্ড মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত কাহিনী বিন্যাসের কাঠামো অনুসরণ করে মূলত **বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড** ও **নরখণ্ড**—-এই চারভাগে বিভক্ত।

বন্দনা অংশ :

দেববন্দনা অংশে কবি গণেশ, শিব, সূর্য, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা—এই আট দেবতার বন্দনা করেছেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে কোনো চৈতন্য বন্দনা করেননি।

প্রথম **গণেশ বন্দনা**। বেদান্ত দর্শনানুসারে ব্রহ্মা ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা নেই। অতএব সকল কর্মের আরম্ভে যে দেবতার বন্দনা তিনিই ব্রহ্ম। তন্ত্রসারে গণেশের স্তোত্রে আছে 'ব্রহ্মোতি যং ব্রহ্মবিদো বদন্তি তং শম্ভুসূনুং সততংভজামি।' তিনিই পরম ব্রহ্ম, চিদানন্দস্বরূপ; সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের রূপকার। ভারতচন্দ্র তাঁর গণেশবন্দনায় তাই বললেন

স্বরগ পাতাল ভূমি   বিশ্বের জনক তুমি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।

তিনি পুরুষপ্রধান। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনি। তিনি যোগীরাজ—আপন অনাদি-অনন্ত পরমসত্তার যোগসাধনায় ব্যাপৃত। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলদান তাঁর মায়ায় সম্ভব। শক্তিমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য রচনা করতে বসেও তাই কবি প্রণাম জানালেন এই বিঘ্নরাজ আদি দেবতাকে।

অতঃপর **শিববন্দনা**। পুরাণানুসারে বৈদিক ত্রিদেবতার অন্যতম শিব পরমযোগী, পরমদেবতা—অক্ষয়, অব্যয়। মঙ্গল আর সংহারের সমন্বিত বিগ্রহ—অক্ষয়তনুর অধিকারী। সত্ত্বঃ, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপ তিনি সৃষ্টি পালন ও লয়ের রূপকার। তাঁর ত্রিনয়ন সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিরূপে কল্পিত। সূর্যের শাতিত তেজ থেকে জাত তাঁর ত্রিশূল। তারকাসুরের তিন পুত্র—তারকাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর অত্যাচারে দ্যুলোক ভূলোকের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে তখন পাশুপাত অস্ত্রে সেই ত্রিপুরবাসী দানবত্রয়ের প্রাণসংহার করেছিলেন বলে শিবের অন্য নাম ত্রিপুরারি।

চন্দ্রসূর্য্য হুতাশন   সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥

শ্মশানচারী ভূতনাথ শিবের কণ্ঠহার মুণ্ডমালা, পরিধানে বাঘছাল 'বিভূতিগাত্রঃ স বিভুঃ সতীসংকারভজনা' তিনি। যোগাগ্নিতে সতীর দেহ ভস্মসাৎ হলে শঙ্কর প্রেমভরে সে ভস্ম গায়ে মেখেছিলেন। এ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কথা। অতিদীর্ঘ জটাজুটধারী মহেশ্বর কণ্ঠে কালকূট ধারণ করে সর্পভূষণে সজ্জিত হয়ে অনন্ত যোগরহস্যের ধ্যান করে চলেছেন। ভারতচন্দ্র বলছেন :

মায়ামুক্ত তুমি শিব   মায়ামুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।

বেদান্ত বলে বিশ্ব মায়ার সৃষ্টি। মহামায়া প্রকৃতি নিমিত্ত পুরুষের সঙ্গে একযোগে সৃজন করেছেন এই বিশ্ব। তাই মায়ামুক্ত পুরুষ মায়াযুক্ত হয়ে জীবরূপে ব্যাপ্ত হন চরাচরে।

ভারতচন্দ্র তাঁর আশ্রয়দাতা নায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কামনা করেছেন সেই পরম প্রার্থিত শিবকৃপা।

'ভাস্করায় নমঃ/হর মোর তমঃ/দয়া কর দিবাকর।'—এই বলে ভারতচন্দ্র **সূর্যবন্দনা** শুরু করেছেন। অন্ধকার দূর করে ইনি ত্রিলোককে আলোকিত করেন—নিশার তমিস্রা দূর করে দিবালোক প্রকাশ করেন বলে তিনি দিবাকর। সূর্যাষ্টকে সূর্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে এও বলা হয়েছে যে, এক সনাতন ব্রহ্ম দ্বিতীয় হতে ইচ্ছা করলে, তাঁর যে তেজ আবির্ভূত হল তাই সূর্য। বেদ-অনুসারে তিনি 'বিশ্বের কারণ', 'বিশ্বের লোচন', সর্বদেবময়, সর্ববেদাশ্রয়। সূর্যের তাপে পর্বত দগ্ধ হয়, সমুদ্রের জল শুকিয়ে যায়, পেলব পদ্ম সূর্যের আলোকেই উজ্জ্বল মধুর বিকাশ লাভ করে কবি বিভিন্ন পুরাণানুসারে সূর্যের 'দ্বাদশমুরতি'র নাম স্মরণ করে। বলেছেন :

স্মরিলে তোমায় পাপ দূরে যায়
আসরে সদয় হবে।

সূর্যধ্যানে আছে...'মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্।' আর সূর্যপ্রণাম মন্ত্রে পাওয়া যায়...'সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।'

এরপর **বিষ্ণুবন্দনা**। আর্য দেবতাত্রয়ের মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। সত্ত্বগুণের আধার তিনি। সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা। বিশ্বকে 'বিষ্' অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন বলে তিনি 'বিষ্ণু'। আবার ভাগবতপুরাণ মতে তিনি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। জগতের কারণস্বরূপ 'জগন্নাথ'। 'মুর' নামক রাক্ষসের সংহারকারী মুরারি। অনন্তশয়নে বিষ্ণুর নাভি থেকে জাত পদ্মে প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব-কারণে তিনি 'পদ্মনাভ'। এইভাবে 'জগদীশ্বর' 'যজ্ঞেশ্বর' বিষ্ণুকে পুরাণ-মহিমায় বন্দনা করেছেন কবি নানাভাবে।

এরপর এসেছে **কৌষিকী বন্দনা**। দৈত্যগণের দ্বারা পীড়িত দেবগণের স্তুতিতে মহাদেবীর অঙ্গ থেকে যে মূর্তি আবির্ভূত হয় তিনিই কৌষিকী দেবী। ভারতচন্দ্র লিখছেন :

কৌষিকি কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনি।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হয়েছে, নিশুম্ভাসুর কর্তৃক পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হয়ে স্তব করেছিলেন দেবী কৌষিকীর। ইনিই আদ্যাশক্তি। এঁরই নিজ শরীর থেকে সৃষ্ট ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ইত্যাদি অষ্টমাতৃকাসহ যুদ্ধে শুম্ভ-নিশুম্ভকে নিধন করেন।

ভারতচন্দ্র পুরাণ-অনুসারী কবি। পুরাণ-অনুসরণ করে তিনি দেবী কৌষিকীর বন্দনাগান রচনা করেছেন। 'মহিষমর্দ্দিনি, দুর্গতিঘাতিনি, রক্তবীজনিকৃন্তিনি' বলে তাঁকে সম্বোধন করেছেন। অবশ্য কবি মাধুর্যরসিক। দৈত্যনিধনকারিণী ভীষণা কৌষিকীর রূপবর্ণনায় ভারতচন্দ্র রূপমাধুরীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ঐশ্বর্য অপেক্ষা। শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবীর যে অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়েছিল, সে রূপে ছিলো অনন্ত ঐশ্বর্য। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় তা পদ্মকোরকের মতো পেলব মাধুরীতে ভরা। তাই দৈত্যনিধনকারী দেবীর পায়ে এখানে রতন নূপুর বাজে—কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ঝরে পড়ে হাস্যধারা—নিখিল বিশ্বে অতুলনীয় সে অভয়া রূপ।

বৈদিক স্ত্রীদেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী ও শ্রী ছিলেন সৌভাগ্য সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবতা। তিনি বিষ্ণুর ঘরনি, পদ্মাসনা। প্রলয়পয়োধি জলে শয়ান নারায়ণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন ; তখন জাগ্রত একমাত্র বিষ্ণুশক্তি—ইনিই লক্ষ্মী। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে জাত পদ্মে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। এই কারণে লক্ষ্মীকে ব্রহ্মার জননী বলা হয়েছে। ভারতচন্দ্র তাই **লক্ষ্মীবন্দনা**-য় জানালেন :

উর লক্ষ্মি কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী ব্রহ্মার জননী
কমলা কমলালয়া॥

সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মী। রূপসৌন্দর্য, গুণসৌন্দর্য এবং জ্ঞানসৌন্দর্য অর্থাৎ পরমজ্ঞানের কারণাশ্রয়। আবার সত্ত্বাদিগুণ এবং চিৎশক্তিরূপে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী জগতের সৃষ্টিপ্রকাশ, ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশ সাধন করেন। বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণের অনুসরণে ভারতচন্দ্র বলছেন—

রূপ গুণ জ্ঞান যত যত স্থান
তুমি সকলের শোভা।

একদিকে শোভা অন্যদিকে বিশ্বপালয়িত্রী—'তব নাম লয়ে লক্ষ্মীপতি হয়ে/ত্রিলোক পালেন হরি।' আর তাই জগৎকারণ স্বরূপিণী ব্রহ্মার জননী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বভাবতই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুবর্গ ফলদায়িনী।

যে আছে সৃষ্টিতে নাম উচ্চারিতে
প্রথমে তোমার নাম।
তোমার কৃপায় অনায়াসে পায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥

ভারতচন্দ্রের বন্দিতা **সরস্বতী** বাগীশ্বরী ও বাক্যবিনোদিনীরূপে উপাস্যা। সরস্বতী স্তোত্রে আছে :

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্য শ্বেতগন্ধানুলেপনা।
শেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দন চর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা॥

ভারতচন্দ্রও বলছেন :

উর দেবি সরস্বতি স্তবে কর অনুমতি
বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনী।
শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাস শ্বেত বীণা শ্বেত হাস
শ্বেতসরসিজনিবাসিনি॥

সরস্বতী বেদমাতা, অষ্টাদশ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, তন্ত্র ও মন্ত্রে কীর্তিতা এবং নৃত্যগীতাদি সকল কলাবিদ্যার দেবী। চারবেদ, ছয়বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র—এই অষ্টাদশ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। ছয় রাগ এবং তার অনুবর্তী ছত্রিশরাগিণীর রূপকর্ত্রী, তান-মান-তাল-মূর্চ্ছনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। '...তোমা হৈতে সকল নির্ণয়'। ভারতচন্দ্র কাব্যরচনা করতে চলেছেন তাই সরস্বতীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন। পূর্বে কবির অর্থ ছিলো জ্ঞানী, যিনি সবার কাছে জ্ঞান সঞ্চারিত করেন। ভারতচন্দ্রও তাই

প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন জ্ঞানের মিথ্যা অধ্যাস থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সত্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেই সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন।

দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল

অন্নদামঙ্গল কাব্যের আরাধ্যা দেবী **অন্নপূর্ণা**-র **বন্দনা** দিয়ে কাব্যের 'বন্দনা' অংশ সমাপ্ত করেছেন কবি। অন্নপূর্ণা শিবশক্তি ভবানীর বিশিষ্টরূপ। তিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি। দেবী পরাৎপরা, পঞ্চকোষময় জীবসত্তার অন্নময় কোষের তৃপ্তিদায়িকা, আবার ইন্দ্রিয়ময় জীবনধারণের অনিবার্য দুঃখেরও অপসারিকা। অন্নদামূর্তিতে চণ্ডিকার ভয়ংকরত্বের লেশমাত্র নেই।

দেবীর কোটি চন্দ্রার্কানলসদৃশ রক্তিমদেহকান্তি জবাকুসুমের দ্যুতিকে অতিক্রম করেছে এবং সে রক্তিমা ভয়ঙ্করী নয় মনোহর। সাতটি উর্ধ্বলোক এবং সাতটি অধোলোক—এই নিয়ে চতুর্দশলোক বা চতুর্দশভুবন। এগুলি যথাক্রমে ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল, রসাতল, পাতাল। ভারতচন্দ্রেব বন্দনায় ত্রিলোকধারিণী দেবী চতুর্দশভুবন প্রকাশিকা। তাঁর বামহস্তে রত্নখচিত পানপাত্রে জগৎকারণস্বরূপ অমৃত। এবং দক্ষিণ হস্তে রত্নহাতায় জীবদেহের উপাদানসম্বলিত অন্ন।

চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।...

অর্থাৎ দেবীদত্ত অন্নে রসবৈচিত্র্যের কোনো পরিমাপ নেই। অন্নগ্রহণ করে ক্ষুধার্ত শিব পরিতৃপ্তির আনন্দে নৃত্য করছেন এবং দেবী তা দেখে স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় মৃদু মৃদু হাসছেন, এই হল অন্নপূর্ণার প্রতিমা। তন্ত্রে উক্ত হয়েছে 'নৃত্যন্তমনীশং হৃষ্টং দৃষ্টানন্দময়ীং পরাম্'। আর ভারতচন্দ্র বলছেন :

ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া॥
দেবতা অসুর রক্ষ অপ্সর কিন্নর যক্ষ
সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর
নবগ্রহ দিক্‌পাল দশ॥

দেবী আদ্যাশক্তি, তিনি পরমাপ্রকৃতি। তাঁর থেকে সমস্ত জগৎ প্রসূত। আবার তাঁরই দয়ায় জীবের আহার সংস্থান। এই অনন্তগুণসম্পন্না অন্নপূর্ণার মহিমা কীর্তন আলোচ্য কাব্যের উদ্দিষ্ট।

গ্রন্থ সূচনা অংশ :

গ্রন্থসূচনা-অংশে ভারতচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ভিন্ন। পুরাণের আবহ থেকে মুক্ত কবি এখন ইহবাদী—ইতিহাসবোধে সমৃদ্ধ। অন্নদার পৌরাণিক মহিমার-স্বরূপ সংক্ষেপে নির্দেশ করেই কবি জানিয়ে দিলেন তাঁর কাব্য 'রাজসভাকাব্য'। তিনি সভাকবি যে রাজন্যের, তাঁর পারিবারিক মহিমাকথনই এ-কাব্যের প্রকারান্তরিক উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থতার প্রথমতম পদক্ষেপ 'গ্রন্থসূচনা' অংশের বিরচনা। ঐতিহাসিকের নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতায়

তিনি সমকালীন মোগলশাসিত ভারতবর্ষের অধীনস্থ নবাবিবঙ্গের প্রশাসনিক অচলাবস্থা তুলে ধরেছেন নিপুণ কৌশলে। নবাবি শাসন শৈথিল্যেব পরিণামে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব দুর্ভাগ্যেব ইতিবৃত্ত সেই রাজনৈতিক ঘনঘটার আকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাব্যে স্থান পেয়েছে।

এই 'গ্রন্থসূচনা' অংশের প্রেক্ষাপট ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু। আলিবর্দি খাঁ সুজা খাঁর পুত্র সরফরাজ-কে গিরিয়াযুদ্ধে নিহত করে তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজিম হয়েছেন। মোগল বাদশাহের কাছ থেকে 'মহাবৎজঙ্গ' উপাধি পেয়েছেন। ষড়যন্ত্র দ্বারা অধিকৃত মসনদ কোনোদিন স্বস্তি দেয়নি আলিবর্দিকে। এই সময়কার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা উড়িষ্যাবিজয় ও মারাঠা-বর্গিদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ। উড়িষ্যা বিজয় আলিবর্দিকে জেরবার করেছিল। সুজা খাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য এবং বাংলার প্রথম রায়-রায়াঁন আলমচন্দ্র রায় সরফরাজ খাঁর রাজত্বে দেওয়ান ছিলেন। সুজা খাঁ-র জামাতা ছিলেন কটকেব নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি 'রুস্তমজঙ্গ' উপাধি পেয়েছিলেন। এঁর জামাতা ছিলেন মুরাদ বাখর। আলিবর্দি মুর্শিদকুলিকে বিতাড়িত করে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৌলদ জঙ্গকে কটকের নবাব করলেন। উড়িষ্যায় প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিল এই স্বজন-পোষণের ফলে। মুরাদবাখর উড়িষ্যা আক্রমণ করে সৌলদজঙ্গকে সপরিবারে বন্দি করলে আলিবর্দির সঙ্গে মুরাদের যুদ্ধ বাধে। মুরাদ পরাজিত এবং পলাতক হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভুবনেশ্বরসহ উড়িষ্যায় আলিবর্দির মুসলমান সৈন্যদের অত্যাচার চলে প্রবলভাবে। ভারতচন্দ্র তাব বর্ণনা দিয়েছেন :

উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল॥

ইতিহাসের সঙ্গে দৈবীমর্জি যুক্ত হয়ে গেল। উড়িষ্যা-ভুবনেশ্বর দেবাদিদেবেব অধিষ্ঠান। ফলে স্বয়ং শিব এবং তার অনুরাগীরা ক্রুদ্ধ হলেন আলিবর্দির এই আক্রমণে। নন্দী 'যবন সব সমূলে নির্ম্মূল' করতে হাতে তুলে নিল 'প্রলয়ের শূল'। কিন্তু শিব নন্দীর ক্রোধ প্রশমিত কবে শৈব মহারাষ্ট্রীযদের ওপর দেন যবন নিধনের নির্দেশ।

এরপর এসেছে বর্গি প্রসঙ্গ। উন্মোচিত হয়েছে ইতিহাসের আর এক দীর্ঘ রক্তাক্ত অধ্যায়। ভারতচন্দ্র সুকৌশলে অরাজকতাময় উড়িষ্যাপর্বকে জুড়ে দিয়েছেন সেই বর্গি-পর্বের সঙ্গে। উড়িষ্যায়, বিশেষ করে ভুবনেশ্বরের ঘটনার দৈব প্রতিক্রিয়ায় বর্গি আক্রমণ ঘটে—এরকম ইঙ্গিত ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে। তবে এতে দৈব-মহিমা ক্ষুণ্ণই হয়েছে। কারণ বর্গি-র আক্রমণ এবং অত্যাচার বাংলার সার্বিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। তারা হিন্দু-যবন, রাজা-প্রজায় কোনো ভেদ মানেনি। শিবাভিপ্রায় তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—হওয়াবই কথা, অত্যাচারী জাত, ধর্ম, শ্রেণী মেনে অত্যাচার করে না। ইতিহাসের

অমোঘ, অনিবার্য সত্যকে এই স্বীকৃতি দিয়ে ভারতচন্দ্র নিষ্কাশন করলেন সেই অভ্রান্ত জীবনসত্য :

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥

ভারতচন্দ্র ইহবাদী কবি, ইহজীবনকে তিনি অস্বীকার করেন না। দেবগাথা রচনা করতে বসেও তাই রাজ-মহিমা কীর্তন করছেন। আলিবর্দির সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্ক নির্দেশ করে বর্গি হাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে সেই সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা দেখালেন কবি। সৎ-ধার্মিক রাজাকে কারারুদ্ধ করার পেছনে সুযোগ-সন্ধানী রাজনীতিকে প্রশ্রয় পেতে দেখলেন। দেবী-পূজক হয়েও পরমধার্মিক রাজার এই দুর্গতি দেবগৌরবকেই প্রকারান্তরে স্খলিত করল। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের কারামুক্তির প্রসঙ্গে দেবী-কৃপার বিষয়টি জুড়ে দিয়ে স্ব-রচিত কাব্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যরীতির এক শিথিল সংযুক্তি শেষপর্যন্ত স্থাপন করলেন কবি। এর ফলে অন্নদাপূজা প্রবর্তন ও প্রচারের কারণে *অন্নদামঙ্গল* রচনার জন্য দেবীর নির্দেশদান, কবিকে দিয়ে কাব্যরচনা করানো ইত্যাদির মতো মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত প্রসঙ্গগুলি কবির রচনায় জড়িয়ে গেল।

মঙ্গলকাব্যীয় বহির্কাঠামো মাথায় রেখে ভারতচন্দ্র 'দেবখণ্ড' রচনা করেন। ঘটনাবলী নাটকীয়ভাবে সজ্জিত বিশেষত রসসৃষ্টির দিক দিয়ে। কাহিনীর অন্তরধর্মী নাট্যগতিকে অব্যাহত রাখতে তিনি বহুক্ষেত্রে স্তবস্তুতি ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণের অংশ বাদ দিয়েছেন, পরিবর্তে উৎসগ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করেছেন। যেমন "বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত। কিঞ্চিৎ কহিনু, নিজ বুদ্ধিশুদ্ধি মত।।" অথবা, "শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস। কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ।।" তাঁর কাহিনী বিন্যাসে তাই কোনো অবান্তর প্রসঙ্গেব স্থান নেই, কিংবা কোন ভাবমগ্ন মুহূর্তকে ঘিরে অন্তর্লীন অনুভূতির দ্যোতনা দেবারও চেষ্টা নেই। *অন্নদামঙ্গল*-এর কাহিনীতে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মতো যেন প্রকৃতিও দ্রুত চলমান। এমন কি শিবের পঞ্চতপের বর্ণনাও বারোমাসের পরিক্রমায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। তাই ধ্যানী শিবের নিশ্চল মহিমা বর্ণনার চেয়ে এই কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে পুষ্পশরাহত কামাতুর শিবের 'নারী তপাসিয়া' ফেরার অস্থির চাঞ্চল্য।

দেবখণ্ড :

দেবখণ্ডের কাহিনীর শুরুতেই এই চিত্ররূপময়তা, দশদিক জুড়ে সতীর দশমহাবিদ্যার রূপ পরিগ্রহণ এবং মহাদেবের কাছ থেকে দক্ষযজ্ঞে যাবার অনুমতি আদায় করা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। এরপর, দক্ষযজ্ঞে কন্যা সতীর সামনে দক্ষের শিবনিন্দায় শিবের রূপ ও চরিত্রের প্রকাশ, অপমানে ক্রোধে সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা ও দক্ষযজ্ঞনাশ—সবই পরম্পরিত নাট্যদৃশ্যের মত ঘটে চলেছে।

শিব-সতী-র পরবর্তী পর্যায়ে কবি এঁকেছেন গৌরীর বাল্যলীলা, নারদের শিববিবাহের ঘটকালি, শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম, শিবের বিবাহযাত্রা এবং শিববিবাহের রঙ্গমুখর কৌতুককর দৃশ্যাবলী। নাটকের প্রথম অংকের সমাপ্তি এখানে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যপটে, হরগৌরীর সংসারযাত্রা, কোন্দল, শিবের গৃহত্যাগ ও ভিক্ষাযাত্রা এবং বিফল হয়ে অবশেষে লক্ষ্মীর পরামর্শে গৃহে প্রত্যাবর্তন, দেবী অন্নপূর্ণার মূর্তি দর্শন এবং দেবীদত্ত অন্ন ভোজন করে পরমানন্দে নর্তন, দেবীর

সকৌতুক তৃপ্তির প্রসন্নতা—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাহিনী গতি পেয়েছে। সজ্জিত হয়েছে চিত্রমালায়।

অতঃপর মর্ত্যভূমির উপরে শিব-ত্রিশূলাগ্রে স্থাপিত অমর্ত্যনগরী কাশীতে বিশ্বকর্মার দ্বারা অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণ, সে-মন্দিরে অন্নপূর্ণা মূর্তির প্রতিষ্ঠা, সেই মূর্তিতে দেবীর অধিষ্ঠানের জন্য শিব এবং অন্যান্য দেবতা ও ঋষিদের কঠিন তপস্যা এবং অবশেষে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় কাহিনীর চিত্রধর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। কাহিনীর সরল গতিতে এখানে প্রকাশ পেয়েছে তপোবন এবং অন্নব্রহ্মের মহিমা। এ পর্যন্ত কাহিনীর গতি মোটামুটি মঙ্গলকাব্য ধারাসম্মতভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

এরপরই এসেছে সেই অভিনব নতুন দেবখণ্ডীয় বিরোধ-জটিল কাহিনী, নায়ক যার অতীত ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বেদবিভাজক ও পুরাণকার স্বয়ং বেদব্যাস। এ-কাহিনীর উৎস স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড। মহাজ্ঞানী মহাজনও যে জ্ঞান প্রমাদে পড়ে আত্মমোহে উদ্‌ভ্রান্ত হতে পারেন কাশীখণ্ডে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের অভিপ্রায়ও তাই। অদ্বৈতসত্যের আশ্রয়চ্যুত হলে, ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিজনিত গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হলে স্বয়ং ব্যাসদেবের মতো অসামান্য জ্ঞানীর যাবতীয় তপঃপ্রভাব এবং অর্জিত-বিদ্যা যে সম্পূর্ণ বিফল হয়ে যায়—প্রকৃত সত্যের কেন্দ্রচ্যুত বিদ্যা সমুদ্রপ্রমাণ হলেও তা যে অসার প্রতিপন্ন হয়—এই তত্ত্বই ব্যাস-উপাখ্যানের মূল বক্তব্য। এই উপলব্ধি আক্ষেপের রূপ নিয়েছে ব্যাসের কণ্ঠে :

পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥

নৈমাষারণ্যে শৌণক প্রভৃতি ঋষিদের কাছে ব্যাসের শিবনিন্দা থেকে শুরু করে শিবকর্তৃক ব্যাসের কাশীবাস নিষিদ্ধকরণ পর্যন্ত ভারতচন্দ্র পুরোপুরি কাশীখণ্ডে বর্ণিত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। পুরাণে কাহিনী বর্ণনারীতিতে সাধারণত কোন নাটকীয়তা থাকে না, কিন্তু কাশীখণ্ডের বর্ণনায় এই কাহিনী রীতিমতো নাটকীয়। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি ; শিবজয়ধ্বনির সঙ্গে কৃষ্ণসংকীর্তনের মহাকোলাহল ; শিষ্যগণসহ ব্যাসের কাশীযাত্রা ; শিব এবং বিষ্ণুর নামাবলী কীর্তন, কাশীতে ব্যাসের শিবনিন্দার কারণে নন্দী কর্তৃক ব্যাসের ভুজস্তম্ভ ও বাক্‌স্তম্ভ, অতঃপর বিষ্ণু কর্তৃক ব্যাসকে ভর্ৎসনা এবং অলক্ষ্যে ব্যাসের বাক্‌স্তম্ভমোচন, ব্যাসের শিবস্তব ও ভুজস্তম্ভ থেকে মুক্তি—সমস্তই বিস্তারিতভাবে কাশীখণ্ডে আছে, যা ভারতচন্দ্র ব্যাস-উপাখ্যানে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ব্যাসের ধর্মবোধ পরীক্ষা করার জন্য শিব ব্যাসের ভিক্ষা নিষেধ করলেন কাশীতে। ভারতচন্দ্র এখানে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে শিবমুখে ব্যাসের ধর্মীয় গোঁড়ামীর নিন্দা শুনিয়েছেন এবং ধর্মবোধের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার জন্যই ব্যাসের শাস্তি ও শিক্ষার জন্য তিনি যে কাশীতে ব্যাসদেবের ভিক্ষাবারণ করেছেন এ-কথা শিব স্পষ্টতই বলেছেন। এরপর শিষ্যসহ ব্যাসের তিনদিন উপবাস, কাশীর অধিবাসীদের শাপ, পরে অন্নপূর্ণা কর্তৃক তাঁদেরকে অন্নদান, বৃদ্ধবেশী শিবের সঙ্গে ব্যাসের ধর্মালোচনা, ব্যাসের ধর্ম উপদেশ এবং ধর্মাচরণে স্ববিরোধ দেখে শিবের ক্রোধ ও অভিশাপ, অন্নপূর্ণার কাছে নিজের জীবনরক্ষার জন্যে ব্যাসের করুণ আবেদন—এ সমস্তই স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের বিবরণ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন ভারতচন্দ্র। পুরাণ-কাহিনীর নাটকীয়তা ও চিত্রধর্মিতা ভারতচন্দ্রের কাব্যকলায় মানিয়েছেও সুন্দরভাবে।

ভারতচন্দ্রের নিজস্বতা এর পরের পর্বে। কাশীখণ্ডে ব্যাসের কাশীবাস নিষিদ্ধকরণের ঘটনাতেই আখ্যানের শেষ। কারণ ব্যাসদেব সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন তাঁর ধর্মবোধের

বিভ্রমজনিত অপরাধ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেবে আরও অনেক জটিল বুদ্ধি সংক্রমিত। অতএব প্রাচীন ঋষির মতো ভ্রমস্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মাভিমান শেষ হয়ে যায়নি। ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব তাই অন্নপূর্ণার কাছে কাশীপ্রবেশের আবেদন জানাননি। বরং দেবীই তাকে স্বেচ্ছায় বলেছেন :

আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥

ব্যাসদেব শুধু যে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা আক্রান্ত তাই নয়, তীব্র অহংকারীও। সেই অহংকার আহত সর্পের মতো ফণা তুলল এখন। মহাদেবের শাসন অগ্রাহ্য করলেন তিনি। ভ্রমদর্শন করেও জ্ঞান ও খ্যাতির অহমিকা ত্যাগ করতে পারলেন না। যে অহঙ্কার তাঁর ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে প্রণোদিত করেছিল, সেই অহংকারই এবার তাঁকে চালিত করল শিব-প্রতিস্পর্ধী হতে। তিনি সংকল্প করলেন, তাঁর সমস্ত অতীত সুকৃতি ও তপোবলের দ্বারা দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করবেন।

নিজ নাম জাগাইব এইখানে প্রকাশিব
কাশীর যে কিছু আয়োজন।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এখন ব্যাস ব্রহ্মামুখী। ব্রহ্মা-তপস্বী হয়ে তাঁরই বরে সিদ্ধিলাভে প্রয়াসী। একই সংকল্প নিয়ে তাঁর গঙ্গার কাছে আসা। গঙ্গাকে স্তবে তুষ্ট করে ব্যাসনির্মিত কাশীকে গঙ্গ াপ্রবাহিণী করবার বাসনা। কিন্তু গঙ্গা তাঁকে উপহাস করলেন। ব্যাসের দুর্বুদ্ধিপরায়ণতা দেবীর কাছে আদৌ প্রশ্রয় পেলনা। গঙ্গা-নিন্দায় মুখর হয়ে ব্যাস ছুটলেন বিশ্বকর্মার কাছে—পুরী নির্মাণের অনুরোধ নিয়ে। বিশ্বকর্মা প্রথমে শিবালয় নির্মাণে উদ্যোগী হতেই শিব-বিমুখতায় ব্যাস বিশ্বকর্মাকেও কটূক্তি করলেন। তিরস্কার করে বিদায় জানালেন তাঁকে। কিন্তু ব্রহ্মার দ্বারাও সমর্থিত হলেন না ব্যাস। শান্ত কথায় ব্রহ্মা ব্যাসের বিভ্রম দূর করতে চাইলেন :

অরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥

... .

তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥

তবু মোহ দূর হল না মহর্ষির। অহংকার চিত্তকে যে কতদূর মোহাচ্ছন্ন কবতে পারে তার প্রমাণ দিলেন ব্যাসদেব। শিববিরোধী ক্রিয়াকাণ্ডের সাফল্যের জন্য অবশেষে শরণাপন্ন হলেন অন্নপূর্ণার। অহংকারের রাহুগ্রাসে ধ্বংস হল তপোবল। 'খেলারসে পরিপূর্ণা' অন্নপূর্ণার সংসারে ফলল বিষবৃক্ষ। কলঙ্কিত হল ব্যাসদেবের জীবন—সাধনা—অভীপ্সা।

ক্ষুব্ধ অন্নদা ধারণ করলেন জরতীবেশ। তাঁর জরতী মূর্তি প্রমাণ করল..."ভারতচন্দ্রের কাব্যে কেবল সুন্দরেরা নয়, অসুন্দরেরাও ভিড় করে এসেছে। জরতীর আচার-আচরণ, চলন-বলন চেহারা, অতি বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত। সেই স্থবির বৃদ্ধার বার্ধক্য অস্বীকারের চেষ্টা, শুনতে না পেলেও শুনবার নিতান্ত উৎকণ্ঠা, ভুল শুনে রাগ, অনেক কষ্টে একটুমাত্র কানে ধরে 'বুঝিনু বুঝিনু' বলে মাথা নাড়ার ভঙ্গি—ছবির মতন ফুটিয়েছেন কবি।" [*কবি ভারতচন্দ্র* : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রথম দেজ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৬। মাঘ ১৪০৬। পৃ ২০৪]

ছলনায় ব্যাসকে উত্যক্ত করে জরতীবেশিনী অন্নদা বুঝিয়ে দিলেন, সমুদ্রপ্রমাণ জ্ঞান

নিয়েও প্রকৃত বোধের অভাব একজন তপস্বীকে কতটা হীনবল করতে পারে। কিন্তু তখন বাইরের ছলনার আবরণ ভেদ করার মতো অন্তর্দৃষ্টিও হারিয়ে বসে আছেন ব্যাসদেব।

মোহান্ধ, সাম্প্রদায়িক অহংকারী ব্যাসের বিড়ম্বিত বুদ্ধিভ্রষ্ট রূপ, জরতীবেশিনী অন্নদার ছলনায় তাঁর উদ্বেগাকুল পরিণতি পাঠককে খুশি করে নিঃসন্দেহে। অনুভূতিশীল পাঠকও, ব্যাসদেবের পরিণতিতে অন্নপূর্ণার মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেন। কারণ ব্যাসদেব একসময় উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর সামর্থ্যের সীমা, সব অহংকার চূর্ণ হয়েছিল তাঁর। দীর্ঘ সময় লাগলেও মোহাবরণ ছিন্ন হয়েছিল এক সময়। এইভাবে ব্যাসের ব্যর্থতা চিত্রণের মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্র প্রকারান্তরে দেখালেন, দেবী অন্নপূর্ণা শুধু ভক্তকে অন্নদানই করেন না। ভক্তের মোহান্ধতাও দূর করেন। ভক্তচৈতন্যকে কলঙ্কমুক্ত করেন। দেবমহিমার এ এক নতুন ব্যাখ্যা। সন্ধিলগ্নের কবি হিসেবে দেবমহিমার এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেওয়ার সবটুকু কৃতিত্ব ভারতচন্দ্রের।

কিন্তু তবু মোহমুক্ত ব্যাসদেব যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া, কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া!' বড় দুঃখে-অভিমানে স্তব্ধ তখন মহর্ষি। আত্মগ্লানিতে জর্জরিত। কিন্তু তবু তো সন্তান। 'মা' বলে যাঁকে ডেকেছেন দিবারাত্রি সেই মহাশক্তির নিষ্ঠুর আঘাতের যোগ্য কি তিনি? ব্যাসের উক্তি তখন পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই সহানুভূতি আরও গাঢ় হয় যখন আকাশবাণীতে দেবীকণ্ঠের উচিত-অনুচিতের তত্ত্বকথা শুনে একদা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন উদ্ধত ব্যাসদেবের নিজের কর্মফলকে মেনে নিয়ে অন্নপূর্ণার উদ্দেশে নম্র প্রণাম জানিয়ে কাশী ছেড়ে চলে গেলেন। ব্যাসের শাস্তিতে বিশ্ববাসী হয়তো রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু ব্যাসকে কি সামান্যতম মাতৃস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত করা হয়নি? তাঁর বুদ্ধিবিবেচনাহীন ঔদ্ধত্যের পিছনে পাঠকের নীরব সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর অনুসরণ করে, অনুসরণ করে তাঁর বিদায়লগ্নকে, স্মরণ করে ব্যাসের জন্য শেষ ক্ষমা-র চিরন্তন আশা নিয়ে। ধর্মকলহের অনৌচিত্য প্রমাণের জন্য যে চরিত্রকে কাব্যে আনলেন কবি, নীরন্ধ্র অবজ্ঞার পীঠে তাঁকে স্থাপন করে অনাতর এক যুক্তিতর্কবর্জিত মানবিক সহানুভূতির দ্বার উন্মুক্ত করলেন ভারতচন্দ্র। ফলে, "যে-ব্যাস কদর্য কোলাহলে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছিলেন, তিনি যখন নিঃশব্দ প্রণামের সঙ্গে, ভবিষ্যৎ অনুস্মরণের সম্ভাবনামাত্র না রেখে সরে গেলেন, তখন তাঁর অবিচারী অহঙ্কারী পৌরুষের প্রতি বিচিত্র সম্ভ্রমের অনুভূতি না জেগে পারেনি।" [তদেব পৃ. ২০৬]

আর এরই মধ্যে ভারতচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন সেই চূড়ান্ত বৈপরীত্যের ছবি—একদিকে বিচূর্ণ ব্যাসের প্রস্থান, অন্যদিকে পূজা প্রচারের কল্পনায় দেবীর আত্মসর্বস্বতার আনন্দহাস্য :

শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাস্যবদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥

এই বেদনাগভীরতা নিয়ে ভারতচন্দ্রের 'নূতন মঙ্গল' কাব্যে ব্যাসকাহিনী এক নতুন তাৎপর্য পেল, যা অষ্টাদশ শতকের নানা দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি, ভারতচন্দ্রের একক কৃতিত্বে যা পাঠকের কাছে অন্য মাত্রায় প্রতিভাত হয়।

নরখণ্ড :

অন্নদামঙ্গল-এর **নরখণ্ড** অংশটি বেশ সংক্ষিপ্ত। নরখণ্ডে মোটামুটি দুটি আখ্যান আছে। প্রথমটি বসুন্ধর-বসুন্ধরা—বসুন্ধর কুবেরের অনুচর এবং বসুন্ধরা তাঁর স্ত্রী। এঁরা মর্ত্যলোকে বিচরণ করেছেন হরিহোড় ও সোহাগী নামে। অন্য উপাখ্যানটি নলকুবর পদ্মিনী ও চন্দ্রিণী (নলকুবর-এর পত্নীদ্বয়) নিয়ে রচিত। মর্ত্যে এঁরা পরিচিত হলেন ভবানন্দ, পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী (উভয়েই ভবানন্দের পত্নী) নামে। এঁদের প্রয়োজন হয়েছিল মর্ত্যে অন্নপূর্ণা পুজোর প্রচলনের কারণে। ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য মেনে নিয়েছেন—দৈববাণীও শুনেছেন, তবুও ব্যাসদেবকে দিয়ে কবি অন্নদা পুজোর প্রচলনের কথা চিন্তা করেন নি। কারণ অন্নদার প্রতি ব্যাসদেবের একটা ক্ষুব্ধ অভিমান ছিল—তাঁকে দিয়ে পুজোর প্রচলন করালে কাব্যটি হয়তো ঔচিত্য দোষদুষ্ট হত। তাছাড়া কবি ব্যাসদেবের ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় দিতে চেয়েছেন তাও ক্ষুণ্ণ হত। এখানেই ভারতচন্দ্র বড় কবি। তাই স্বর্গবাসী কুবের-অনুচর বসুন্ধর এবং কুবের-পুত্র নলকুবর-কে মর্ত্যে অন্নপূর্ণার পুজো প্রচলনের জন্য বেছে নেওয়া হল।

বসুন্ধর এবং নলকুবর—দুটি চরিত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র একটা মিল গড়ে তুলেছেন। দুটি চরিত্রই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-প্রভাবে রতিরসে নিমগ্ন, দেবীপুজোয় মন না দিয়ে রতিসুখ উপভোগ করাকেই তারা জীবনে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। প্রথম উপাখ্যানে দেখা যায় বসুন্ধর-এর প্ররোচনায় বসুন্ধরা দেবীপুজো ভুলে বসুন্ধরের সঙ্গে মিলনের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়। আর দ্বিতীয় আখ্যানে নলকুবর রতিরসে লিপ্ত হওয়াকে দেবী পুজোর চেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় মনে করেছে। ফলে এঁরা দেবীর অভিশাপে মর্ত্যে জন্ম নিতে বাধ্য হয়েছে।

বসুন্ধর মর্ত্যে হরিহোড় হয়েছে—এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। হরিহোড়ের আখ্যানে মুকুন্দর কালকেতুর শিকার কাহিনীর কিছুটা আদল আছে। মুকুন্দর কাব্যে দেবী অভয়ার মায়ায় অরণ্য পশুশূন্য হয়ে যায়, আর এখানে অন্নদার মায়ায় বনে কাঠ-ঘুঁটে পাওয়া গেল না। ভারতচন্দ্র হরিহোড়কে এক নির্লোভ সরল মানুষ হিসেবে গড়েছেন। তবে সাধারণভাবে নরখণ্ডে যেমন দেখা যায় এখানেও তার ব্যত্যয় হয় নি। দেবী আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন :

দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর॥
চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে।

তবে হরিহোড় দেবীর প্রস্তাবের উত্তরে যা বলেছে তা হরিহোড়ের মানুষী পরিচয়েরই নিদর্শন :

হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥

এ হরিহোড় কিন্তু স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব যিনি ধনের পরিবর্তে মাতৃপদ আকাঙ্ক্ষা করেন। তবে দেবীর স্বভাবটি প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। তাই দেবীর উদ্দেশে বলেন :

হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥

অনুগ্রহ করতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥

হরিহোড় চরিত্র সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের জীবন-ভাবনাই প্রকাশিত। *অন্নদামঙ্গল*-এর নরখণ্ডের হরিহোড় যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়।

নলকুবর-পদ্মিনী-চন্দ্রিণী—মর্ত্যে যাঁদের পরিচয় ভবানন্দ-পদ্মমুখী-চন্দ্রমুখী হিসেবে, নরখণ্ডের সেই উপাখ্যানটি বৈচিত্র্যের অভাবে হরিহোড় বৃত্তান্তের মতো ততটা আকর্ষণীয় হয় নি। মনে হয় এই নিয়ে কবি স্বতন্ত্র আখ্যান রচনা করবেন মনস্থ করায় এখানে কাহিনীকে বিস্তৃতি দেন নি। তবে দেখিয়েছেন ভবানন্দ দুই স্ত্রীর প্রতি সমদর্শী ব্যবহার করতেন, যদিও যুবতী স্ত্রী পদ্মমুখীর প্রতি তাঁর হয়তো কিছুটা বেশি আকর্ষণ ছিল। এই আখ্যান শেষ হয়েছে অন্নদার ভবাননন্দের গৃহে পৌঁছোনোর মধ্যে দিয়ে। কবি তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে অন্নদার আগমন বার্তা পেয়ে ভবানন্দ :

আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান॥
পুলকে পুরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা॥

অন্নদামঙ্গল-এর নরখণ্ড এখানে শেষ হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের ধারায় অন্নদামঙ্গলের বৈশিষ্ট্য

পুরাতন ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভাবী যুগোপযোগী ঐতিহ্য সৃজন—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য আনুভূমিক। অবশ্য ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে ফারাক ততটা গুণগত নয়, যতটা মাত্রাগত। ঐতিহ্য রূপান্তরিত হতে হতেই আধুনিকতার মাত্রা পেতে পারে। এমনটাই লক্ষ করা যায় ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে। সাহিত্যে যুগের দাবি সর্বোচ্চে। আর সেই হেতুতেই *অন্নদামঙ্গল*-এর ঐতিহ্যের স্বীকরণ যুগের প্রত্যাশায় আধুনিক হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম লক্ষণ ধর্মমনস্কতা—*অন্নদামঙ্গল*-এর কাহিনীকাঠামোও ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু ধর্মের নিঃসার মুখোশটা এখানে অনেকটাই খোয়া গেছে। আর তার বিলুপ্তির মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে মুখোশের অন্তরালে থাকা বাস্তব জীবন। যার অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণের হিল্লোল, অবসন্ন চেতনার গুমোট পরিবেশে মুক্তির উত্তাল শিহরণ, চিন্তার অবদমিত দশার পরে মননের স্বাধীনতা। ফলে *অন্নদামঙ্গল* কোনো-না-কোনো ভাবে অধ্যাত্মগন্ধী হলেও কখনই তা প্রকট হয়ে ওঠে না। সাহিত্য যে জাতির আত্মপ্রকাশের প্রধানতম হাতিয়ার, সমাজের, যুগের, মানসিকতার প্রতিফলন যাতে পড়ে, যেখানে নিয়ত চলে জীবন-অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার কাজ—সেই অতীত ঐতিহ্য বর্তমান অনুষঙ্গ আর ভবিষ্যতের রূপরেখার একটা অপূর্ব মিশ্রণে *অন্নদামঙ্গল* ধর্মীয় হয়েও জাতির অন্তরাত্মার কাব্য হতে পেরেছে। অন্নদার ভবানন্দের গৃহে গমন অংশ তো বাঙালির স্বপ্ন-বাস্তবের-ই ছবি। আরো একধাপ এগিয়ে বলা যায় *অন্নদামঙ্গল*-এ দেবতার বদলে মানুষ, কিংবা দেবতার মানবায়ন ঘটেছে। এই মানবমুখিনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individuality ও humanity) আধুনিক যুগের লক্ষণ।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে *অন্নদামঙ্গল*কাব্য রচিত হয়েছিল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে। কাব্যটির তিন খণ্ডে বিভাজন (ক) অন্নদামঙ্গল অর্থাৎ দেবখণ্ড (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ লৌকিক আখ্যান (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাহিনী। পুরাণ, রোমান্টিক-লোকগাথা আর ইতিহাসের সহায়তায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় আবির্ভূত হয়েও *অন্নদামঙ্গল* হয়ে উঠল 'নূতন মঙ্গল'। কাব্যটির তিনটি অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পৃথক মর্যাদার অধিকারী। তবু এই তিনটির মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার। ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, হিতোপদেশ তাই, বৃহৎকথা তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই। বাংলায় আসিয়া বিদ্যাসুন্দরও তাই হইয়া পড়িয়াছে। উপরের বাক্স কালিকামঙ্গল, ভিতরের গল্প বিদ্যাসুন্দর।"—এই মন্তব্য কেবলমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ সম্বন্ধে নয়, সমগ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

তিনখণ্ডে বিভক্ত হলেও ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্যের নাম *অন্নদামঙ্গল*। অর্থাৎ প্রত্যেকটি খণ্ড-কাহিনীর বিষয়বস্তু যাই হোক—তাদের মূল লক্ষ্য একটি— দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্তন। এই ক্ষীণ সূত্রে সমগ্র কাব্যটি বিধৃত হয়েছে; তবু কাব্যের বিষয়বস্তুর অভিনিবেশপূর্বক মূল্যায়ন এমন ঘোষণা করতেই পারে যে, কবি ভক্তিরসের প্রেরণায় এই কাব্য রচনা

করেননি। কবিকঙ্কণেব *চণ্ডীমঙ্গল*-এ ভক্তির যে আন্তরিক সুরটি লক্ষ করা যায়—এই কাব্যে তা বিরল। যদিও এখানে দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপন আছে, দেবীর কৃপায় নানা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনীর সংঘটন ও প্রদর্শনও আছে, তবু যে নিবিড় ও স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ ভক্তিরসের প্রাপ্য—এই কাব্যে তার একান্ত অভাব। কাহিনীব মূল লক্ষ্য অন্নদার মাহাত্ম্যকীর্তন ততটা নয়, যতটা পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশ গরিমাজ্ঞাপন এবং এই বংশের প্রতি দেবীর অপার কৃপার কাহিনীকীর্তন। অন্নদা যে উপলক্ষ, আশ্রয়প্রার্থী কবির কাছে আশ্রয়দাতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভজনাই যে লক্ষ্য—*অন্নদামঙ্গল* কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' খণ্ডের অন্তর্নিবেশ তার অকাট্য প্রমাণ। তবু কাহিনীর সূত্রধর অন্নদা। তাঁর কৃপায় ভবানন্দ মজুমদারের জন্ম, সৌভাগ্যলাভ ও বিবিধ সুখভোগান্তে ইহলীলা সংবরণ *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে একত্র বেঁধে রেখেছে এবং একে একটি আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনটি খণ্ডের মধ্যে এই যোগসূত্রটি না থাকলে সমগ্র *অন্নদামঙ্গল*-কে অনায়াসেই তিনটি পৃথক কাব্য হিসেবে গণ্য করা যেত। কবি তাঁর পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য তাঁর কাব্যের তিনটি খণ্ডেই দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপনকে লক্ষ্য হিসেবে পুরোবর্তী করে রেখেছেন। ফলে প্রথম খণ্ডে ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত এবং তার প্রতি দেবীর অহৈতুকী কৃপা, দ্বিতীয়খণ্ডে ভবানন্দের সঙ্গে মহারাজা মানসিংহের সংযোগ ও ভবানন্দের ভাগ্যোদয় এবং তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দের দিল্লীর বাদশাহের নিকট গমন ও দেবীর অলৌকিক কৃপায় রাজমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভ বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে অন্নদামহিমা। রক্ষিত হয়েছে দেবমহিমা কীর্তন-কেন্দ্রিক সাহিত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণের ধারা।

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য মূলত শক্তিকেন্দ্রিক। পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীদের মাহাত্ম্যকীর্তন করে সমগ্র মধ্যযুগ ধরে যে বিশেষ ধরনেব কাব্য রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য নামেই তার পরিচিতি। কাব্যের পরিকল্পনাগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও কবিরা এই বক্তব্য রেখেছেন। গোষ্ঠী-পোষিত বিশেষ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেই কবিকুল ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে লৌকিক দেবতারাই প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীদেবতা। বস্তুত অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই উদাসীন শিবের প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তির প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এই উদাসীন শিব চরিত্র নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল। সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্নজাতি ও সামাজিক উৎপাদনের দিক থেকে সর্বনিম্নশ্রেণীর কৃষিদেবতা বলে তাঁর ওপর সমস্ত নিম্নপ্রবৃত্তি এবং নিন্দিত গুণগুলি আরোপিত হয়েছে। পৌরাণিক শিবের শান্ত সমাহিত আর্য মহিমা এখানে অন্তর্হিত। তার পরিবর্তে কর্মবিমুখতার দায়ে শিব ক্রমশই ব্রাত্য হয়ে উঠেছেন। আসলে "মানুষের মধ্যে জীবনকে ঘোষণা করার, প্রতিকূল পরিবেশের দুর্দৈব থেকে আত্মরক্ষা করার যে সহজ প্রবৃত্তি আছে তা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু নিষ্ক্রিয় জীবনদর্শন ও আরাধ্য দেবতা তার পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনি আঘাতের স্পর্শে সৃষ্ট নতুন ব্যক্তিসত্তার অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় ; মানুষের নিজস্ব সত্তা যেন বিরোধী দুটো সত্তায় বিভক্ত হয়ে যায়—(১) তার পুরাতন ভাবাদর্শের প্রতি আকর্ষণ ; (২) সৃষ্টি চেতনায় উন্মুখ নতুন, এই দুয়ের সংঘাত থেকেই নতুন ব্যক্তিসত্তাব আবির্ভাব। এই সংঘাতে পরিবেশের সঙ্গে খ প না খাওয়া পুরাতন আদর্শ আপনাকে বাঁচাতে পারে না ; মধ্যযুগের ঝড়ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় শিব তাই বেমানান।"

শক্তি দেবীর জনপ্রিয়তাও এই কারণে। শক্তি, যার ক্ষমতা কোন সীমায় ধরা যায় না।

ইচ্ছা অনিচ্ছা যার কোন নিয়ন্ত্রণ মানে না, যা সহজেই মানুষকে সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠাতে পারে আবার তেমনি ডোবাতে পারে অতল গহ্বরে। এমন এক শক্তির কল্পনা করেই এবং তার অপ্রতিহত প্রভাবের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে মানুষ তার পরিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে, সেই পরিবেশকে জয় করার চেষ্টা করেছে। তুর্কি আক্রমণ এবং আক্রমণোত্তর পর্বের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্থিরতায় মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অনিকেত। এই অবস্থা থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার আকুতি প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গল কাব্যগুলিতে। মঙ্গলকাব্যে শক্তিমাহাত্ম্য প্রচার লৌকিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত কারণ মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা লৌকিক দেবতা হিসেবেই পূজিত হতেন। অত্যন্ত বাস্তব এর ভাবাকাশ। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন ; সুখ-দুঃখ, দুর্গতি সদ্‌গতিও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ওদিকে দৃকপাত করিও না, সংসারে তাহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে ; সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না ধন জন-মান চায়।" শক্তি আধিপত্যের কারণ এটাই। বাংলার মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের মূলেও আছে এই মানসিকতা। এর মুখ্য ধারা তিনটি—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা'-ভাবনায় দেবীর চণ্ডিকা রূপের বিবর্তনে অন্নদার পরিণতি ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে এই পর্যবসানের একটা ক্রম আছে। নদীর সঙ্গে এই চণ্ডীরূপের বিবর্তনের একটা তুলনা চলতে পারে। উৎসমুখ থেকে নির্গত নদী, পার্বত্য অঞ্চলের আকস্মিক নিম্নাভিমুখিতার কারণে প্রখর গতিবেগসম্পন্ন, ক্রোধান্ধ—কিন্তু পরবর্তীকালে জনপদ সংসর্গে ক্রমশ মসৃণ কোমল ও সরস। নদীর সঙ্গে তুলনায় আমরা বলতে পারি দেবী চণ্ডিকার প্রথম স্তরের নিদর্শন মানিক-মাধবের 'চণ্ডি' কাব্য, দ্বিতীয় স্তরে কবিকঙ্কণের *অভয়ামঙ্গল* আর শেষ স্তরে *অন্নদামঙ্গল*। বলা যায় পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা পেয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, আর সেই কারণেই চণ্ডী নাম গ্রহণ করেছেন অন্নদা। দেবী কল্পনায়, কাহিনী পরিকল্পনায়, কাব্যের ভাব ভঙ্গি উদ্দেশ্য সবদিক থেকেই তখন তফাৎ ঘটে গেছে চণ্ডীমঙ্গল—অন্নদামঙ্গলে।

এইভাবে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ঘটেছে মানবতার নবীন অভ্যুদয়। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মূলত দেব-নির্ভর মানবতার-ই প্রকাশ দেখা যায়, দেবতার ওপর নির্ভর করে সেখানে মানবতার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যেই সর্বপ্রথম দেখা গেল দেব-বিনির্ভর মানবতা। *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ডের অন্নপূর্ণা (এমনকি দ্বিতীয় খণ্ডের কালিকা দেবী) নামমাত্র দেবীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। সহজচ্ছেদ্য দেবীত্বের আবরণে এঁদের ভিতর মানবতারই প্রকাশ ঘটেছে। ভগবৎ-শক্তির উর্ধ্বে মানবতার এই বিকাশের মধ্য দিয়েই সূচনা হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের যুগাভিসার।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধান সুর গোষ্ঠী-চেতনা। সমষ্টিগত ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষাই মধ্যযুগের কাব্যে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল ব্যষ্টিচেতনা; সমষ্টি নয় ব্যক্তির উন্নতিই ভারতচন্দ্রের কাম্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনে তাই তো তিনি তৎপর। এই একক ব্যক্তিত্বের বিকাশ আধুনিক সাহিত্যেরও প্রধান লক্ষণ। ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্য-সাধনার মধ্য দিয়ে কবি-ব্যক্তিত্ব প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

চণ্ডীদাসের কাব্যে কবি-ব্যক্তিত্ব নেই—বিদ্যাপতিতে আছে। তেমনি মুকুন্দরামে কবি-ব্যক্তিত্বের অভাব কিন্তু ভারতচন্দ্রে তার প্রাচুর্য। *অন্নদামঙ্গল* সচেতন মনের সৃষ্টি। এর প্রতিটি স্তবক এবং পংক্তির মধ্য দিয়ে কবির সৃষ্টি-সচেতনতা এবং কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিগুণাকরকে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য সঙ্গীত রচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সামনে ছিল কবি মুকুন্দের *অভয়ামঙ্গল*-এর আদর্শ-ভারতচন্দ্রে সেই আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে। শুধু বদলে গেছে যুগ, আর বদলে গেছে সেই যুগগত ব্যবধানকে স্বীকৃতি দিতে স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গী। দুই যুগের কালগত ব্যবধান দ্বিশতাধিক, সংস্কার রুচি জীবনাদর্শের পরিবর্তন এক্ষেত্রে অনিবার্য। একদিকে কবি মুকুন্দের যুগ অনিঃশেষ দৈবনির্ভরতার যুগ; আত্মবিশ্বাস তখন দেবাশ্রয়ের প্রার্থনার মধ্যে হারিয়ে গেছে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দৈবী অনুগ্রহের অপেক্ষা। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের যুগ, ধর্মশৈথিল্যের যুগ। আঘাতে বেদনায় নিষ্পেষিত হতে হতে মানুষের মধ্যে দেব আনুগত্যের চিহ্ন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কবি মুকুন্দের চণ্ডিকা-আরাধনা জীবনের দায়ে, অস্তিত্বের দায়ে। চণ্ডী তখন লোকজীবনের সর্বসংস্কারের মূলে। সর্বভয়নাশিনী, সর্বসুখদাত্রী, বিপদবারণী মহামায়া, আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা আরাধনা, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ ছায়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। সুতরাং সর্ব থেকে একক, লোকজীবন থেকে ব্যক্তিজীবন, গণ থেকে আত্মিক কামনা-বাসনা সিদ্ধির সংকেত ভারতচন্দ্রের কবিমানসকে অগ্রজের আদর্শ থেকে ভিন্নমুখী করল। নিঃসন্দেহে দুজন কবিই সমকালের প্রতিনিধি। সমসাময়িক জীবনের নিপুণ ভাষ্যকার। তবু প্রথমজন রাজার আদেশ শিরোধার্য করেও গণসভার কবি হয়ে রইলেন। ষোড়শ শতকের সোনাঝরা সময়ের হয়েও লুকিয়ে থাকা সহজ অনাড়ম্বর দুঃখী জীবনের কথক হিসেবেই তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিলেন। অপরজন রাজসভার কবি, আত্মমনস্ক। আর সে-কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ভাগ্যের দ্রষ্টা হয়েও রাজসভাকাব্যের শর্তপূরণকারী।

তাই *অন্নদামঙ্গল*-এ ধর্ম আছে। কিন্তু ধর্মের বন্ধন শিথিল। মানবজীবনের আবেগ আকাঙ্ক্ষা ধর্মের আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জীবন কথাতে উঠে এসেছে তাঁর যুগের রস ও রুচি। রাজা এবং রাজার সভাসদ্‌দের আনন্দবিধানের জন্য রচিত এই কাব্যে ভোগবিলাস, অশ্লীলতা যেমন এসেছে ; তেমনি রয়েছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য আর লিপিচাতুর্য। তথাকথিত অশ্লীলতাকে এই বৈদগ্ধ্যের নির্মোকে ঢেকে রেখেছেন কবি। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ'—কবির এই উক্তিতে যুগের প্রতিধ্বনি আছে। কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে ব্যবসায় অর্থনীতির গৌরবকীর্তন উদীয়মান বণিক শক্তির ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তিনি যুগসন্ধির কবি—তাঁর মঙ্গলকাব্য 'নূতন মঙ্গল'।

ভারতচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা

ইতিহাস সত্যদ্রষ্টা, সংযতবাক এবং অমোঘ। নির্বিকার এবং অনাদ্যন্ত। নিরেট বাস্তবের চলৎমূর্তি। কালের তথ্যবাহক। যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহের মহাসমগ্রতা ঘটে ইতিহাসে। মহাকালের বিরাট প্রবাহ অনুভূত হয় তার প্রতিটি বাঁকে। সর্বোপরি ইতিহাস জ্ঞানাত্মক। অন্যদিকে ইতিহাসের সত্য জীবনরসায়িত হবার পরে তা আর ঐতিহাসিক সত্য থাকে না। যে সত্য কল্পনার সঙ্গে রফা করে, শুধু রফা নয়, যে সত্য কল্পনার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় তার নাম সাহিত্য। নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবী এই সাহিত্য নামক দুঃসাহসী কল্পনার উদ্বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়েছে সাগ্রহে। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, ইতিহাসের তথ্যগত সত্য হল 'বিশেষ সত্য' , আর কাব্যাদির সত্য হল 'কল্পনার সত্য'। অর্থাৎ 'সত্য' থাকবেই শুধু তার মাত্রার বদল ঘটবে। কারণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সর্বস্তরেই তন্ময় বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। একটা পরিকল্পনা থেকে তার শৈল্পিক পরিণতি পর্যন্ত প্রক্রিয়ায় তা কখনোই বাস্তব-স্পর্শ বর্জিত নয়। সামাজিক জীবনের প্রতি নিষ্ঠায় ও সত্যদর্শনে একজন ঐতিহাসিকের সঙ্গে একজন শিল্পীর বিষয়, উদ্দেশ্য এবং আদর্শবোধগত ততটা ফারাক নেই। দেশ-কালের একই ফ্রেমের মধ্যে তাঁরা যথাক্রমে তথ্যের আকর এবং সৃষ্টির স্বাধীনতা খুঁজে পান। তবু ইতিহাসের তথ্য আর শিল্পের বাস্তব তুল্যমূল্য হতে পারে না। সাহিত্যিক একটা বিশেষ কালের চলমান জীবনের ছবি আঁকেন, তথ্যগত কিছু বিচ্যুতি থাকলেও সেখানে সমকালের জীবন ও জনপদের বাস্তব চিত্রই উঠে আসে। ইতিহাস অবশ্য তথ্যের বিকৃতি ঘটতে দেয় না,—তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করাই ইতিহাসের কাজ। এই প্রক্রিয়ায় হয়তো কিছু ফাঁক থেকে যায় সাহিত্যিক যা কল্পনায় ভরিয়ে দিতে পারেন। সাহিত্য কল্পনা-নির্ভর হলেও জীবন-অতিশায়ী নয়, বরং জীবন-অভিচারী। ইতিহাসের কঠোর সত্যোচ্চারণের যন্ত্রণা বা তথ্যস্বীকৃতির পরাধীনতাকে সাহিত্যিক তাই অতিক্রম করতে পারেন অনায়াসে।

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ইতিহাস এসেছে এভাবেই, কিছুটা কল্পনার হাত ধরেই । কবির জীবনালোকে তমসাচ্ছন্ন কালের রূপ ততটাই প্রাধান্য পেয়েছে যতটা হলে ইতিহাসের তথ্যভারকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন। আঠারো শতকের বদলে-যাওয়া জীবন—একটানা ভাঙনের মধ্যে জীবনের নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তা, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমতে থাকা কুশাসন আর চরিত্রহীনতার দুষ্ট ক্ষত—অভাব, পীড়ন, লুণ্ঠন আর শোষণে বিপর্যস্ত বাঙালির জীবন-জীবিকার ইতিকথন *অন্নদামঙ্গল*-এ বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। আবার সেই সূত্র ধরেই এসেছে ভূস্বামীপোষিত একজন সভাকবির বিচিত্র ভাগ্যসন্ধানের ওঠাপড়ার কাহিনী আর রাজসভার রঙিন বর্ণময়তার ফাঁকে-ফোকরে ইতিহাসের নির্মল রেখাচিত্র।

ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হয়েছে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডের ('অন্নপূর্ণা মঙ্গল' অংশ) দুটি অংশ—'গ্রন্থসূচনা' এবং 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন'। 'গীতারম্ভ' থেকে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ স্পর্শ আর পাওয়া যায়নি। রাজসভাকবি হয়েও নিজস্ব দায়বদ্ধতায় এবং আপন কবিপ্রাণের তদ্‌গত আনন্দে তখন সত্য এবং কল্পনার সাবলীল মেলবন্ধন ঘটে গেছে অনায়াসে। ভারতচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার আলোচনায় এই দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

ওঠে। কারণ ভাবতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* (তিন খণ্ড মিলিয়ে) সেই দর্পণ যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা সামগ্রিক চিত্র আমরা দেখতে পাই। কবি কাব্যেব মধ্যে দিয়েই সমকালের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় পরিমণ্ডল, রুচিবিকার, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদিব সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন।

'গ্রন্থসূচনা' অংশে ইতিহাসের তথ্যগত বিবরণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমি তখন নবাবি আমলের আওতায়। গিরিয়ার যুদ্ধে সুজা খাঁ-তনয়ের মৃত্যু দিয়ে এই উপাখ্যানের আরম্ভ, তাঁকে কৃতঘ্নযুদ্ধে নিহত করে বাংলার নবাব হলেন আলিবর্দি। দ্রুত হাতে প্রশাসনিক রদবদল করে বিশ্বস্ত আমলাদের এক পবিমণ্ডলে গড়ে তুললেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এর বিবরণ আছে .

কটকে মুরসীদকুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥...

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ষড়যন্ত্র আর কৃতঘ্নতা দ্বারা অধিকৃত মসনদ একদিনেব জন্যেও স্বস্তি দেয়নি আলিবর্দিকে। গোটা বঙ্গভূমি জুড়ে তখন ঘনীভূত হচ্ছে রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আর কেন্দ্রীয় শক্তির ভাঙনজনিত বিপর্যয়। নবাব জর্জরিত হয়ে পড়ছেন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে। এমনই এক অবিন্যস্ত পটভূমি চমৎকার সুযোগ করে দিল মারাঠা শক্তিকে সর্বভারতীয় অধিকার বিস্তারের ক্ষেত্রে। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্গিবা বঙ্গের গ্রাম-নগর আক্রমণ করে, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও অপহরণের দ্বারা সমগ্র দেশে একটা ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করেছিল। প্রথম দিকে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যাসমেত দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন এবং পরে চৌথ বা রাজস্বের দাবিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি—বাংলাদেশের সর্বত্র প্রগাঢ় আতঙ্কের কালোছায়া বিস্তার করেছে। এই অবস্থায় কখনও অর্থ দিয়ে কখনও বা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বর্গির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবার পথ খুঁজেছেন নবাব আলিবর্দি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'গ্রন্থসূচনা' অংশে বর্গিপ্রসঙ্গ এসেছে। সমকালে রচিত গঙ্গারাম দত্তের *মহারাষ্ট্রপুরাণ*-এও বর্গিদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পুবাণের ছাঁদে প্রথামাফিক ভাবে কাব্যারম্ভ হলেও পরবর্তী অংশ থেকেই কবি যথাসম্ভব সত্যনিষ্ঠভাবে সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনাবলী ও বর্গিদের বাংলা আক্রমণের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। কবি গঙ্গারামের মতে, আলিবর্দি নবাব হওয়ায় বাদশাহ খুশি হতে পারেননি এবং তাঁকে কোনো খেতাব প্রদান করাও হয়নি। সেই রোষেই আলিবর্দি দিল্লীতে খাজনা পাঠানো বন্ধ করেন। প্রায় দু'বছর বন্ধ থাকে এই খাজনাপ্রেরণ। বাদশাহের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী মহারাষ্ট্র তখন বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ পেত। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহের কাছে সেই চৌথ দাবি করলে বাদশাহ আপন দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার অভিপ্রায়ে মারাঠা-নায়ক দ্বিতীয় শিবাজী বা সাহুবাজাকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ বাবদ বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকা আদায়ের পরামর্শ দেন। *মহারাষ্ট্র পুরাণ*-এর বর্ণনায়।

আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চৌথাই নে এন জেন জবর করিঞা॥

এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোন জনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিআ তথা আনিব চৌথাই॥

সুতরাং *মহারাষ্ট্রপুরাণ*-কারের মতে, দাক্ষিণাত্যের সাতারার রাজা সাহুর আদেশক্রমেই রঘুরাজা স্বীয় অনুচর ভাস্কর পণ্ডিতকে চৌথ আদায়ের জন্যে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। ঝরঝরে জীবন্ত বর্ণনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে ইতিহাস। এমনকি আক্রমণের তারিখটিও এখানে পাওয়া যায় :

বৈশাখের উনিশা যাএ বরগি আইল তাএ
মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।

ঐতিহাসিক G. S. Sardesai-এর মতে এটি ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকের ঘটনা।

গঙ্গারাম দত্তের রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের যথাযথ বিবরণ আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে অবশ্য বর্গি আক্রমণের কারণ হিসেবে আলিবর্দির উড়িষ্যার আক্রমণ এবং ভুবনেশ্বরে তাঁর সেনাদের শিবের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরে দৌরাত্মকেই দায়ী করা হয়েছে। শিবের পরামর্শক্রমে নন্দী গড়সেতারায় বর্গি রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা তখন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

মুসলমান শাসকের প্রতি গঙ্গারাম দত্তেরও খুব যে একটা অনুকূল মনোভাব ছিল তা নয়, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিধর্মী শাসকের প্রতি মনোভাব প্রায় বিদ্বেষের পর্যায়ে চলে গেছে—সত্যচিত্র তাই সেখানে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় নি। নবাব আলিবর্দির সৈন্যগণ কর্তৃক ভুবনেশ্বর মন্দির লুণ্ঠন ও অপবিত্র করার কারণে বাংলাদেশে বর্গি আক্রমণ হয়—এ তথ্য ইতিহাসসম্মত নয়। ভারতচন্দ্রের ইতিহাসচেতনা এখানে খণ্ডিত।

আসলে ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। ঘটমান বহির্দৃশ্যের নেপথ্যে চলতে থাকে ভিন্নধর্মী কোনো অন্তর্দৃশ্যের চেতনপ্রবাহ। আর সেখানে কবি ভারতচন্দ্র শুধুই একজন সমকালদ্রষ্টা নির্বিকার জীবনভাষ্যকার নন—নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় সভাকবি। বর্গি আক্রমণ প্রতিহত করতে নবাব আলিবর্দির রাজকোষ শূন্যপ্রায় হলে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থসংগ্রহ করতে শুরু করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের উপর নির্দেশ আসে বার লক্ষ টাকা প্রদানের। রাজা অসমর্থ হন। ফলে আলিবর্দির নির্দেশে তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় কিছু কাল কাটাতে হয়। আশ্রয়দাতার প্রতি নবাবের এই অমানবিক ব্যবহার ভারতচন্দ্রকে কুপিত করেছিল এবং সেই কারণেই হয়তো আলিবর্দি প্রসঙ্গে কবির ইতিহাস-দৃষ্টি কিছুটা খণ্ডিত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণচন্দ্রের মহত্ত্ব বর্ণনায় কবির লেখনী অকৃপণ .

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি।
... .
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান॥
দেবীপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়।
এহ পাপে সেহ রাজা ঠেকিলেন দায়॥

মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বাব লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে বাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে।
কত শক্র কত মতে লাগিল বিবাদে॥

অর্থাৎ বাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিশ্রুত অর্থ সর্বভক্ষ সুজন সাজোয়াল আত্মসাৎ করেছিল। শুধু রাজার অর্থই নয়. প্রজার সম্পত্তিও সমভাবে লুণ্ঠিত হয় তাব দ্বারা। বর্গির শোষণেব সঙ্গে কবি যাব কোনো প্রভেদ দেখেননি। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দেশব্যাপী অরাজকতার সুযোগ সবচেয়ে বেশি করে তুলত এই সুজন সাজোয়ালের মতো মানুষেরা। এ-সবই ভারতচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার পরিচয়বাহী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

সময়টা আঠার শতক। সময়টা যুগসন্ধিক্ষণ। ইতিহাস বেদনাভারাক্রান্ত। ষড়যন্ত্র, লালসা, ক্ষমতার লড়াই আর নির্বিচার শোষণে আচ্ছন্ন গোটা শতাব্দী। ভারতবর্ষে বিদেশীর আগমন নতুন নয় বরং বাঙালি চিরকালই বিজাতি-শাসিত। সপ্তম শতাব্দীর শশাঙ্ক-নরেন্দ্রগুপ্ত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর যদু-জালালুদ্দিন ছাড়া বঙ্গভূমির কোনো শাসকই এদেশীয় ছিলেন না। তবুও ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে-সব বহিরাক্রমণকারী, বিশেষত মুসলমানেরা এদেশে এসেছিলেন তাঁরা শুধুই বাণিজ্যের পথ ধরে বিনীত মুখোশের অন্তরালে অ ততায়ীর ভূমিকায় আসেননি। ফলে বঙ্গভূমির জনগণের পক্ষেও এঁদের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন হয়নি। অন্যদিকে ইংরেজরা এসেছিল ছদ্মবেশে, ছলনা-শঠতা-কপটতা দ্বারা ভারতবর্ষের নিহিত ঐশ্বর্যের সর্বস্বাপহরণকারীরূপে। এইভাবে পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ বেয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমি তথা বাঙালি জাতি মুসলমান এবং ইংরেজ এই দুই শাসকশক্তির সঙ্গে পরিচিত হল।

সাহিত্য দেশকাল-নির্ভর। দেশ-কালের পটভূমিতেই গড়ে ওঠে সাহিত্য-প্রতিমা। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে-কোন সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই সমকালের প্রেক্ষিত সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি *অন্নদামঙ্গল*-কেও সেই টালমাটাল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে।

শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেই অষ্টাদশ শতাব্দী এক অস্থিরতার কাল। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল প্রতাপশালী বাদ্‌শা ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরলো। মারাঠা শক্তির জাগরণ বাদ্‌শা আলমগীরের রাজত্বকালেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সে শক্তি ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। অন্যদিকে শিখশক্তির উত্থান ঘটল। ঔরঙ্গজেব-পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতা আর অপদার্থতা হেতু কেন্দ্রীয় শাসনে শিথিলতা দেখা গেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ দানা বাঁধলো। বারংবার বিদেশীদের আক্রমণে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হল। ১৭৪৮-১৭৬৭ পর্যন্ত সময়কালে আহমদ শাহ্ আবদালি সাত-সাতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করল। এই ঘুণ-ধরা রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামোয় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি একটু একটু করে পাকা হতে লাগল

ভারতব্যাপী এই বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার ঢেউ বঙ্গভূমিকেও স্পর্শ করেছিল প্রত্যক্ষভাবে। ইংরেজ বণিকেরা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম ঘাঁটি হিসেবে বঙ্গভূমিকেই বেছে নিয়েছিল। তাদের পরিকল্পনা আর উদ্যম ফলপ্রসূও হয়ে উঠল অচিরে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। ১৭০৩ সালে দেওয়ান পদের অতিরিক্ত সহকারী সুবেদারের পদও লাভ করলেন তিনি। ১৭১৩-য় হলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার। বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়ে কার্যত বাংলায় নবাবি শাসনের সূচনা করলেন তিনি। রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হয়ে জায়গীরদারি প্রথার পরিবর্তে যে ইজারাদারি প্রথার প্রবর্তন করলেন তার প্রভাব পড়লো অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। ইংরেজ বণিকদের অধিকতর সুযোগসুবিধা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন তিনি। স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হয় এবং এর জের চলে অনেকদিন।

সতেরো শো সাতাশে তাঁর মৃত্যু হলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন। তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে একাধারে পারিবারিক এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত রূপ নেয়। জমিদারদের একাংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাংলার স্থিতিব দিন অবসিত হয়। সুজাউদ্দিনের মৃত্যু সতের শো উনচল্লিশে। তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বসলেন মসনদে। সতের শো উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ—মাত্র এক বছর তাঁর শাসনকাল। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অপদার্থ। সর্বদাই বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন। স্বভাবতই দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আমির-ওমরাহ, জমিদার, বণিক ও রাজকর্মচারীদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার সূচনা তাঁর আমলেই —আর এই সবকিছু মিলে জনজীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ।

আলিবর্দি খাঁ পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন। সুজাউদ্দিনের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁর আসল নাম মির্জা মহম্মদ আলি। আলিবর্দি খাঁ উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন স্বয়ং সুজাউদ্দিন, শুধু তাই নয় তাঁকে বিহারের সহকারী সুবেদারের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আলিবর্দি পাটনা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে সরফরাজকে আক্রমণ ও 'গিরিয়ার যুদ্ধে' তাঁকে হত্যা করে তিনটি সুবার সুবেদার হয়ে বসলেন। দিল্লিব বাদশা মহম্মদ শাহকে ঘুষ দিয়ে সুবেদারির ফরমান-ও লাভ করলেন। প্রভু-পুত্রকে হত্যা, ঘুষ দিয়ে সুবেদারি লাভ এ-সব থেকে বেশ বোঝা যায় যে, দেশের নৈতিকতার মান তলানিতে ঠেকেছিল। আলিবর্দি ছিলেন দক্ষ শাসক, কিন্তু একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত হলেন তিনি। মসনদে বসতে না বসতেই উড়িষ্যার সহকারী সুবেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিদ্রোহ দমনে বহু শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় হয়ে গেল। এরপর মারাঠা বর্গিবাহিনী বাংলা আক্রমণ করল। একটানা দশ বছর চলল সেই হাঙ্গামা (১৭৪২-১৭৫১)। বর্গি হাঙ্গামায় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হয়। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল, অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত বিত্তসম্পত্তিও নাশ হল। হাঙ্গামা দমন করতে গিয়ে আলিবর্দি সর্বস্বান্ত হলেন। রাজকোষ শূন্য, সৈন্যরা বেতন পায় না। দু'দুবার এরই মধ্যে আফগান সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দমন করলেন আলিবর্দি (১৭৪৫-১৭৪৮)। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদার, ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশি বণিকের কাছ থেকে অতিরিক্ত আবওয়াব আদায় করলেন। স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হল। শেষ রক্ষা কিন্তু হল না। উড়িষ্যা সুবা আর প্রভূত অর্থের বিনিময়ে বর্গি হাঙ্গামা থেকে নিস্তার পেতে চাইলেন আলিবর্দি। আপসে শান্তি কিনলেন। কিন্তু অশান্তি শুরু হল অন্য দিক থেকে। কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র আর আত্মীয় মীরজাফর ও রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহর চক্রান্তে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলেন আলিবর্দি। এর প্রভাব পড়ল প্রশাসনে, অর্থনীতিতে। সাহিত্যেও তার পরিচয় পাওয়া গেল। ভারতচন্দ্র রায়ের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য (১৭৫১) এই অশান্ত সময়পর্বের ফসল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাকি ইতিহাস আরো জটিল, নিরঙ্কুশ এবং ঘটনা-ভারাক্রান্ত আব নির্মম। পলাশির যুদ্ধ, নবাবির পতন, কোম্পানির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর, মন্বন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বিপ্লব-বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান প্রকোপে বঙ্গভূমির তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। ভারতচন্দ্রের লেখনীও ততদিনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবু *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ঘোষিত হয়েছে সেই সমাসন্ন যুগসঙ্কটের বার্তা। আর সেই কারণেই এ-কাব্য শুধু অতীত ঐতিহ্য আর সমকালকেই নয়—ভবিষ্যৎকালকেও প্রতিফলিত করল নিখুঁতভাবে।

অন্নদামঙ্গল-এ প্রতিফলিত ভারতচন্দ্রের কবিমানস

ভারতচন্দ্রের সমাজ-অর্থনীতি-ধর্মদৃষ্টি

দৃশ্যগ্রাহ্য ইতিহাস বর্ণন এবং অন্তরঙ্গ ইতিহাসবোধ ভারতকাব্যের দেহ ও আত্মার সামগ্রী। একদিকে ইতিহাসের বহির্প্রভাবে রচিত *অন্নদামঙ্গল*-এর 'গ্রন্থসূচনা' অংশের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দৃশ্যমালা তথা বর্গি আক্রমণের নির্মম অভিজ্ঞতাকে দেশকালের সামগ্রিক অভিনিবেশের মধ্যে সংস্থাপন করে বর্গি আক্রমণে অসহায় বঙ্গভূমির নিয়তি দর্শন করালেন কবি :

আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি দৌড়ায় জাঙ্গাল॥

অন্যদিকে কবির তীব্র অনুভববেদ্য ইতিহাসবোধের পরিচয়ও কাব্যের নানা স্থানে পাওয়া গেল, যে ইতিহাসবোধে মিশে আছে একজন নির্ভেজাল সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি। এখানে অর্থনীতি ও ধর্মবোধ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে ইতিহাসের অন্তরঙ্গ অনুধ্যান রসাল কাব্যপ্রকোষ্ঠের গভীরে তার শিকড় চালনা করল। এই গভীরতা থেকে উচ্চারিত হল দেশের অন্তঃসারশূন্য বর্তমান আর ভবিতব্যের সেই অখণ্ডনীয় বার্তা :

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥

উচ্চারিত হল দেব-বুভুক্ষার ছলে বাংলার 'হা-অন্ন' রূপ :

যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা-অন্ন হা-অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥

তীব্র ব্যঙ্গের চড়া সুরে তখন তাল কেটে যেতে লাগল ধর্মের মুখোশ পরা সমাজের :

অন্নপূর্ণা যার ঘরে   সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।

আসলে পূর্ববর্তী শতকের সমাজ ও ধর্মের রূপটি ভারতচন্দ্রের সময়ে আর অবিকৃত থাকল না। ভারতচন্দ্র দেখলেন অর্থনৈতিক কাঠামোর ছলনাময় রূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বদলে যাচ্ছিল বঙ্গভূমি আর্থ-সামাজিক চরিত্র। তবু পলিমাটিতে গড়া বাংলার বিস্তৃত, উর্বরা সমতলভূমি, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অসংখ্য শাখানদীর জলধারায় পুষ্ট কৃষিভিত্তিক জনজীবন সহজে নিঃস্ব হয়নি। অনেক শোষণের পরিণামে বঙ্গভূমি তার অন্নসংস্থান হারিয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন সুশাসক। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে অস্থির, বিশৃঙ্খল বঙ্গভূমির দেওয়ানরূপে এ দেশের মাটিতে তাঁর প্রথম পদার্পণ। উন্নত ধরনের একটি রাজস্ব পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করলেন। পূর্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে জায়গীর-ভোগী সরকারি কর্মকর্তা থেকে সাধারণ কৃষক পর্যন্ত সকলকেই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে বাধ্য করলেন। বাংলার জমিকে আবাদি, অনাবাদি ও বন্ধ্যা এই তিনভাগে ভাগ করে মুর্শিদকুলি প্রাক্তন ও বর্তমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসলের হিসেব এবং কৃষকের ক্ষমতা বিচার করে ভূমিরাজস্ব স্থির

করলেন। এর ফলে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় (১৬৫৮-তে শাহ সুজার আমলে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১, ৪২, ৮৮, ১৮৬ টাকা) রাজস্ব বৃদ্ধি পেল ১১,৭২,২৭৯ টাকা। অর্থাৎ ৬৪ বছরে (১৬৫৮-১৭২২) ১৩·৫ শতাংশ রাজস্ব বাড়ল।

পুরাতন জমিদারদের খাজনা প্রদানে অক্ষমতা আর অনীহা লক্ষ করে নবাব জমিদারদের নামেমাত্র বহাল বেখে ইজারাদার বা ঠিকাদারের ওপব উপযুক্ত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে বাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এ প্রথার নাম 'মালজামানি'। ইজারাদাররাই পরবর্তীকালে নতুন জমিদার হিসেবে গণ্য হলেন। জন্ম নিল এক নতুন অভিজাত শ্রেণী। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই 'কনট্রাক্ট সিস্টেম' বা 'মালজামানি ব্যবস্থাকে সমর্থন কবেননি। তাঁব মতে, ইজারাদারদের প্রবল চাপে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জমিদার পবিবাবগুলি মুর্শিদকুলি ও কর্নওয়ালিশের ব্যবস্থায় (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজস্ব আদাযেব ব্যাপারে মুর্শিদকুলি প্রাপ্য অংশের শেষ কণাটিও উশুল করে নিতেন। সলিমুল্লাহ তাঁব *তারিখ-ই-বাঙ্গালা*-য় রাজস্ব আদায়ে মুর্শিদকুলির কঠোরতার বিবরণ দিয়েছেন।

মুর্শিদকুলি এ খাতে (ওয়াজামাৎ খাসনবিশি) ২,৫৮,৮৫৭ টাকার বাড়তি ভূমিবাজস্ব আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাংলা থেকে সোনাব মোহর যেত। এই সব অতিবিক্ত করের বোঝাও চাপত রায়তের ওপব। বাড়তি ভূমিকরের আরোপ বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে একদমই শুভ হয়নি। তাই এই সময় দ্রব্যমূল্য যথেষ্ট কম থাকলেও কিংবা ফলন বৃদ্ধি পেলেও কৃষকের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়নি, সামগ্রিকভাবে পুঁজিও গড়ে ওঠে নি। বাংলার মানুষ ক্ষেতে ও তাঁতে শ্রমের বিনিময়ে সামান্যতম সম্পদের মুখও দেখেনি। ফলে দুর্দিনে এরা সঞ্চয়ের অভাবে দলে দলে মাবা পড়ত। অর্থনীতির সূত্রানুসারে চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান বেশি থাকলে এবং অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় মুদ্রার যোগান স্বল্প থাকলে পণ্যমূল্য নামমাত্র হতে বাধ্য। অর্থনৈতিক শোষণের ফলে বঙ্গভূমির পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। ক্রয়ক্ষমতা থাকলে তবেই চলতি বাজাবদরকে সস্তা বলা যায়। আর ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত আয়ের ওপর। কিন্তু তখনকার বৃত্তিজীবীদের বেতনহার ছিল যৎসামান্য তাই অত্যল্প দ্রব্যমূল্যও তাঁদেব কাছে মহার্ঘ বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশ জুড়ে কোনক্রমে টিকে থাকা 'অগণিত অন্নহারা মানুষের দল প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, শাসকের অত্যাচার আর মহাজনের শোষণকে নির্বিবাদে সহ্য কবে প্রায়শই মৃত্যুবরণ করেছে।

বর্গির আক্রমণ সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে যায়। বর্গি আক্রমণের সময় আলিবর্দি ছিলেন বাংলার নবাব। বর্গি-আক্রমণে নবাবের অর্থনৈতিক অবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। ২২,০০,০০০ টাকা নমুনা ও ১২,০০,০০০ টাকা চৌথের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বর্গিদের হাত থেকে নিস্তার পান। এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল প্রজাদের কাছ থেকে জমিদারদের মাধ্যমে। কৃষ্ণচন্দ্রেব পূর্বপুরুষদের কাছে বাকি খাজনার দায় ছিল, তাই কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে নজরানা হিসেবে সেই দায় নবাব চেয়ে বসলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে—বর্গিদের আক্রমণে দেউলিয়া রাজকোষের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার সামাল দিতে কৃষ্ণচন্দ্র অবশ্য এই অর্থ নবাবকে দিতে পারেন নি, ফলে কিছুদিনেব জন্যে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। এখানে বলার কথা এই যে, মুর্শিদকুলির আমল থেকেই বাংলার প্রজারা করভারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এর প্রভাবে

বাংলার কৃষি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐতিহাসিক K. K. Datta বর্গি আক্রমণে বিধ্বস্ত বঙ্গভূমির আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "The repeated invasions of the Marathas also occasioned a great scarcity of money. The Bank of Jagat Seth alone was robbed of a huge amount, sums of realised rents were sometimes plundered by them on the way of their being carried to the Nawab's treasury, the important market places were once and again, deprived of their cash and stock and the ordinary people had to protect their lives by paying money to the Maratha soldiers". সমকালে রচিত *মহারাষ্ট্রপুরাণ*-ও এমনটাই বলে :

ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিকে লোক পলাএ ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্ত্তিসবর্ণে লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে॥

এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তবে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥

আর 'প্রাণে মরা'র দলটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। আগ্রাসী লুণ্ঠনের পাশে ছিল অনাহার :

টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তু নাই পাএ।
ক্ষুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ॥

মহারাষ্ট্রপুরাণ নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে বর্গি হাঙ্গামার। *অন্নদামঙ্গল*-এও বর্গি হাঙ্গামার পরিচয় পাওয়া যায় :

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

বর্গি আক্রমণে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পঙ্গুতা মানুষের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।

ভারতচন্দ্র জানতেন যে, রাজনৈতিক সঙ্কট দেশের আর্থিক বনিয়াদকে নষ্ট করে দিতে পারে। যার ফল অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেয় নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে। অন্নের অভাবে মানুষের মৃত্যু সেই নৈতিক অধঃপতনকেই অনিবার্য করে তোলে। তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে সমকালের ছাপ সবচেয়ে গভীর। নিঃস্ব ভূপতির সন্তান হয়ে মারীগ্রস্ত সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাধারণের দুঃখের স্বরূপটি তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে ভাঙন-ধরা গ্রামীণ বাংলার সমাজ, অর্থনীতি আর রাজনীতির অন্তর্নিহিত মৌল অন্যায়ের বীজটি খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি।

আবার সেই সূত্র ধরে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তেই বাংলাদেশের সমাসন্ন ঐতিহাসিক নিয়তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যে।

অর্থের প্রাচুর্যকে আমরা বলি ঐশ্বর্য ; বর্ণময় সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের পক্ষে সেই ঐশ্বর্যের অপরিহার্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীব দিকে তাকিয়ে তাকে সমর্থনের উপযুক্ত নজির যোগাড় করতে পারেননি তিনি। ববং দেখেছেন প্রাণ ধারণ করার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তা নেই মানুষেব। অন্ন প্রাপ্তিই জীবনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই প্রত্যয়েব স্বীকৃতিতেই রচিত হল *অন্নদামঙ্গল* কাব্য।

ভাবতচন্দ্রের কাব্যের আরাধ্যা হলেন দেবী অন্নদা। এঁর রূপকল্পনার মূলে দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর *প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন* গ্রন্থটিতে। প্রথমটি হল, বর্গির তাণ্ডবে গঙ্গার পশ্চিম দিকের চাষিরা জোত-জমি ছেড়ে পালিয়ে আসে, ফলে বহু বিঘা জমিতে ফলন বন্ধ থাকে বছরের পর বছর। ঘনিয়ে আসে দুর্ভিক্ষেব করাল ছায়া। যদিও ১১৭৬ সালের (১৭৬৯ খ্রি.) মন্বন্তরের পূর্বেই কবিব মৃত্যু হয়েছিল, তবুও ভাবতচন্দ্রেব মতো প্রতিভা আগামী দিনের সেই ভয়ঙ্কর ছবি প্রত্যক্ষ কবেছিলেন বলেই তাঁর কাব্যে অন্নের এত গুরুত্ব। তাই তাঁর উপাস্য দেবীর নাম অন্নদা। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল— রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি বিস্ময়কর কৃতিত্ব। ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন এত অল্প সময়ে কি করে তিনি নবাব সরকারে দেনার ঐ বিরাট অঙ্ক পরিশোধ করে আপন রাজকোষও পূর্ণ করছিলেন। ঐতিহাসিকদের বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। প্রজাদের কাছ থেকে রাজা জমিদারদের আদায়ের ইতিহাস তো তাঁদের জানা থাকারই কথা।

সমাজভাবনা :

কবি ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদপুষ্ট। সমাজবাস্তবতার খুঁটিনাটি তুলে ধরবার সাধ্য কোথায় তাঁর। রাজসভাকবির সীমাবদ্ধতা তো এখানেই। তাই অন্য এক কৌশলে সমকালকে তুলে ধরেছেন কবি। সমাজমানব অপেক্ষা অধিক প্রকাশ করেছেন সমাজমানসকে। কাব্যের রাজনির্দেশিত সৌন্দর্যপ্রদর্শনীতে মনের রেখা এঁকেছেন স্বেচ্ছায় —জীবনরঙিন শিল্পমেলায় ভিড় করিয়েছেন নিরন্নদের। আর এই সব মানুষগুলোর প্রতিনিধি কবেছেন শিবকে। এ শিব বেদোক্ত মহাদেব নন, সৃষ্টির আদি রচয়িতা লিঙ্গরূপী সনাতন দেবাদিদেব নন, নিছকই লৌকিক, নেহাৎই লোকজীবন-সম্ভূত তিনি। নামেই তিনি দেবতা কিন্তু ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমানকালের বাঙালি। বৈষয়িক জীবনে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নায় সর্বতোভাবে তিনি অভাবক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন এক ভ্রষ্টাচারী গৃহস্থ পুরুষ। আহমদ শরীফ এই শিবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

> "যে বিরুদ্ধ পরিবেশে পর্যুদস্ত পরাভূত মানুষ আশা-ভরসা চ্যুত হয়ে জীবনের মূল্য মর্যাদা হারিয়ে নিঃসম্বল নির্বিকার জীবনে আপাত নির্বেদ স্বস্তি উপভোগ করে, আত্মসম্মান বোধ থাকে না বলেই তখন সে পরিবেশেই তার ভিক্ষায়. চুরিতে ও মিথ্যাভাষণে আগ্রহ জাগে। নির্জিত চির শোষিত পীড়িত বাঙালীর মানস-সন্তান এবং জাতীয় প্রতীক ও প্রতিভূ দেবতা শিবঠাকুরও অঙ্গে অন্তরে তেমনি নিঃস্ব নির্লক্ষ্য জীবনের প্রতীকরূপে চিত্রিত।"

তাই ভারতচন্দ্র দুঃখের আভূষণে হরগৌরীকে সাজিয়েছেন। তাঁদের শ্মশানঘরে বাঙালির যে গৃহস্থালি, সেখানে বেদনা, বঞ্চনা আর অনশনের অবাধ বিস্তার। শঙ্কর ভিখারি, ভিক্ষায়

কিন্তু তার পেট ভরে না। পেটের জ্বালায় ছটফট করতে করতে সমাজ সংসারকে বিষাক্ত দেখেন তিনি :

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই॥

'পেট ভরা খাবার' সে তো স্বপ্ন—অষ্টাদশ শতাব্দীর আপামর বাঙালির কাছে মরীচিকা। শতাব্দী সূচনায় (১৭১১ খ্রি.) কন্যাদায়গ্রস্ত একটি কুলীন পরিবারের রমণী গৌরীদানের সময় বৃদ্ধ অকর্মণ্য জামাইকে সাশ্রুনেত্রে এই অনুরোধটুকুই করেছিল—'আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিহ পেট ভর্যা ভাত....' (রামেশ্বর চক্রবর্তী, *শিবায়ন*)। কিন্তু ফল হয়েছে কতটুকু? পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে বরং ভারতচন্দ্রের পার্বতীর দুর্দশা আরো চরমে পৌঁচেছে। আট বছরের গৌরীদান-এর বালিকা তখন যুবতী। তীব্র অনটনের সঙ্গে লড়তে লড়তে নিষ্কর্মা পতির উদ্দেশ্যে এখন তিনি সরব হতে শিখেছেন। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কলহের এই অংশ আসলে মানুষের নিরুদ্ধ জীবনপিপাসার সেই মুক্তিকামনা যা অন্তত এই শতাব্দীর কাছে অধরা।

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

যে নিদারুণ দারিদ্র্য, যে অসম পরিণয়-প্রথা, যে সাংসারিক নিত্য অভাবের জ্বালা দাম্পত্যপ্রেমকে তিক্ত ও বিস্বাদ করে তোলে সেই অতি বাস্তব একটি জীবনগাথা ভারতচন্দ্র পাঠককে উপহার দিলেন। এখানে উপহাসের শ্লেষে বিদ্ধ হল দেবসমাজ—বিদ্ধ করল অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক জীবনের চরম আপ্তবাক্য—দারিদ্র্যকে। আর সেই দুর্বার দারিদ্র্যের তাড়নায় হাভাতে উপবাসী শিব প্রত্যক্ষ করেছেন আসন্ন মন্বন্তরের ভয়াবহ আতঙ্কের ছবি। গৃহিণী পার্বতীর 'অন্নপূর্ণা' রূপধারণ তাঁর কাছে সব সৌন্দর্য হারিয়ে প্রতারণার মরীচিকায় পর্যবসিত হয়েছে। অন্নপূর্ণা সংহরণ করে নিয়েছেন সমস্ত অন্ন। তার ফলে কোথাও অন্ন নেই। দ্বারে দ্বারে ফিরছেন ভিক্ষাবঞ্চিত মহাদেব। এমনকি লক্ষ্মীও লক্ষ্মীছাড়া। ব্যর্থ. ক্ষুধার্ত শিবের মর্মান্তিক আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত করে এ-মর্ত্যের আকাশ বাতাস—

হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই॥

লক্ষ্মী পথ দেখালেন অসহায় শিবকে। বললেন :

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা॥

আমার যুকতি ধর কৈলাস গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে
এই আমি যাই সেইখানে।।
এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিল গিয়া
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার সাজ শিবের হইল লাজ
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া।।
দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে বিসর্জন দিয়া ক্রোধে
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া।।

ভারতচন্দ্রের এই স্বপ্নের ভুবনে 'অন্নে'র অভাব নেই। সুখেব উপচাব স্তরে-স্তবে সজ্জিত, 'দীপের ও মনের আলোকে উদ্ভাসিত কক্ষ ও সেই কক্ষে জীবনাস্বাদের সুখসহচরী— হায় সেই সৌন্দর্যনিকেতনে সুড়ঙ্গপথ ছাড়া প্রবেশপথ নেই। সুড়ঙ্গ কেটে ভারতচন্দ্র সমাজবিরোধী—যারা তাঁকে সে পথ কাটতে বাধ্য করেছিল, তারা কি সমাজপ্রেমিক?..." (শঙ্করীপ্রসাদ *কবি ভারতচন্দ্র* প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৭ পৃ. ১১) অমৃতপায়ী কৈলাসে এ 'মর্ত্যদুর্গতি'র ছবি তবু দেখালেন ভারতচন্দ্র। বাংলার পিরামিড শোষণযন্ত্রের নির্মম প্রতিচ্ছবিকে স্পষ্ট করতে দেবতার মানবীকরণও করলেন। আর দেখালেন তিনভুবন থেকে স্বয়ং অন্নপূর্ণার অন্ন নিষ্কাশনের ছায়াছবি। তিন ভুবনসহ স্বয়ং দেবাদিদেব যে শোষণের কারণে 'অন্নহীন'। এই দেবীকেই তাই একমাত্র আরাধ্যা করলেন কবি। কারণ ইনি প্রগতিশীল। উৎপীড়ন করে পূজা আদায় করেন না। বরং সুখভোগকে বাধাহীন করার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতাচোয়ানো ভক্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন। এমনই সন্তুষ্টির স্পর্শ কি আঠারো শতকের মানুষ পায়নি নবাবমহলে কিংবা রাজপ্রাসাদের বহিরঙ্গে অন্তরঙ্গে, সেখানে পরমাশ্রয় রাজন্যের জমিরাজস্বের মতোই ভক্তি-রাজস্বটুকু আদায় করেন তাঁদের টিকে থাকার প্রয়োজনে, ছলে বলে কৌশলে।

ধর্মভাবনা :

ভারতচন্দ্রের সমাজদৃষ্টিই পূর্ণায়ত হয়েছে তাঁর ধর্মভাবনায়। ধর্মবিষয়ে কবির মন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দুই প্রান্তে দুলেছে। স্থির প্রত্যয়ে সে ধর্মজিজ্ঞাসার সমাধান হয়নি। হয়নি যে তার প্রমাণ যৌবনে কবির সন্ন্যাসগ্রহণ ও সন্ন্যাসত্যাগ। তিনি 'ভঙ্গব্রত মানুষ'। অ-সংসাব বৈরাগ্যে তিনি আস্থাহীন। ধর্মক্ষেত্রে উদ্যত জিজ্ঞাসার চাপান-উতোরে তাঁর অনমনীয় সিদ্ধান্ত— জীবনে ধর্ম আছে, কিন্তু ভোগজীবন বা সংসারজীবনকে বঞ্চিত করে নয়। কারণ, বাসনা পারবশ্যকে অতিক্রম করে জীবন কখনও স্বচ্ছন্দ হতে পাবে না। দেবী অন্নদার প্রশ্নের উত্তরে কামমদমত্ত নলকুবর তাই স্পষ্ট জানিয়েছে—

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা।।
এ সুখযামিনী এ নবকামিনী
এ আমি নবযুবক।।

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥

দেবীর সঙ্গে নলকুবরের রসিকতা ভারতচন্দ্রের বিশিষ্ট কবিস্বভাব এবং যুগপরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে। দেবীকে অস্বীকার এবং নলকুবরের ভোগবাসনাপূর্ণ নৈশবিহার দেখে মনে হয় আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যপূর্ণ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে সেক্যুলার মনোভাবের খোলা রাস্তায় নামছে মানুষ। ঠাকুরের মানুষালি নিয়ে তামাসা করার আয়োজনে ত্রুটির অভাব থাকছে না এতটুকু। কবি রামেশ্বরের শিবায়নে কৃষক শিবের দৈবীখোলস প্রথম অনাবৃত হতে শুরু করেছিল ঠিকই, তবু সম্ভ্রমের আড়াল একটা ছিলই। কিন্তু যুগ যত এগিয়েছে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের প্রকোপে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ততই দেবতাকে ব্রাত্য করে দিয়েছে। এই পরিবর্তিত যুগ-পরিস্থিতিতেই ভারতচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন অন্তঃসারশূন্য একদল অতি-মানুষ চরিত্র। শিব-পার্বতীর মতো অতি-মানুষ। সমাজচিত্র বর্ণনার অবকাশে কবি তাঁদের ঘরগৃহস্থালির ছাপোষা দৈনন্দিনতায় বিলোপ ঘটিয়েছেন স্বর্গীয়দম্ভ আর লালিত্যকে। ভূতপ্রেত সহযোগে শিবের বিবাহযাত্রায়, বিবাহসভায় দিগম্বর জামাই দেখে ভাবী শাশুড়ীসহ পড়শিদের খেদোক্তিতে, ভিক্ষারত শিবকে ঘিরে গ্রাম্য বালকদের দৌরাত্ম্যে, সর্বোপরি গৌরীর দাম্পত্য কলহে উন্মুক্ত হয়ে গেছে ধর্মের ভড়ং আর ভণ্ডামি। সর্বহারা যুগের তাগিদে ধর্মের জাঁক ঘুচিয়ে অভ্যন্তরের কঙ্কালটাকে তিনি ছুঁয়ে দেখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যে।

এই সূত্রেই এসেছে ব্যাসদেবের কাহিনী। মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রজ্ঞাঘন মূর্তিকে তছনছ করে দিয়ে ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষ করালেন অষ্টাদশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক রুচিবিকারগ্রস্ততাকে। পৌরাণিক যুগের স্থিতধী মুনিশ্রেষ্ঠ সমন্বয় বুদ্ধিকে অনায়াসে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে হরিহরে প্রভেদ ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয়, স্বার্থক্লিষ্ট যুগের প্রভাবে ব্যাসদেব নিজের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হওয়ামাত্রই ইষ্ট দেব-দেবীকে লাঞ্ছিত করতেও এতটুকু দ্বিধা করলেন না। ব্যাসকাশী নির্মাণের তাগিদে একদা যে গঙ্গাকে তিনি আপ্লুতকণ্ঠে আরাধনা করেছিলেন—

তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর॥

তাঁরই অপযশে মুখর হয়ে উঠলেন তাঁর দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ার কারণে :

বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতিকুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবা দেই ক্ষীর পান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও॥

এই ধর্মীয় অস্থিরতার রেশ ছড়িয়ে গেল পরবর্তী সাহিত্য-প্রজন্মের মধ্যেও।

ভারতচন্দ্রের ধর্মভাবনার একটি লক্ষণ যদি হয় সংশয় ও অবিশ্বাস তাহলে অপর লক্ষণ হল সমন্বয়ভাবনা। এই সমন্বয়ভাবনাও আসলে যুগসন্ধির প্রভাবজাত। সন্ধিলগ্নের মিলনমুহূর্তে দাঁড়িয়ে কবি সমন্বয়ের প্রশান্ত ঔদার্যকে স্বীকার করে নিতে পেরেছেন। ফলে প্রথম খণ্ডে ব্যাস প্রসঙ্গে একদিকে যেমন তিনি শৈব-বৈষ্ণবের অন্তর্কলহের দিকটি তুলে

ধরেছেন তেমনি সেই প্রভেদের মাঝে স্বয়ং কবি উচ্চারণ করেছেন—'অভেদ হইল ভেদ এ বড় দুর্বোধ।' গানে বলেছেন :

হরি হরে করে ভেদ নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ॥
অভেদ ভাবে যেই পরম জ্ঞানী সেই
তারে না লাগে পাপক্লেদ॥
যে দেহে হরি হরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাই তাপ স্বেদ॥
একই কলেবর হইলা হরি হর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ॥
যে জানে দুইরূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ॥

ব্যাসের উদ্দেশে শিব ও বিষ্ণুর দৈববাণীও এই মূলতত্ত্বেরই পুনরুচ্চারণ। আর এই ব্যাসকাহিনীর উপসংহারে এসেছে শক্তিতত্ত্বের কথা। শক্তি বিনা যে সৃষ্টি নেই, গুণময় ঈশ্বর যে গুণময়ী শক্তির অধীন *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের এই বিশ্বাস থেকেই তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—মাতৃকাশক্তির তিন বিকাশরূপ উল্লিখিত হয়েছে। মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ব্যাসকে দেবী অন্নদা দৈববাণীর মাধ্যমে এই অভেদত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর॥

ভারতচন্দ্র বুদ্ধিমার্গের শিল্পী—সাধনমার্গের নন। তাই তাঁর ধর্মভাবনা সমকালীন ইতিহাসের সঙ্গে যতটা যুক্ত—আধ্যাত্মিক ভাবময়তাব সঙ্গে ততটা নয়। যুগসন্ধিক্ষণের দোলাচলমুহূর্তে দাঁড়িয়ে তিনি মুসলমান রাজত্বের অবসান সূচিত হতে দেখেছিলেন। মুসলমান অত্যাচারের বর্ণনায় চোখের জল ঝরেনি কবির, মনের আগুন জ্বলেছে। আর তখনই স্বপ্ন দেখছেন কবি—হয়তো হিন্দুরাজত্বের স্বপ্ন। কৃষ্ণচন্দ্রকে ধরণীশ্বর সম্বোধনে এ জাতীয় সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে মনে করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসুও। আর সেই স্বপ্নসিদ্ধির পক্ষে সব থেকে প্রয়োজন জাতীয়শক্তির কলহহীন সম্মিলিত প্রকাশ। সেই কারণেই হয়তো ধর্মসংঘাতের বিকৃত-চিত্র তুলে ধরে কবি সমন্বয়ের প্রশান্ত স্থৈর্যে আর সহিষ্ণুতায় স্থির হবার পরামর্শ দিলেন॥

রাজসভা সাহিত্যের ঐতিহ্য : রাজসভাকাব্য হিসেবে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

"মহানবমীর রাত্রিতে বিশাল নাটমন্দিরে বিখ্যাত গায়ক নীলমণি কণ্ঠাভরণ 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর পালা গাইছিলেন।

"মন্দিরা বাজছে, করতাল বাজছে, মৃদঙ্গ বাজছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চারিদিক ঝকমক করছে দিনের আলোর মতো ; সামনে ডাকের সাজ আর শল্‌মা-চুম্‌কিতে অপূর্ব সুন্দর বিরাট প্রতিমা যেন দেবলোকের দ্যুতিতে ঝলমল। চামর-ছত্র নিয়ে সুধাকণ্ঠে কণ্ঠাভরণ গাইছেন মশানে শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তুতি—এই অন্তিমকালে সর্বসঙ্কটকারিণী দেবী চণ্ডিকার কাছে বরাভয় প্রার্থনা করছেন তিনি। ..." (*অমাবস্যার গান* নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) মোহাচ্ছন্ন নিবিষ্ট ভক্তকুল। নিবিড় বিনম্র পরিবেশ। কবি ভারতচন্দ্র রাজ-সমভিব্যহারে প্রথম সারির শ্রোতার আসনে সমাসীন। তিনিও আপ্লুত। সহসা মোহভঙ্গ হল কৃষ্ণচন্দ্রের বিরূপ অভিভাষণে : "নাঃ, নিতান্তই পান্‌সে। এই চৌতিশায় মন ভরে? ...এ-সব পুরোনো চণ্ডীকাব্য আর নয়—মা-কে নিয়ে নতুন মঙ্গলকাব্য লিখে ফেলো একখানা।" [তদেব]

নির্দেশ দিলেন মহারাজ। আর সেই সঙ্গে নিরূপণ করলেন 'নূতনমঙ্গল' কাব্যরচনার ভার যাঁর উপর ন্যস্ত হতে চলেছে তাঁর গুণাগুণ— "তুমি রসিক, তুমি পণ্ডিত, অলঙ্কারশাস্ত্র তোমার মুঠোয়, তার ওপর স্বভাবকবি। মুকুন্দরাম কোথায় দাঁড়াবে তোমার কাছে?" (তদেব) শিরোধার্য হল রাজাজ্ঞা। পাণ্ডিত্য, রসবোধ স্বভাবকবিত্বের সম্মিলনে সৃষ্টি হল *অন্নদামঙ্গল*। দেবী অন্নপূর্ণার অফুরান কৃপাকাহিনীর নির্মোকে রাজ-উমেদারির সাড়ম্বর ঘোষণা।

ভারতচন্দ্র কেন রাজসভার কবি—*অন্নদামঙ্গল* কেন রাজসভার কাব্য—এ-সব প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের আগে রাজসভার সাহিত্য বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং সে-কাব্যের রচয়িতার ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করে নিতে পারি। প্রসঙ্গত এ-কথাও আমরা মনে রাখব যে, মধ্যযুগীয় সাহিত্য, বিশেষত বাংলা দেশে, রাজসভার বৃত্তেই বিকাশ লাভ করেছিল। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

রাজসভার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ড. শুনকিং বলেছেন, "...the history of literature is in large part the history of beneficence of individual princes and aristocrats...In the Middle Ages much of the principal art kept entirely within the general outlook of the bread-giver...The world is seen through the spectacles of the feudal lord..." শুনকিং-এর এই পর্যবেক্ষণ অনুসারে আমরা বলতে পারি 'ফিউডাল লর্ড' বা সামন্ত প্রভুদের পৃষ্ঠপোষিত যে সাহিত্য তা-ই রাজসভার সাহিত্য। যে-সাহিত্যে স্বভাবতই কবিদের নিজস্ব রুচি-সংস্কার-ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিশেষ সুযোগ থাকত না—কবির পৃষ্ঠপোষকের রুচিই অনিবার্যভাবে কবির রচনায় প্রকাশ পেত।

বাংলাদেশে সাহিত্য ও সাহিত্যিককে পৃষ্ঠপোষক যুগের বৃত্তে আমরা প্রথম দেখলাম পাল যুগে। পাল বংশের প্রখ্যাত রাজা রামপালের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করে যে দ্ব্যর্থক দুরূহ কাব্য সন্ধ্যাকর নন্দী রচনা করলেন তাকেই বাংলাদেশে পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামীর কাব্য

সেই পথেই গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক। এভাবেই বাংলাদেশে পৃষ্ঠপোষিত-সাহিত্যের বিকাশ শুরু হল। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দের কাব্যও রচিত হল এক ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায়। বাংলাদেশে কুচবিহারের রাজসভায় সাহিত্যচর্চায় প্রকাশ পেল দেবতারূপী পৃষ্ঠপোষকের মাহাত্ম্যকীর্তন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে শোনা গেল রাজমাহাত্ম্য কীর্তন—রচিত হল *অন্নদামঙ্গল* কাব্য—যে-কাব্যে অন্নদাস্তুতির চেয়ে রাজস্তুতি অনেক সময়েই প্রাধান্য পেয়েছে যুগপ্রেক্ষিতে যা হয়তো অনিবার্যই ছিল। আমরা আলোচনার সূচনায় *অমাবস্যার গান*-এ কৃষ্ণচন্দ্রের সংলাপের উল্লেখ করেছি—যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন 'মা-কে নিয়ে নতুন মঙ্গলকাব্য লিখে ফেলো একখানা' সংলাপটি একেবারেই কাল্পনিক—কিন্তু প্রেক্ষিতটি বাস্তব। রাজসভার কবিরা এ-ভাবেই নির্দেশ পেতেন রাজার (ভূস্বামীর) রুচি অনুযায়ী কাব্য লেখার। স্বাধীন কবি-ব্যক্তিত্বের বিকাশ রাজসভা-পোষিত সাহিত্যধারায় তাই সম্ভব ছিল না। রাজ-আনুগত্যই যেখানে টিকে থাকার উপায় সেখানে কবিব্যক্তিত্বের বাধাহীন বিকাশ অসম্ভব।

সাহিত্যে জীবনকে সবসময়ই কোনো-না-কোনো ফ্রেমের মধ্যে ফেলে দেখা হয়। ফ্রেমটা সেই দেখাকে অর্থবহ করে, পলাতক সময়কে ধরে রাখে ছবিতে-ছবিতে। ফ্রেমের এই চতুষ্কৌণিক ছক *অন্নদামঙ্গল*-কে চিহ্নিত করল 'রাজসভাকাব্য'-রূপে। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের অন্তিমলগ্নে, মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক বর্ণহীন একঘেঁয়েমির মধ্যে ভারতচন্দ্রের এই ব্যতিক্রমী লেখনপ্রয়াস রাজসভার উচ্ছ্বসিত প্রেরণা আর সমর্থনে অভিনন্দিত হল 'নূতনমঙ্গল' হিসেবে।

তবু কবিমাত্রই স্ব-দেশের, স্বদেশবাসীর। সাধারণ জীবনযাত্রার স্পর্শ বাঁচিয়ে কোনো মহৎ কাব্যই রচিত হতে পারে না। কবি শেষ পর্যন্ত মানুষের—এতেই তাঁর শিল্পীচৈতন্যের তৃপ্তি। অন্তত ভারতচন্দ্রের মতো শিল্পীর তো বটেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।" কারণ, "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে।" রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য মেনে বলতে হয় কবিকে বিশেষীকরণ করা সহজ নয়, সঠিকও নয়।

তবুও কবিকুল চিহ্নিত হন কখনো রাজসভা কখনো বা জনসভার সম্পদ হিসেবে। সেই অর্থে ভারতচন্দ্র রাজসভার সম্পদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর জনজীবনের স্পন্দনকে প্রতিফলিত করা সত্ত্বেও তিনি একান্তই কৃষ্ণনাগরিক মহারাজার রুচিবিনোদক সভাকবি। কারণ, এ-কাব্যের পরিকল্পনায় ও রূপায়ণে রাজসভার সর্বাধিক প্রভাব। —"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" অর্থাৎ প্রসাধননৈপুণ্যে সমুজ্জ্বল এ-কাব্যের রাজসিকতা। কিন্তু শুধুই কি অলংকরণ! বিষয়বস্তু থেকে বহির্কাঠামো—অন্তরঙ্গ রসবোধ থেকে বহিরাঙ্গিক রুচি—সবকিছুতেই সভাকাব্যের অনিবার্য প্রকাশ।

এ-কাব্যের মূল বিষয় কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমাকীর্তন এবং পূর্বপুরুষ ভবানন্দের রাজ্যলাভ প্রসঙ্গে রাজবংশের মহিমাখ্যাপন। *অন্নদামঙ্গল*-এর তিনটি খণ্ডই বস্তুত ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গসূত্রে বিধৃত। প্রথমখণ্ডে দেবীকৃপায় ভবানন্দের লক্ষ্মীলাভ। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহের দলে ভবানন্দের যোগদান। তৃতীয় খণ্ডে

দেবীকৃপায় ও মানসিংহের সহায়তায় দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে ভবানন্দের রাজ্যলাভ ও পারিবারিক জীবনবৃত্তান্ত কথন। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সভাকাব্যের নিয়ম মেনে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যরচনার মূল উদ্দেশ্য, রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মহিমাকথন সাধিত হয়েছে।

সভাকাব্যের নিয়মানুযায়ী ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষক মহারাজার প্রশস্তিকাব্য রচনা করতে বসলেন। আর সেই প্রশস্তি রচনায় উঠে এল সমকাল। অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি। বর্গির আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার অবক্ষয়িত সমাজ-অর্থনীতি ধরা পড়ল কৃষ্ণচন্দ্রীয় রাজসভার দুরবস্থার মানচিত্রে। নবাবের দরবারে যথোপযুক্ত নজরানা দিতে না পারার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারাকক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণার পূজা করলে দেবী রাজাকে নির্দেশ দিলেন কবি ভারতচন্দ্রকে দিয়ে দেবী-প্রশস্তিমূলক *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করাতে।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মুরতী ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥

দেবী আরও জানালেন :

সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমরা গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষ॥

আমরা জানলাম রায়গুণাকর উপাধিও দেব-নির্দেশে কবি লাভ করেছিলেন। রাজস্বপ্ন কতদূর সত্য তা জানবার উপায় নেই, তবে কবির কৌশলটুকু অনুভব করা যায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মঙ্গকাব্যগুলি দেব বা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বপ্নাদেশে রচিত। ভারতচন্দ্রও স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশে *অন্নদামঙ্গল* রচনা করেছেন—কিন্তু এখানে দেবী প্রত্যক্ষভাবে স্বপ্নে উপস্থিত হননি, ভারতচন্দ্রের মায়ের বেশ ধরে তিনি কবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী মঙ্গ লকাব্যের প্রত্যক্ষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্যরচনার তুলনায় ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনাটির গ্রহণযোগ্যতা অধিক এবং মনস্তত্ত্বসম্মতও। রাজস্বপ্নের সঙ্গে মিশে থাকা কবির আত্মচেতনার রঙিন স্মৃতিবিন্দুর স্বগতকথনে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যরচনায় সমকাল-বিবৃতির চমৎকার উপলক্ষ প্রস্তুত হয়ে যায়।

উপলক্ষ বর্গি-হাঙ্গামা। প্রত্যক্ষ ইতিহাসের ধারাপাতে নির্ঝরিণীর মতো তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। কিন্তু সেই বর্ণনার আড়ালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বইতে লাগল অন্য এক অকথিত ইতিবৃত্ত। এও ইতিহাস তবে কিছু পূর্ববর্তী। মনের মধ্যেকার দীর্ঘসঞ্চিত ক্ষোভ রাজকাব্য রচনার ছলে নতুন বেশে আত্মপ্রকাশ করল :

রাজবল্লভের কার্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।

ইঙ্গিতে ছুঁয়ে গেলেন কবি বেদনামথিত এক স্মৃতিগাথা। ইতিহাস জানাচ্ছে, আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান বর্ধমান জেলার ভুরসুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় এক ব্রাহ্মণ

রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতার নাম কৃষ্ণ রায়। ইনি ফুলিযার মুখটি বংশজাত। রাজা কৃষ্ণ রায়ের মূলবংশে রাজা প্রতাপনারায়ণের জন্ম হয়েছিল। ইনি চাবিত্রিক মহত্ত্বে প্রভৃত সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভুরসুট পরগনায় তিনটি প্রধান গড়। এদের মধ্যে প্রাচীনতম—ভবানীপুব গড়। রাজবংশের প্রধান শাখার অর্থাৎ প্রতাপনারায়ণের বসবাস ছিল এখানেই। দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রাম। রাজা কৃষ্ণরায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্ররায় এবং তারপর তাঁর অধস্তন চতুর্থ-পুরুষ নরেন্দ্রনারায়ণ রায় পর্যন্ত বংশধরগণ এই গড়ের অধিকারী ছিলেন। ভারতচন্দ্রেব জন্ম হয়েছিল এই শাখাতেই। ভুরসুট রাজ্যের তৃতীয় গড় দোগাছিয়ায় অবস্থিত। কৃষ্ণচন্দ্রেব তৃতীয় পুত্র মুকুটরায় এখানকার দু'আনা জমিদারির মালিক ছিলেন।

জনশ্রুতি আছে প্রতাপনারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে বর্ধমানেব কীর্তিচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার তিনি সৈন্য প্রেরণও কবেছিলেন। কিন্তু গড়-ভবানীপুর হস্তগত হয়নি। লক্ষ্মীনারায়ণের অমিত বিক্রম বাবংবার কীর্তিচন্দ্রকে প্রতিহত করেছে। সেই থেকে ভুরসুট রাজ্যগ্রাসের সুযোগ খুঁজছিলেন কীর্তিচন্দ্র। সুযোগ মিলল ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য রাজবল্লভের কৃতঘ্নতায। জ্ঞাতিশক্রতার বশবর্তী হয়ে ইনি কীর্তিচন্দ্রের সহায়ক হয়েছিলেন। তারই ফলে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানবাজ কীর্তিচন্দ্র ভুরসুট আক্রমণ করে ভবানীপুর গড় অধিকার করলেন। ভুরসুট সীমানাভুক্ত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োও কীর্তিচন্দ্রের অধিকারভুক্ত হল। হৃতসর্বস্ব হলেন জমিদার নবেন্দ্র রায় আর ভারতচন্দ্রের জীবন বাঁক নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। (যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় খণ্ড) নরেন্দ্র রায়ের পুত্রের জীবনে ঘনীভূত দুর্যোগ কীর্তিচন্দ্রের প্রতি আজীবন সঞ্চিত রোষে পর্যবসান লাভ করল। আর সেই বেদনাঘন স্মৃতির তাগিদেই কবিব কাব্য-অভিপ্রায় তির্যক কৌশলী হয়ে সভাকাব্যের বন্দিত নৈপুণ্যে বিদ্ধ করল সচেতন বর্ধমানবাসী-কে। বিদ্ধ করল *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সর্বাধিক আকর্ষণীয়, জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত গর্ভকাব্য 'বিদ্যাসুন্দর'কে কেন্দ্র করে। 'বিদ্যাসুন্দর' আসলে অভিপ্রায়মূলক অংশ। একাধারে রাজাভিপ্রায় এবং কবি-বাসনাকে সিদ্ধ করেছে এই খণ্ড। রাজার ক্ষেত্রে যা ছিল শৃঙ্গার-সাধন বিদ্যা-সুন্দরের কামকলা আস্বাদনে রাজরুচির বিনোদন, কবির ক্ষেত্রে তাই হয়ে উঠল রাজ-উমেদারির প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতার মোড়কে পুরোনো ক্ষতের ওপব প্রলেপ।

রাজসভাকবির শর্ত মেনে ভারতচন্দ্র নিরঙ্কুশ ভোগবাদী। এই ভোগবাদ তাঁব বহুব্যাপ্ত জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস। প্রথম জীবনে বর্ধমান রাজসভার সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্কে, মধ্যপর্বে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বিদগ্ধ সাহচর্যে এবং পরবর্তীকালে বিলাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকবি মনোনীত হয়ে ভারতচন্দ্রের মধ্যে বিশিষ্ট এক জীবনবোধ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিল। কবির সাময়িক সন্ন্যাসব্রতের বিপরীতে এই আজীবন সঞ্চিত জীবনবোধের অবস্থান। জীবনের সুস্থ আনন্দ ও যৌবনের স্বাভাবিক ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রতি কবির পক্ষপাত এর মূলে। একই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাচারের পাশাপাশি যে মোগলাই ভোগবিলাস সমান্তরালভাবে চলছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে পুরাণপাণ্ডিত্যের সঙ্গে সম্ভোগচর্চার মিশ্ররূপটি তারই প্রতিনিধিলক্ষণ হয়ে ফুটে উঠেছে। জীবন ও যৌবনরহস্যের মর্মভেদ কবির কাম্য। শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও নীরস শাস্ত্রচারণা তাঁর কাছে মূল্যহীন। জপ-তপ-জ্ঞান সবকিছুই যৌবনের ভোগ ও ঐশ্বর্যের অভিমুখী :

যৌবন মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥

তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু।
সকলি যৌবন ধনের পিছু॥

এই ভোগবাদী জীবনদর্শন বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে আলোচ্য কাব্যের তিন খণ্ডে। এদের মধ্যে প্রথম খণ্ডের বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দিষ্ট।

(ক) আগেই বলা হয়েছে, ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও অন্নদার মঙ্গলকীর্তন তাঁর একমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষ ভবানন্দের মহিমাকীর্তন এবং তাঁদের কৃতিত্ব ও সাফল্যের সাড়ম্বর বর্ণনাই আলোচ্য কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। দেবী অন্নদার মহিমাকীর্তন এ-কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য। আসলে সংশয়কবলিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ যুগজীবনের প্রভাব কবির ওপরেও পড়েছিল। ধর্মের ভণ্ডামি উপলব্ধি করে তিনি প্রচলিত ধর্মসংস্কারে ক্রমশ আস্থাহীন হয়ে পড়ছিলেন। ইহসচেতন ভোগবাদী কবির কলমে তাই দেবতা নয়, কীর্তিত হলেন মানুষ ·

চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাসবৃদ্ধি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

(খ) সভাকবিমাত্রই বিদগ্ধ পণ্ডিত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য তাঁর কাব্যের পক্ষে ভার না হয়ে ধার হয়ে উঠেছে। গ্রন্থশেষে অন্নদামুখে ভারতচন্দ্র দেবীকৃপায় তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যলাভের বিবরণ দিয়েছেন :

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশি॥

তবে স্মরণ রাখা দরকার ভারতচন্দ্র অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে তাঁর কাব্যকে দুর্বোধ্য করেন নি—বরং তাকে রসাল রেখেই তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্যের দীপ্তিতে কাব্যকে প্রভাময় করে তুলেছেন। বিবিধ পুরাণজ্ঞানের সাক্ষ্য এ-কাব্যের পাতায় পাতায়। হরগৌরী উপাখ্যান এবং ব্যাসকাহিনী বর্ণনায় কবি *মহাভারত*, *স্কন্দপুরাণ* (কাশীখণ্ড), *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*, *ভাগবতপুরাণ* ইত্যাদি থেকে বহুবিচিত্র পুরাণ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া স্থানে স্থানে *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*-র শ্লোক এবং কালিদাসের *কুমারসম্ভব*-এর শ্লোকসাদৃশ্য পাওয়া যায়।

(গ) ভারতচন্দ্রের কাব্যের বাণীশিল্প রাজসভার কাব্যের উপযোগী নাগরিক প্রসাধনকলার নৈপুণ্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। একদিকে তাঁর মার্জিত বাচনভঙ্গী এবং আলঙ্কারিক শিল্পনৈপুণ্য, অপরদিকে বক্রকটাক্ষরীতি এবং চটুল হাস্য-পরিহাস তাঁর কাব্যকে যথার্থই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার উপযোগী করে তুলেছে। বিশেষত ভাগীরথীকেন্দ্রিক বাংলা বুলি বা কৃষ্ণনাগরিক কথ্যভাষাভঙ্গিকে মার্জিত করে কবি তাকে এমনই অর্থসংহতভাবে প্রয়োগ করেছেন যে তা অনায়াসে কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এ-কাব্যের প্রায় প্রতি ছত্রে বিচিত্র প্রবাদ-প্রবচনের অজস্র মণিমুক্তা ঐশ্বর্যরূপে ছড়িয়ে রয়েছে। বাক্যবিন্যাসচাতুর্য ও তির্যক জীবনদৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতচন্দ্রের অধিকাংশ নাগরিক প্রবাদের উদ্ভব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতা, লোকচরিত্রজ্ঞান ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন। এ-সবেরই প্রকাশ ঘটেছে কবি-ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনে :

● নীচ যদি উচ্চভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
● বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডন।

● হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
● বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥
● নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

মূলত অভিজাত সমাজ-আশ্রয়ে ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যটি রচনা করেছেন। এটিও রাজসভাকবির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতচন্দ্র অসামান্য শব্দকুশলী কবি। তাঁর শব্দব্যবহার অত্যন্ত পরিমিত, সতর্ক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরবি, ফার্সি ও হিন্দির পাশাপাশি সংস্কৃত ও দেশী শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাঁর কাব্যের শব্দভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করেছিলেন। কারণ, তাঁর মতে :

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

'যাবনী মিশাল' ভাষার অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে কাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের পুরাণপটভূমিকায় এর ব্যবহার কম। তবুও দু-একটি স্থানে এর সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন 'গ্রন্থসূচনা' অংশে :

মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ॥

'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' এ :

ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কতজন।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥
সেকাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ **শিরপা** কবিলা যার পর॥
ভূপতির তীরের **ওস্তাদ** নিরুপম।
মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণসম॥

ভারতচন্দ্রের 'কাব্যভাষা' সম্পর্কের প্রমথ চৌধুরীর তাই যথার্থ মন্তব্য : রায়গুণাকর 'কথার তাজমহল' নির্মাণ করেছেন।

রাজসভার কবি মূলত ছন্দ-বিলাসী হন। ভারতচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম নন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যজুড়ে ছন্দের বিচিত্র বিস্তার রাজবৈভবকে প্রকাশ করেছে। প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদীর সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের (তোটক, তূর্ণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত) নিপুণ প্রয়োগ কবিকে অনন্যতা দান করেছে। এরই পাশাপাশি অলঙ্কার বিন্যাসেও কবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রমাণিত। শব্দালঙ্কার-অর্থালঙ্কারের ভূয়সী প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ তাঁর কাব্য। শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তির সঙ্গে উপমা, রূপক, অসঙ্গতি, ব্যতিরেক, ব্যাজস্তুতির স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ ভারতচন্দ্রকে নিপুণ অলঙ্কার-শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।

একদা কবিকঙ্কণ তাঁর *অভয়ামঙ্গল* রচনা করেছিলেন গ্রাম্য ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় আর রায়গুণাকরের প্রেরণাস্থল কৃষ্ণনগর এবং কৃষ্ণচন্দ্র। উভয় কবিই জীবনের দুঃখদুর্বিপাকপূর্ণ অতল সমুদ্রে অবগাহন করে জীবনামৃতের স্বাদ পেয়েছিলেন— প্রাণরস-রোমন্থনজাত অমৃত। তবু দুজনের দৃষ্টিপাতের তারতম্যে, জীবনকে দেখার ভিন্নতায় বদলে গেল উভয় কাব্যের মৌল সুর। মুকুন্দকবি করুণা আর কৌতুকের অমৃত সুধায় ভরিয়ে

দিলেন তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য দুঃখান্তিক জগৎ, হলেন জীবনরসিক। আর ভারতচন্দ্র দুঃখজর্জর জীবনচেতনাকে জ্বালাময় ব্যঙ্গবিদ্রূপে মণ্ডিত করে সেই স্মরগরলকে রাজসভার উপযোগী অলঙ্কৃত শৃঙ্গারপাত্রে পরিবেশন করলেন। সুরের এই ভিন্নতার কারণে কবিকঙ্কণের কাব্যে স্বামীহারা রতির আর্তবিলাপ যেখানে শ্রোতাকে অশ্রুসিক্ত করে, ভারতচন্দ্রে তা রঙ্গ-তামাসায় ভরা নিছক অসঙ্গতি অলঙ্কারের শোভা বৃদ্ধি করে।

তবু, মজলিশি কাব্যের রূপকার হলেও তাঁকে জীবনবিমুখ বলা যাবে না। বরং তাঁর কাব্যে জীবন-ঘনিষ্ঠ গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীর অসহনীয় দুঃখচিত্র যখন ঈশ্বরী পাটুনীর সংযত উচ্চারণে ব্যক্ত হয় তখন আর তিনি শুধু রাজসভার ভোগবাদী কবির গণ্ডিতে বাঁধা থাকেন না, তাঁর উম্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে মানবজীবনের চরমতম অভিশাপ দারিদ্র্য এবং মানবদরদী কবি কাব্যমধ্যে সন্ধান করেন তা থেকে মুক্তির উপায়। তাই এ-কাব্যে অন্নহীন শিবকে অন্নদান করেছেন অন্নপূর্ণা, সোনার ঘুঁটে দান করে হরিহোড়কে দেবী মুক্তি দিয়েছেন দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে, দরিদ্র ঈশ্বরী পেয়েছে সচ্ছল সংসারের আশ্বাস আর সর্বোপরি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার দেবীকৃপায় লাভ করেছেন অতুল ঐশ্বর্য। রাজসভাকবির সমূহ শর্তাদি পূরণ করেও আসলে কবি গণজীবনের সেই গভীরতম ব্যাধির প্রতিকারে ব্যাপৃত থেকে প্রমাণ করেছেন তাঁর মানবপ্রেমের ব্যাপকতা। আর এই গুণেই তিনি রাজসভার কবি হয়েও সমকালের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* তাই শুধু রাজসভার কাব্য হিসেবে নয়—যুগ-পরিচায়ক কাব্য হিসেবেই গণ্য হবে।

নূতন মঙ্গল-এর অভিধায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

ইতিহাসবোধে সমৃদ্ধ হয়ে একজন সমাজসংবেদনশীল কবি যখন মঙ্গলকাব্য লেখেন তখন তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই নতুন জীবনবোধের পদধ্বনি শোনার আশা করা যায়। ভারতচন্দ্র এমনটাই চেয়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্যমধ্যে বারংবার ঘোষিত হয়েছে 'নূতন মঙ্গল'-এর বার্তা। শুধু বার্তা নয়, উদ্বেগও। স্রোতের প্রতিমুখে চলার উদ্বেগ। রাজসভাকবির রাজফরমায়েশ আর প্রচলিত সাহিত্যকর্মকে অঙ্গীকার করেও তার অসারত্ব প্রদর্শন অন্যতর এক প্রতিবাদী জীবনভাবনার সাহচর্যে কখনও কখনও উদ্বেগজনক হয়েছে বৈকি।

আসলে সময়টাই এমন। মধ্যযুগের অন্তিমপর্বে তখন সন্ধিক্ষণের উন্মাদনা ও অস্পষ্টতা। তমসা আর ঊষার সেই ক্রমস্ফুট সময়-বলয়ে তখন একই সঙ্গে আবর্তিত হয়ে চলেছে অতীত-ঐতিহ্য আর অনাগত-ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব—বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলতা। এমনই এক যুগসন্ধির প্রতিনিধি কবি তো শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবসাগরে ডুব দিয়ে থাকতে পারেন না। যুগের দাবিতেই তিনি অন্যপথে হাঁটবেন। দায়িত্ব নেবেন নবতম কোনো যুগ-রচনার স্বপ্ন দেখাতে তাঁর পাঠকদের।

স্বপ্ন দেখানো তো সহজ নয়। ঘোরতর অদৃষ্টবাদী একটা জাতি— পুরুষকারকে নিয়তির চেয়ে যে হীনশক্তি মনে করে, মঙ্গলকাব্যের ভক্তিছত্রতলে যে জাতির আত্মবিশ্বাস বিলীয়মান তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখানো সত্যিই কঠিন। সেই কঠিন দায়িত্বকে সম্ভাব্য করে তুলতেই তাই ভারতচন্দ্র বেছে নিলেন সেই পুরোনো ফর্ম মঙ্গলকাব্যের। মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এ-কাব্যের বিষয় ও চরিত্রে, সমাজজীবন চিত্রণে কিংবা আচার-বিশ্বাসের রূপায়ণে খাঁটি বঙ্গীয় সৌরভ। প্রতিবাদী কবি হয়েও বঙ্গীয় ভাব-ভাবনা বা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না তিনি—এ বোধ তাঁর ছিল। আবার এও বলা যায় তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি প্রবহমান জাতি-চরিত্রকে। অনগ্রসর বিজিত হিন্দু, তুর্কি পরাক্রমোত্তর রুদ্ধশ্বাস প্রহর, আর্ত-সঙ্কুল বিপন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ তখন বাঙালি চরিত্রের নিয়ামক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গচেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা দৈব-নির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ আর সংস্কারবোধ বীজকে সমূলে উপড়ে ফেলার প্রতিস্পর্ধিতা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তার সূচনা হল।

এই অনিবার্যতাকে মেনেই ভারতচন্দ্র তাই মঙ্গলকাব্যের বহু প্রচলিত সংস্কারকে অমান্য করেননি। মঙ্গলকাব্যের বিষয় সংস্থাপন এবং নির্মাণশৈলীতে একটা নিজস্ব ছন্দ আছে। বিশেষ রকমের পুরাণ-অভিমুখিনতা আছে। বিশেষ দেবতার পূজা-প্রতিষ্ঠায় স্বপ্নদর্শন থেকে চতুরাঙ্গিক খণ্ড বিভাজন পর্যন্ত সর্বত্র এই পুরাণ-অনুগামিতা। আবার লোক-জীবন-সম্ভূত বিবিধ চেতনাও এর মূলে ক্রিয়াশীল। লোক-ঐতিহ্য মেনে নিয়ে দেবদেবীর বন্দনা থেকে বিষয়বস্তুর বিবিধ বর্ণনা—যেমন নারীদের পতিনিন্দা, সমুদ্রযাত্রা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন লোকসংস্কার, পাকপ্রণালী ইত্যাদিতে প্রবহমান লোকজীবনকেই অনুকরণ করেছে মঙ্গলকাব্য। আর এই সব কিছুর মূলে দৈব আদেশাহত কিংকর্তব্যবিমূঢ় একজন কবির বিশেষ কোনো গোষ্ঠীপোষিত দেবতা বা দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের ঐহিক বাসনা কাজ করেছে।

অন্নদামঙ্গল এই সব শর্ত মেনেই মঙ্গলকাব্য। তবু এর কবি ব্যতিক্রমী। বহিরাঙ্গিক কাহিনীবিন্যাস থেকে অন্তরঙ্গ উপাদান-নির্বাচন—সব ব্যাপারেই মঙ্গলকবিদের ধারায় তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একক। মঙ্গলকাব্যের চতুরাঙ্গিক কাঠামোকে তিনি ভাঙলেন নতুনভাবে। বন্দনা অংশ, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ('গ্রন্থসূচনা') ছাড়াও তাঁর কাব্যটি বিভক্ত হল তিনখণ্ডে—(ক) 'অন্নদামঙ্গল' অর্থাৎ দেবখণ্ড (খ) 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' অর্থাৎ নরখণ্ডকেন্দ্রিক লৌকিক আখ্যান এবং (গ) 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' বা 'মানসিংহ' অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাহিনী। এইভাবে পুরাণ, রোমান্টিক লোকগাথা এবং ইতিহাসের সহায়তায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় আবির্ভূত হয়েও কবি রচনা করলেন 'নূতন মঙ্গল'। কাব্যটির তিনটি অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—পৃথক মর্যাদার অধিকারী। তবুও তিনটির মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্রতায় একটা আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। 'গ্রন্থসূচনা' অংশকেও সেই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় সামিল করা যায় এবং যে বিষয়টি এর থেকে স্পষ্ট হয় তা হল, মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারায় আবির্ভূত হলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবী নন, মুখ্য হল সমকাল, সমকালের মানবজীবন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলতেই তাঁর এহেন কাব্য-পরিকল্পনা।

'গ্রন্থসূচনা' অংশটি নির্ভেজাল সময়ের দলিল। নবাব আলিবর্দি-অধীনস্থ বঙ্গভূমির বর্গি-আক্রান্ত রূপ এবং আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়-চিত্র এর বিষয়। যে বিপর্যয়ের মূলে ছিল একদিকে বহিরাক্রমণ অন্যদিকে দেশীয় অরাজকতার মিশ্র প্রভাব। আর তারই ফলে এ-কাব্যে বর্গি প্রসঙ্গে দৈবী ভূমিকা এসেছে। মোগল সৈন্য উড়িষ্যা প্রদেশে অত্যাচারকালে শিবের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরেও এসে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলে শিবের পরামর্শক্রমে নন্দী গড় সেতারার বর্গি রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন :

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিব দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

এক তীব্র মুসলিমশাসন-বিরুদ্ধতা এবং শাসকশক্তির প্রতি অনাস্থা পংক্তিগুলির সর্বাঙ্গে। সুতরাং অন্যবিধ এক বিচ্ছিন্ন মানসিকতা নিয়েই ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা দৈবাদেশের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভক্তিপ্রবাহে আত্মবিলোপ করে দিতে, যেমন করেছেন বিজয় গুপ্ত প্রমুখেরা :

আমি বটি যন্ত্র মাগো যন্ত্রী বট তুমি।
যা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি॥ [পদ্মাপুরাণ]

এখানে দেবীবন্দনার ব-কলমে এই ব্যক্তিত্বলোপ কোনো অসহায়তা বা অযোগ্যতার নিদর্শন নয়—আত্মবিশ্বাসের এই বিপর্যয় যেখানে তাদের সুভাষিত কবিকর্মেরই অঙ্গীকৃত— সেখানে ভারতচন্দ্রের নির্দ্বিধ উচ্চারণ :

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়

স্পষ্ট জানালেন দৈবী স্বপ্নাদেশে তাঁর কাব্যরচনা নয়। কোনো অশরীরী বা অ-জাগতিক প্রেরণায় তিনি কলম ধরেন নি। পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধে এবং সচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের ইচ্ছায় রচিত হয়েছে তাঁর কাব্য। অবশ্য স্বপ্নপ্রসঙ্গটি মুছে ফেলতে পারেন নি ঐতিহ্য-মান্যতার কারণে। বিপন্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কারাকক্ষে দেবী অন্নদাকে চৌত্রিশ অক্ষরে বন্দনা করলে দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন—অন্নদার মূর্তি নির্মাণ করে পুজো করলে রাজা বিপন্মুক্ত হবেন :

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।

এবং তারপর,

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল সে দায়।

এখানে উল্লেখ্য বিষয় যেটি তা হল মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবির' দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য লিখেছেন। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা গেল দেবী অন্নদা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন ভারতচন্দ্রকে দিয়ে কাব্য লিখিয়ে নিতে এবং বলেছেন ভারতচন্দ্রের মায়ের রূপ ধরে তিনি কবিকে কাব্য লিখতে নির্দেশ দেবেন। অর্থাৎ দেবীর প্রত্যক্ষ স্বপ্নাদেশে নয় মাতার পরিচয়ে দেবীর পরোক্ষ স্বপ্নাদেশে ভারতচন্দ্র কাব্য লিখবেন। মঙ্গলকাব্যের ধারায় এ অবশ্যই নতুন ভাবনা। বিষয়টি মনস্তত্ত্বসম্মতও বটে। কারণ পুত্রর পক্ষে স্বপ্নে মা-কে দেখা দেবীকে দেখার চেয়েও অনেক বাস্তবসম্মত। এতে অবশ্য ভারতচন্দ্রের দায় বেড়েছে আশ্রয়দাতা রাজ-পরিবারের প্রতি। দেবী অন্নদার প্রসাদপুষ্ট আশ্রয়দাতার পরিবার। কবির ছিন্নমূল বিশৃঙ্খল জীবনে প্রতিষ্ঠার মালঞ্চ নির্মাণ করে দিয়েছেন যে রাজা ও তাঁর পরিবার, তাঁরই অনুরোধে রচিত হয়েছে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য। ফলে দেববন্দনা-অংশে দেবী বন্দনার পাশে সাড়ম্বরে স্থান করে নিয়েছেন সেই রাজা কবি-কৃতজ্ঞতার ফলকে সুসজ্জিত হয়ে।

অন্নপূর্ণা মহামায়া দেহ মোরে পদছায়া
কোটি কোটি করি এ প্রণাম।

এই গতে বাঁধা প্রার্থনার সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

.. ..

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

দেবতার পাশে জায়গা করে নিচ্ছে মানুষ তাঁর কাব্যে। আর তারও ওপরে ব্যক্তির অস্মিতা। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক পথে চলা তাই কখনও একঘেয়ে হয়নি তাঁর কাব্যে। অথচ যে পরিস্থিতিতে তাঁর কাব্যচর্চা তাতে পৌনঃপুনিকতাই প্রত্যাশিত ছিল। বিপন্ন দেশ। ক্রান্তিকারী সময়। আবার শুধু সমকালই নয়—ব্যক্তিগত জীবনে একটানা অস্থিরতা আর সঙ্কটও জর্জরিত করেছিল তাঁকে। গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ, কারাবাস, পরান্নভোজন আর নানাবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতাসঙ্কুল সে জীবন-অভিজ্ঞতা। এই জর্জরতার

সম্ভাব্য পরিণাম হতেই পারত জীবন ও জীবন-প্রসূত সাহিত্যে তীব্র এক বিদ্বেষের প্রতিফলন ঘটানো। কিন্তু সেই অনিবার্য সম্ভাবনাকে তিনি অতিক্রম করলেন—সত্যকে ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন 'প্রমোদের প্রভু'। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

> "এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কন্টকিত হয়ে ওঠে। এবং বিলাসীর মন তো একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক, সাংসারিক জীবনের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিবে গিয়েছিল, না আরো জ্বলে উঠেছিল।"

কাব্যপাঠে আমরা দেখি ভারতচন্দ্রের মনের আলো কখনই নিবে যায় নি। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে স্ত্রীদের মুখ দিয়ে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভেতরেই আমরা তাঁর মনের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পা᾽', এরকমই একজন স্ত্রী (কবি সম্ভবত নিজের স্ত্রীকেই এখানে মনে রেখেছেন) পতি নিন্দায় মুখর হয়েছেন :

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
নানা শাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে প্রমোদের প্রভু॥

—এই ব্যাজনিন্দা স্বয়ং ভারতচন্দ্রেরই আত্মকথা। স্ত্রীদের মুখে পতিদের নিন্দা শুনে পাঠক দুটো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়—এক, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি; আর দুই, দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হল ব্যবহারিক জীবনের উপর 'আত্মার প্রভুত্ব'। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যে যা অসম্ভব এবং অগ্রাহ্য। নিঃস্ব ভূপতির সন্তান হয়ে মারীগ্রস্ত সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তদ্গত পাঠে পড়ে নিয়েছিলেন সমকালকে। উপলব্ধি করেছিলেন দুঃখের প্রকৃত স্বরূপটি। আর তাই ভাঙন-ধরা গ্রামীণ বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম আর রাজনীতির অন্তর্নিহিত মৌল অসত্যের বীজটি খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়নি। সেই সূত্র ধরে বর্গিহানা থেকে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়-পর্বে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের সমাসন্ন ঐতিহাসিক নিয়তিকে তিনি স্পষ্ট করেছেন তাঁর কাব্যে। এ নিয়তির মৌল সত্য হল অন্নসমস্যা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই আরাধ্যা হলেন দেবী অন্নদা। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই দেবীর আবির্ভাব এর আগে কখনও ঘটেনি। মন্বন্তর-পীড়িত যুগের চাহিদায় এঁর সৃষ্টি। অন্নের জন্য হাহাকার আর আর্তনাদে বরাভয় দিতে আবির্ভূত হলেন দেবী অন্নপূর্ণা। শিবের 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর তাৎপর্যে এছাড়া অন্য কিছু নেই। তাই এই দেবীর মধ্যে দিয়ে প্রকারান্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন অভাবক্লিষ্ট, নিঃস্ব, নিরন্ন এক জাতির প্রতিভূ 'শিব'। নস্যাৎ হয়ে গেছে তাঁর দেবমাহাত্ম্য। উপহাসের শ্লেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাঁর স্বর্গীয় গাম্ভীর্য। ছিন্নভিন্ন করে তাঁকে বিঁধেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক জীবনের চরম

সত্য দারিদ্র্য-কে। আর সেই দুর্বার দারিদ্রোর তাড়নায় হাভাতে উপবাসী শিব প্রত্যক্ষ করেছেন আসন্ন মন্বন্তরের ভয়াবহ আতঙ্কের ছবি,—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তারই ছবি যেন *অন্নদামঙ্গল*-এ সর্বব্যাপ্ত। অন্নপূর্ণা সংহরণ করে নিয়েছেন সমস্ত অন্ন। তার ফলে 'অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে'।

দেবতা থেকে মানুষ—সবাইকে এক সুতোয় গেঁথেছেন ভারতচন্দ্র। এক সুতোয়, নাকি দেবতার চেয়ে মানুষ উচ্চাসন পেয়েছে তাঁর কাব্যে। বস্ত্রহীনা, অন্নহীনা হয়েও বড়গাছির ব্যক্তিত্বময়ী পদ্মিনী, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করে নির্বিকার জীবনছন্দে অভ্যস্ত হরিহোড় কিংবা লালসাহীন, আর্তিহীন ঈশ্বরীর সংযত চাহিদা অপাঙ্‌ক্তেয় করে দিয়েছে সযত্নলালিত দেবমহিমাকে। ব্যক্তিস্বার্থের চরিতার্থতা নয়, বিষয় নয়, সম্পদ নয়—কেবল সন্তানের জন্য দুবেলা দু'মুঠো অন্ন প্রার্থনা। জীবনে অনেক পাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে এই সীমিত দাবিটুকু মানুষের অহংকে উদ্ভাসিত করল। আসলে এটাই হয়। মহৎ শিল্পীর কাছে সমাজের সত্য, ইতিহাসের সত্য যেমন মূল্যবান মানুষের স্বাধীনতার সত্য—শিল্পীর মুক্তির সত্যও সমান মূল্যবান। এই শিল্পের সত্য রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত চূড়াকে অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে থাকে—ব্যথার সমুদ্র পেরিয়ে স্বর্গীয় মুক্তির অনন্ত আশ্বাসের দিকে প্রসারিত হয়। মঙ্গলকাব্যে ধর্মের আবরণ ঠেলে এ-সত্যের আত্মপ্রকাশ ভারতচন্দ্রের আগে সেভাবে ঘটেনি। মুক্তি সেখানে মনসার পদপ্রান্তে লুটিয়ে থাকা বামহাতের শুকনো ফুলের মতোই অবহেলার সামগ্রী ছিল। ভারতচন্দ্র উদ্‌ভাসিত করলেন মানুষের সেই ইঙ্গিত স্বাধীনতা আর শিল্পের সত্য সম্ভাবনাকে। প্রত্যেক সার্থক শিল্পবস্তুতেই এই দুই সত্য আত্মবিরোধ ডিঙিয়ে সামঞ্জস্যে এসে লীন হয়। ভারতচন্দ্র সেই সমন্বয়ের কবি। 'মঙ্গলকাব্যের প্রথাসর্বস্ব আঙ্গিকচর্চার ঘেরাটোপে বসেও তাই তিনি রচনা করতে পারলেন নূতন মঙ্গল।' যে-কাব্যে ঘোষিত হল মানব মহিমার উচ্চারণ--

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নয় তাহা
আমি যা খেলিতে চাহি
সে খেলা খেলাও হে॥

ঈশ্বরের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে ভারতচন্দ্রের এই প্রতিবাদ মানবিক দৃপ্ততায় অনন্য।

কবি কোথা থেকে পেলেন এই মানসিক জোর, ব্যতিক্রমী এই বোধের প্রেরণা? শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানাচ্ছেন : "ভারতচন্দ্র ভঙ্গব্রত মানুষ। এ ধরনের মানুষ কখনো শ্রদ্ধা পান না যদি না তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন তাঁর ব্রতভঙ্গ আসলে নতুন বোধের তাগিদে। এই নতুন বোধের তাগিদটি এসেছে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর সূক্ষ্মতা থেকে।"—অসাম্যপীড়িত সমাজে শৈল্পিক প্রতিবাদের জন্ম তো এই সূক্ষ্মতা থেকেই সম্ভব হয়। অনাচারগ্রস্ত ধর্মাচার, অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থা, প্রথাসর্বস্ব সাহিত্যকাঠামো এমনকি গতানুগতিক কাব্যভাষার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদী। পুরাণ, আগম, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি তাঁর আত্মগৌরবের কারণ হলেও তাকে তিনি সংযত করতে জানতেন। কাজেই স্পষ্টভাষণে জানালেন 'কাব্যভাষা' কেমন হওয়া উচিত। তাঁর কথায় :

পড়িয়াছি যেই মতো লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

স্বভাবতই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত—'যে হোক সে হৌক ভাষা কব্যরস লয়ে।'

দ্বিধাহীন উচ্চারণে গতানুগতিক কাব্যভাষার অসারতাই প্রমাণিত হচ্ছে। আর সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনার তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ যার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলছেন :

"সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়।—আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয় হচ্ছে তার আত্মসম্বরণে।"

আত্মসম্বরণ কি আত্মচৈতন্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয় অন্তত যে সম্বিতের কথা ভারতচন্দ্র বললেন :

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদাসুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদাদুখী॥

মেনে নেওয়া গেল প্রতিবাদী। কিন্তু প্রশ্ন হল কোথা থেকে তিনি পেলেন প্রতিবাদেব এমন অত্যাধুনিক উপকরণ। তীব্রতার বদলে রমণীয়তা, আঘাতের বদলে কৌতুক, প্রচারের বদলে আত্মসমালোচনার অভিনব শৈলী। একজন বাজসভাকবির পক্ষে কাব্যশৈলীর এই ভঙ্গি আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। মেনে নেওয়া যায় তিনি ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান। কিন্তু আত্মোপলব্ধির জন্য একজন সুপটু পদপ্রদর্শক তো প্রয়োজন যাঁর আলোয় আলোকিত হবে কবির উন্মুখ মনস্বিতা। সেদিক থেকে ভারতচন্দ্রের ওপর ফার্সি ও পাশ্চাত্যসংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখ করা যায়। তাঁর প্রথম যৌবন কেটেছিল ফরাসিদের আবাস চন্দননগরে অর্থাৎ ফরাসডাঙায়। বাল্যকাল থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষটি এসে উপস্থিত হন রোমান্সপ্রবণ ফরাসিদেব সংস্পর্শে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহায়তায়। গ্রহণক্ষম অন্তরে সোৎসাহে ধাবণ কবতে থাকেন ফরাসিবাহিত প্রাতীচীর প্রেম, সৌন্দর্য ও দর্শনের 'কনসেপ্ট'। বদল ঘটে যায় জীবনদর্শনে। তথাকথিত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আধুনিক 'আর্ট'-এর রঙ লাগে। নিঃসন্দেহে আর্টের এই নিপুণ প্রয়োগ সর্বাধিক ঘটেছে *অন্নদামঙ্গল*-এর গর্ভকাব্য-*বিদ্যাসুন্দর*-এ।

আসলে ভারতচন্দ্র নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। মঙ্গলকাব্য ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য তাঁর সাহিত্যভাবনায় চরম পরিণতি লাভ করেছে। এমনকি কবিকঙ্কণের কবিত্বও সেই অজানা অভাবিত রহস্যময়তাকে ছুঁতে পারেনি। সমগ্র মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্য ধীরে ধীরে যে উপাদান সংগ্রহ করেছিল যাকে সে এখানে-ওখানে আংশিক শিল্পরূপ দিয়েও পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি পায়নি, তাই যেন চূড়ান্ত সৌন্দর্যলাভের আশায় ভারতচন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। কিংবা এ যেন জাতির সেই মগ্নচৈতন্য, দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত থাকতে থাকতে এক সময় কোনো যুগসন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে ব্যক্তিবিশেষে সংহত হয়ে 'সেই জাতিরই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্যশক্তিরূপে প্রস্ফুরিত' হয়ে পড়ল। যুগসন্ধির সেই নায়ক ভারতচন্দ্র। কিন্তু শুধু সন্ধিক্ষণেরই নয়। কারণ-যুগ পরিবেশ তো দূরে সরে যায় দ্রুত। ব্যক্তি আর ঘটনাও হারিয়ে যায়। থেকে যায় সৃষ্টির অমরাবতী, মহৎ স্রষ্টার উত্তরাধিকার। পরবর্তী প্রজন্ম সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করে মিলিয়ে দেয় নবীন যুগের বহতা স্রোতে। পরবর্তীকালের

বাংলা সাহিত্য তাই দৈবী ঐতিহ্যের ধাবাকে অস্বীকার করে স্বীকার করে নিল *অন্নদামঙ্গল*-এর মানবচেতনাকে। সন্ধিক্ষণের বিশেষ সময়পর্বের হয়েও কবি ভারতচন্দ্র তাই হয়ে গেলেন চিরন্তন। তিনি তিমির বিলাসী নন। বরং তিমিরাচ্ছন্ন প্রতিবেশে বসে তাঁর তিমিব হননের সাধনা। মানুষের মুক্তি চান তিনি, সে মুক্তি শুধু তামসিক দেশকালের হাত থেকে নয়, মানুষের অজ্ঞাত-অন্ধকারতম অবচেতনেব কর্তৃত্ব থেকেও। এর নাম শিল্পেব মুক্তি। এই মুক্তির স্বপ্নই শিল্পে সঞ্চারিত করে দিলেন ভারতচন্দ্র। আর তাতেই বাঞ্ছাফলসুখ লাভ করার আনন্দে গর্বিত হল বাঙালির পূর্বপুরুষ, ঈশ্বরী পাটুনি। সন্তানকে দুধে-ভাতে রাখার প্রাগৈতিহাসিক কামনা আধুনিক পাঠকের বিশ্লেষণী চেতনার আলোয় শাশ্বত রূপ পেল। আজকের পাঠক বুঝল যে এ-দুধভাতের চাহিদা আসলে নিছক পেট ভরাবার দায় থেকে আসেনি। এসেছে উত্তরাধিকার আর পরম্পরাসৃজনের তাগিদে। যে পরম্পরা 'প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে' 'শোচনীয় কালের বিপাকে' নিজেদের সান্দ্র বিশ্বাসকে হারিয়েও সুচেতনার বোধে পূর্ণ হয়ে স্বীকৃতি জানাচ্ছে যুগসন্ধিক্ষণের এই অগ্রজ শিল্পীকে।

অন্নদামঙ্গল : চরিত্র ভাবনা

মঙ্গলকাব্যের চরিত্রভাবনা ও ভারতচন্দ্র

মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেবতা-নির্ভর হওয়ায় চরিত্রগুলি সেভাবে 'ইনডিভিডুয়াল' হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে মধ্যযুগের পরিবেশে এটা হওয়াও সম্ভব ছিল না। যেখানে দেবতার দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে দেবতারাই পুজো পাবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষকে এক অনিকেত জীবনের দিকে ঠেলে দেন, চরিত্র তখন আর তার সমগ্র সত্তা নিয়ে বিকশিত হতে পারে না। তবুও এরই মধ্যে আমাদের মনে পড়ে যাবে চাঁদসদাগরের কথা—যিনি একক হয়ে আছেন দৈবীশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে। আরও মনে পড়বে ফুল্লরার কথা—দরিদ্র গৃবধূর ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের নানা কৌণিক মাত্রা যে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। আর অবশ্যই মনে পড়বে মুরারি শীল বা ভাঁড়ু দত্তের কথা—মুকুন্দ যাদের অমর করে রেখেছেন—আজকের চলমান জীবনে যাদের সাক্ষাৎ আমরা মাঝে মাঝেই পেয়ে যাই। এ তো গেল মানুষের কথা। দেবতারাও তো চরিত্র হয়ে উঠেছেন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে—দেবখণ্ডে যাদের দেখা মেলে। দেবতা হলেও মধ্যযুগের কবিরা কিন্তু তাঁদের মধ্যেও মনুষ্যচিত গুণ আরোপ করেছেন। আর সেখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁরা কাব্যে চলা-ফেরা করেছেন—আর তাঁদের চলাফেরায়, তাঁদের কার্যকলাপে যুগের ছবিটাও উঠে এসেছে। তাই মঙ্গলকাব্যের চরিত্রালোচনায় দেবতারা বাদ পড়েন না। *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ডে (যে খণ্ডটিই শুধু আমাদের আলোচনার বিষয়) তো দেবতাদেরই অধিষ্ঠান—তাঁরাই এখানে মুখ্য কুশীলব, নরখণ্ডের বর্ণনা এখানে অতি সংক্ষিপ্ত। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনা মোটামুটি মঙ্গলকাব্যের চরিত্রভাবনারই অনুসারী।

মঙ্গলকাব্যে সাধারণভাবে চরিত্র বিভাজনের যে রীতি (দেব চরিত্র, শাপভ্রষ্ট দেবতা এবং মানব চরিত্র) ভারতচন্দ্র সেই প্রথা মেনেই অগ্রসর হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবার কথা হল এই—ভারতচন্দ্র কবিতা লিখছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে—যখন গোষ্ঠী-চেতনা অবক্ষয়িত, সুস্থ ব্যক্তিচেতনারও জন্ম হয়নি, ফলে ভারতচন্দ্রের চরিত্ররা (দেবতা হলেও) চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছেন সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে, যে-সমাজে বিশ্বাসহীনতা জন্ম দিচ্ছে সংশয়ের আবহকে। অন্যভাবে বলা যায় ভারচন্দ্রের দেব চরিত্ররাও পাঠকের সামনে সমাজকে তুলে ধরছেন তার নানা মাত্রা নিয়ে।

॥ অন্নপূর্ণা চরিত্র ॥

মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী ভারতচন্দ্র কাব্যের সূচনা (গীতারম্ভ) করেছেন দেবচরিত্র সতীকে দিয়ে—ইনিই ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা। 'গীতারম্ভ' অংশে ভারতচন্দ্র অন্নদার দৈবী-রূপের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন পুরাণে 'সতী' সংক্রান্ত যাবতীয় প্রসঙ্গ—সতীর দক্ষালয়ে (পিতৃগৃহে) গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি বিষয়। প্রসঙ্গত দশমহাবিদ্যার বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই—তার পরেই 'সতী'-র দৈব মহিমার খোলসটি অনাবৃত হয়ে যায়। প্রকাশিত হয় দেবীর মানবী রূপ। সতীর প্রথম সংলাপ শিবের কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি প্রার্থনা :

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥

স্বামীর কাছে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। বাপের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ আসেনি, কিন্তু বাঙালি মেয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকে না। বস্তুত পিতৃগৃহ তো বাঙালি মেয়েদের কাছে ছিল মানসিক আশ্রয়ের জায়গা। শাক্ত পদাবলীতেও এই কন্যা-রূপিণী দেবীকে আমরা পাই। সতীর পিতৃগৃহে যাবার আবেদনে শিব অবশ্য প্রথমে অনুমতি দিতে নারাজ ছিলেন—আর তখনই দেবীকে দশ মহাবিদ্যার রূপটি দেখাতে হয়। শিবকে তখন বাধ্য হয়ে অনুমতি দিতে হয়। বাঙালি বিবাহিত মেয়েরা দশমহাবিদ্যা রূপে প্রকট না হতে পারলেও যে-ভাবেই হোক পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি আদায় করে নিত। কারণ মধ্যযুগের পুরুষ-শাসিত সমাজে বিবাহিত মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ি ছিল নিজেকে ফিরে পাওয়ার জায়গা। 'সতী'-র বাপের বাড়ি যাওয়ার আবেদনের মধ্যে হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে এরকম ভাবনা রয়ে গেছে।

এরপরে অন্নদা চরিত্রেও আর দৈবী মহিমার নির্মোক রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি ভারতচন্দ্র। নেশাখোর স্খলিত-চরিত্র শিবের পত্নী হিসেবে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। উমাকে পেয়ে শিব বেশ আনন্দিত। বিয়ের পর বাঙালি মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার 'art'-টি বোধহয় তাদের স্বভাবের মধ্যেই থাকে। ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণারও ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নেশাখোর বৃদ্ধ শিব ও তাঁর অনুচরদের নিয়ে উমার কোন অসুবিধে হয়নি, কোন অভিযোগও নেই। শিবের অনেকদিন সিদ্ধি খাওয়া হয়নি—অতএব তার আয়োজন করতে বললেন অনুচর নন্দীকে। আর এই সিদ্ধি ঘোটার সমারোহে হৈমবতী রাগ করেন না, বরং দেখা গেল 'হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।' বাঙালি মেয়েরা বৃদ্ধ স্বামীকে বোধহয় একটু বেশিই আস্কারা দিয়ে থাকে—অন্তত হৈমবতীকে দেখে তো তাই মনে হয়।

আমরা আগেই বলেছি আঠারো শতকের সমাজবাস্তবকে ভারতচন্দ্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন চরিত্রের মাধ্যমে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডে তো প্রায় সকলেই দেবচরিত্র। অতএব দেবচরিত্রদের মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্রকে সমাজের বার্তাটি পৌঁছে দিতে হয়েছে পাঠকের কাছে। ফলে দেবচরিত্ররা ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। সে-সময়ে কৌলীন্য প্রথার যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার নিদর্শন স্বয়ং শিব ও অন্নপূর্ণা। এক অবক্ষয়িত মূল্যবোধ অষ্টাদশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করেছে—সেই সমাজের চিত্র আঁকছেন ভারতচন্দ্র। কৌলীন্য প্রথার বাড়বাড়ন্তের পাশাপাশি ছিল পুরুষের বহুচারিতা ও যৌনশিথিলতার আধিক্য। পার্বতী পরমেশ্বর যুগল রূপের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র সুকৌশলে এই পৌরাণিক concept-কে আশ্রয় করে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজকে অনাবৃত করেছেন। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে শিবের অর্ধনারীশ্বর (অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে। হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে।।) হওয়ার প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় দেবীর উক্তিটি এক্ষেত্রে স্মরণীয় :

হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।

এখানেই দেবী থামলেন না—মোক্ষম আঘাতটি এবার হানলেন :

অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবী কি নারীবাদী হয়ে গেলেন? না ইনি দেবী নন—মধ্যযুগের এক বিশেষ কালের গৃহবধূ। স্বামীর প্রতি, পুরুষ সমাজের প্রতি নারী যে অব্যক্ত অভিমান পুষে রাখে—ভারতচন্দ্র তাকেই অন্নদারূপী গৃহবধূর মুখের ভাষায় স্থান দিয়েছেন। আর তাতেই তীব্র ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সে-যুগে নারীর সামাজিক অবস্থানের বৈষম্যের দিকটি। এভাবেই ভারতচন্দ্র চরিত্রের মাধ্যমে একটা বিশেষ কালের সমাজকে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ করান—এ কৃতিত্ব বড় কম নয়।

আমরা জানি কাব্যের নাম *অন্নদামঙ্গল*—অন্নদাতা অন্নপূর্ণাকে নিয়েই কবির কাব্য রচনা। সুতরাং 'অন্ন'-যে এ-কাব্যের মূল আশ্রয়ভূমি হবে তাতে তো কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। হর-গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হল—মধুচন্দ্রিমাও একদিন শেষ হল। এবার তো সংসারের বাস্তবের কঠিন গ্রন্থি মোচনের পালা। স্বাভাবিক ভাবেই হর-গৌরীর কোন্দল শুরু হয়—দরিদ্রের সংসারে যেটা অনিবার্য। গৃহকর্তা শিব কিছু করেন না—তবে তিনি জানেন 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র'। স্ত্রী-ভাগ্যে ধনের অধিকারী হননি—কিন্তু পুরুষ-ভাগ্যে দুটি পুত্রসন্তানের জন্মদাতা হয়েছেন। অতএব তাঁর মনে হতেই পারে 'গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী'। এসব শুনে কোন্ বিবাহিত নারীর পক্ষে সংযম রাখা সম্ভব—উত্তর দিতেই হয় :

ক. শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
খ. চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী॥
গ. আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়।
ঘ. উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
....
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান
....
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নেই ময়ুর উড়ায়॥
[আজকের ধনী-সন্তানের মতো?]
ঙ. সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনার যে বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ করার মতো তা হল কবি কিন্তু শিব ও শিবার মধ্য প্রত্যক্ষ কোন্দল দেখান নি। শিবের অভিযোগের উত্তর গৌরী দিয়েছেন পরোক্ষে, সখী জয়াকে সাক্ষী মেনে। বাঙালি গৃহিণী স্বামীর প্রতি অভিযোগ (যে-অভিযোগ একান্তই ন্যায়সঙ্গত) করার ক্ষেত্রেও কিছুটা সংযমের পরিচয় দেয়। আমাদের উল্লিখিত 'ক' ও 'গ'-এর চরণগুলিতে তারই পরিচয় আছে—'ক'-এ দেবী জানাচ্ছেন শিবের অভিযোগের উত্তরে তাঁরও বলার মতো কিছু আছে, কিন্তু তিনি বলবেন না কারণ তাতে ব্যাপারটি অন্য রূপ নেবে--একই রকমভাবে 'গ'-উদাহরণে দেখা যাচ্ছে শিব ধন নিয়ে দেবীকে আগে খোঁচা দিয়েছেন—দেবী জানাচ্ছেন এর যোগ্য জবাব তিনি দিতে পারতেন কিন্তু তা সংগত (উপযুক্ত) হবে না। এই মাত্রাজ্ঞান বাঙালি পুরুষের চেয়ে বাঙালি নারীদের মধ্যে যে বেশি দেখা যায় ভারতচন্দ্রের পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়েছে। রাজসভার কবির দৃষ্টি যে শুধু রাজসভাব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তা যে জনপদের মানুষকেও ছুঁয়ে গেছে তার প্রমাণ দেবীর এইসব সংলাপ। ক্রোধের বশে পুত্রদেরও দেবী রেয়াৎ করেন নি (দ্র. 'ঘ' অংশ)। আর সব শেষে হরের সংসারে তাঁর দুরবস্থাজনিত খেদ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এ-সবের আগে কবি আমাদের দেখিয়েছেন এক অকর্মণ্য স্বামীর অসহায় স্ত্রীর ভূমিকায় দেবীকে, যিনি শুধুমাত্র শিবগৃহিণী নন—দুটি শিশুপুত্রের জননীও। অভাব-জর্জরিত পরিবাবে মায়ের সবচেয়ে বড় বিপন্নতা তো সন্তানদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে না পারা। দেবীর সেই অসহায় আর্তি অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে কবির কাব্যে :

দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহি ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে।।

এখানে দেবী আর মানবী জননী কিন্তু সমার্থক হয়ে গিয়েছেন—আর এঁরা উভয়েই এই শতাব্দীরই সৃষ্টি। আসলে ঐ সময় সাধারণ মানুষের ওপর নানাবিধ শোষণ চলছিল। এই শোষণের ভয়াবহ রূপ ভারতচন্দ্র দেখেছেন—বুঝেছেন এই শোষণের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পাবে। তাই অন্নের জন্যে গোটা কাব্যে হাহাকার—গোটা *অন্নদামঙ্গল*-এ ছড়িয়ে আছে সন্তানের মুখে অন্ন জোগাতে না পারার বেদনা। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনাও সীমাবদ্ধ থেকেছে সন্তানদের জন্যে অন্ন প্রার্থনার মধ্যে। কবি এখানে নিজের সন্তানদের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে না পারার অসহায়তার মধ্যে দিয়ে সমকালের অন্নাভাবের বাস্তবকেই মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন।

এবারে অন্নপূর্ণার একটা অন্য ভূমিকার কথা আলোচনা করব---অবশ্যই সেটা প্রতীকী ভূমিকা। রাজসভাব কবি হয়ে ভারতচন্দ্র তো রাজা-ভূস্বামীদের শোষণের নিন্দা করতে পারেন না। রূপকের আড়ালে এঁদের কথা বলতে হয়। শিবের সঙ্গে কলহের জেরে দেবী বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সখী জয়া দেবীকে বাপেব বাড়ি যেতে মানা করলেন--শিব ভিক্ষায় বেরিয়ে যাতে কোথাও অন্নভিক্ষা না পান সেই ব্যবস্থা করতে বলেন দেবীকে। কারণ তাতেই শিব অন্নদার মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন। জয়ার উপদেশ :

তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে।।

অন্নপূর্ণা পৃথিবীর সব অন্ন হরণ করায় শিব কোথাও ভিক্ষা পেলেন না—এমনকি লক্ষ্মীও

তাঁকে নিরাশ করলেন—কারণ তাঁর ঘরও অন্নহীন। এবারে লক্ষ্মীই রহস্যভেদ করলেন। তিনি শিবকে জানালেন :

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা

অন্নপূর্ণার খেলায় শিবের প্রাণসংশয়, আর অন্নপূর্ণারূপী ভূস্বামী ও মজুতদারদের খেলায় তৎকালীন সাধারণ মানুষের অন্নহীন থাকা ছাড়া কোন রাস্তা ছিল না। আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি এই বাস্তবকেই এঁকেছেন তাঁর কাব্যে অন্নপূর্ণার চরিত্রকে আশ্রয় করে।

অন্ন-ই *অন্নদামঙ্গল* (প্রথম খণ্ড) কাব্যের মূল 'থিম' এবং তাই কাব্যের উপাস্য দেবীর নামও অন্নপূর্ণা—একথা অন্নদা চরিত্র আলোচনায় বার বার অনুভূত হয়। কাব্যের শেষাংশে কাশীতে শিবের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে অন্নদা ব্যাসকে ছলনা করেন জরতী মূর্তি ধারণ করে। ব্যাস অন্নদারও ভক্ত—কিন্তু শিব তো পতি। সুতরাং পতিকে 'ডিফেণ্ড' করতে ভক্তকে ছলনা করে শিক্ষা দিতে হয়। এ এক অন্য রাজনীতির খেলা—যে খেলায় ন্যায় নীতির কোন বালাই নেই, যে-খেলায় নিজেদের শ্রেণী সংগঠন (গিণ্ড) বাঁচাতে (দ্র. ব্যাস হরিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিষ্ণুর কাছ থেকে সেভাবে কোন সাহায্য পাননি—বিষ্ণু শিব-বিষ্ণু জোটকেই অধিক মান্যতা দিয়েছেন) দেবীকে ভক্তকেও ছলনা করতে হয়—অনৈতিকভাবে হলেও (দ্র. ব্যাসের উক্তি 'শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া। কি গুণ বাড়িল তবে ব্যাসেরে ছলিয়া')। অষ্টাদশ শতকের ঘৃণ্য রাজনীতির ছায়া হয়তো অন্নদার ব্যাস ছলনায় পাঠক আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু যে-বিষয়টি আমরা বলতে চাইছি তা হল ব্যাস ছলনায়ও সেই অন্নের কথা কবি ভুলতে পারেন নি। শিবের মতো ব্যাসও দ্বারে দ্বারে ঘুরেও অন্নভিক্ষা পাননি—প্রয়োজন হয়েছে অন্নদার কৃপা। অন্নদার জরতী মূর্তির রূপায়ণে কবি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন—আর শেষে কবি বলেই ফেললেন :

বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার॥

শেষ পর্যন্ত কবি দেবী অন্নপূর্ণাকে—অন্নের ভাণ্ডার যাঁর করায়ত্ত, বিশ্ব যাঁকে অন্নদাতা হিসেবে মান্য করে তাঁকেও নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি রূপে পাঠকের কাছে উপস্থিত করলেন।

এইভাবে কবি অন্নপূর্ণা চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন—মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যে দেবীর এই রূপ নতুন এবং অভিনব। মঙ্গল কাব্যধারার শেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় আমরা এক নতুন দেবীকে পেলাম যার মধ্যে দেবীর ঐশ্বর্যরূপের সঙ্গে সমন্বিত হল জননীর বাৎসল্য রূপের। এর আগে কোন দেবী-ই অন্নদাতা জননী রূপে দেখা দেন নি। ভারতচন্দ্রের, তথা কৃষ্ণচন্দ্রের উপাস্য দেবী অন্নপূর্ণাই প্রথম বাঙালির অন্নদাতা জননী হিসেবে জনমানসে স্থান করে নিলেন।

॥ শিব চরিত্র ॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত পরিসরে শিবের অবস্থান। সতী ও উমা— দেবীর দুই জন্মেই শিব আছেন। এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে শিবকে সতীপতি ও উমাপতি হিসেবেই *অন্নদামঙ্গল*-এ উপস্থিত করেছেন। তবে সতীপতি শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্যে কবি মহাভাগবত পুরাণের অনুসরণ করেছেন। ঐ সূত্র অনুসারে কারণজলে প্লাবিত চন্দ্রানলরবি-বিরহিত অন্ধকারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনেই তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁদের

পরীক্ষা করার জন্য দেবী অন্নপূর্ণা শবরূপ ধারণ করে কাছে গেলে বিষ্ণু 'পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি', ব্রহ্মার কাছে গেলে তিনি 'পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিবিয়া ফিরিয়া মুখ'। এরপর দেবী .

বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব সঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বলিতে হইল ঠাঁই
যত্নে ধবি বসিলা চাপিয়া।।
দেখিয়া শিবের কর্ম তাহাতে বসিল মর্ম
ভার্যারূপা ভবানী হইলা।

সতীব দক্ষালয়ে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা এবং নারাজ শিবকে অনুমতি দিতে রাজি করানোর বিষয়টিও মহাভাগবতের পুরাণ অনুসারেই বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে কবি শিবকে যে লৌকিক স্তরে নিয়ে আসবেন তার সূচনাও এখানে হয়েছে। সতী শিবের কাছে অনুমতি চাইছেন পিতৃগৃহে যাবার জন্য .

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপাব ভবন।।

শিব নিমন্ত্রণ না থাকার কথা বললে সতীব উত্তর

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।
বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা।।

অনায়াসে যাকে মানবিক বাস্তবের ছবি বলা যায়। এখানে ভাবে ভাষায় লোকায়ত ভঙ্গিমাব আভাস পাওয়া যাচ্ছে—এরপর সতী শিবের সামনে দশমহাবিদ্যা রূপ প্রকট করলে অনুমতি দেওয়া ছাড়া শিবের আর কোন উপায় থাকে না। কবি এভাবে মানবিক বাস্তবতা ও পুরাণ-কথিত শিবের দৈবী মহিমার অনায়াস মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

পুবাণে দক্ষযজ্ঞের কথা আছে, যে-যজ্ঞস্থলে শিবনিন্দা শুনতে অসমর্থ সতী প্রাণত্যাগ করলেন। এরপরে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড, দক্ষের মৃত্যু, প্রসূতির প্রার্থনায় দক্ষের পুনবায় জীবন লাভ, সতীর অভিশাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়া, প্রাণ ফিরে পেয়ে দক্ষের শিব বন্দনা, সতীর দেহ স্কন্ধে শিবের পৃথিবী পরিক্রমা এবং বিষ্ণু কর্তৃক সতীর দেহকে ৫১টি খণ্ডে বিভাজনে এবং ঐ খণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় পড়ে তীর্থস্থানে পরিণত হওয়া—এইসব পৌরাণিক তথ্যকে কবি কাব্যে প্রায় যথাযথ ভাবে এনেছেন। কিন্তু এই পৌরাণিক অনুসৃতি সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র এখানে একটু অন্যভাবে শিব চরিত্রকে তুলে ধরলেন পাঠকের কাছে—পৌরাণিক মহিমার সঙ্গে শিবের প্রেমিক রূপটিকেও কবি আঁকলেন বেশ যত্ন সহকারে। সতীর দেহত্যাগের পরে নন্দী 'শূন্য রথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে' শিবকে সতীর মৃত্যুসংবাদ দিলে পতি হিসেবে শিবের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ব্যক্ত করে ভারতচন্দ্র জানালেন ·

শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর
বিস্তর কৈলা রোদন।

আব তার পরে

লয়ে নিজগণ করিলা গমন
করিতে দক্ষ দমন।

দক্ষযজ্ঞ বিনষ্টের পর :

যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥

সতীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে শিব কাঁদছেন, তারপরে ক্রোধ, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে সতীর মৃতদেহ দেখে আবার কেঁদেছেন—একেবারে সাধারণ প্রেমিকের মতোই এই প্রতিক্রিয়াটি। শিবের প্রেমিক রূপের (অবশ্য শাস্ত্রীয় সমর্থন ছিল) এই চিত্র ভারতচন্দ্রের লেখনীর গুণে বেশ উজ্জ্বল। আমরা পরে দেখব বিবাহোত্তর (শিব-উমার) পর্বে উমার প্রতি শিবের প্রেম নিবেদনের ছবি—যা দুটি লোকায়ত নর-নারীর হৃদয়-বিনিময়ের ছবিকেই যেন পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। কবি যে এরপর আর শিবের দৈবী মহিমা কীর্তন করবেন না, তাঁকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে আনবেন তাঁর ভূমিকাও কবি এখানে করে রাখলেন।

পুরাণে আছে সতীর দেহ খণ্ডিত হওয়ার পর শিব হিমালয় পর্বতে ধ্যানে বসেন। *কুমারসম্ভব* কাব্যে শিবের যে ধ্যানরত মূর্তি কালিদাস এঁকেছেন তাতে শিবের পৌরাণিক মহিমা পুরোপুরি বর্তমান। মদনের বাণ নিক্ষেপে তপস্যা ভঙ্গ হলে শিবের অভিশাপে মদন ভস্মীভূত হন—কিন্তু তাতে তাঁর কোন বিচলন হতে দেখা যায় নি। ভারতচন্দ্র কিন্তু এই অংশে শিব-মহিমা শুধু খর্বই করেন নি, শিবকে যে পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন তাতে আমাদের ঔচিত্যবোধও আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মদনের প্রয়াসে শিবের ধ্যানভঙ্গ হলে শিবের নৈতিক চ্যুতির যে-বিবরণ কবি দিয়েছেন তা এইরকম :

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাঁহার বাণে।
বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

একে কী বলব—শিবের লোকায়তকরণ—না, এ-শিব অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লেদ-পঙ্কিল জীবনকেই প্রকট করে। অর্থাৎ যুগের দাবি মেনেই শিব চরিত্রের এই অবনমন। আর যে-তথ্যটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল রাজসভার কবি হিসেবে ভারতচন্দ্রের প্রধান দায় ছিল রাজা ও রাজসভাসদদের মনোরঞ্জনের। 'শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম' অংশে ভাবতচন্দ্র নিজেই সেকথা জানিয়েছেন :

কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্রপ্রায়
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত রচিলা ভারত
কবি রায়গুণাকর॥

শেষ পর্যন্ত নারদ শিবকে শান্ত করেন এই বলে—

দক্ষগৃহ ছাড়ি হেমন্তের বাড়ি
জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।

বিবাহের ব্যাপারে শিবের দেরি সইছিল না। নারদ তখন শিবকে বলেন .

প্রায় হয়ে বুড়া ভুলিয়াছ খুড়া
দিন দুই স্থির রহ॥

শিবের প্রতি নারদের উপদেশে কিন্তু সমাজসত্যের এক নির্মম দিকের প্রকাশ ঘটেছে। কৌলীন্য প্রথার কারণে তখন বিয়ের পাত্রদের অধিকাংশের যথেষ্ট বয়স হত। আর এই বৃদ্ধ পাত্ররা পুনরায় বিবাহ করার জন্য প্রচুর আগ্রহ দেখাত। অল্পবয়সী কন্যারা সমাজের নির্মম প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হত। ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমবা আগে বলেছিলাম যে, ভারতচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্ররা সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে যুক্ত। শিবের চরিত্রে আমরা দেখলাম সমাজেরই একটা ঘৃণিত প্রথা কীভাবে শিবের আচরণে প্রকট হয়ে পড়েছে।

'শিব বিবাহ যাত্রা', 'শিব বিবাহ'—কাব্যের এই দুটি অংশে যে শিবকে কবি এঁকেছেন তাঁর মধ্যে পৌরাণিক মহিমার চিহ্নমাত্র নেই—তিনি পুরোপুরি লোকায়ত জীবন-সম্ভূত। কবির উদ্দেশ্যও সেরকমই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনিকেত জীবনে দেবমহিমায় অখণ্ড বিশ্বাস রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই দেবতাদের নিয়ে যে-উপহাস কবি করেছেন তা সম্ভবত যুগেরই বার্তাবহ। আর মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যেব ধারায় শিবের লোকায়ত রূপেব আদরও কম নয়। ভাবতচন্দ্র যা করেছেন তা হল শিবের সেই লোকাযত identity ব পুনরুদ্ধাব আর তাতে মিশিয়েছেন হাসির উপাদান (সূক্ষ্মভাবে সেই হাসির সঙ্গে মিশে থাকে ব্যঙ্গ)। তবে হাস্যরসের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই স্থূল অশ্লীলতার প্রকাশও ঘটে গেছে—এয়োগণকে সঙ্গে নিয়ে শিববরণের (স্ত্রী আচাব) দৃশ্যটি তারই নিদর্শন। মেনকার সামনে ·

বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥

প্রদীপ নেবালে কি হবে ভারতচন্দ্র তো দৃশ্যটি প্রলম্বিত করবেন, তাই 'শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥'

আসলে ভারতচন্দ্র ভুলতে পারেন না তাঁর রাজসভার কবিসত্তাকে, অথবা তাঁকে ভুলতে দেওয়া হয় না। তাই তাঁর শিব চরিত্রের পরিকল্পনাতেও অশ্লীলতার ছোঁয়া লাগে। পরে অবশ্য 'শিবের মোহন বেশ' অংশে কবি নিজেকে defend করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত, তিনি যুগেরই কবি—ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* যুগেরই দর্পণ—এখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এহেন সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তিও আছে। শিবের বিবাহ-সংক্রান্ত অংশগুলি মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কৌলীন্য প্রথায় জর্জরিত বাংলাদেশের বাস্তব চিত্রের বাঙ্ময় প্রকাশ। উমার মা-বাবা কেউই বর (শিব)-কে আগে দেখেন নি—নারদের (ঘটক) কথা শুনেই তাঁরা উমার পাত্র হিসেবে শিবকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে অন্যরকম করা বা ভাবা কি সম্ভব ছিল—কন্যার জন্যে পছন্দ মতো পাত্র নির্বাচনের সুযোগ বা অবকাশ কি তাঁদের ছিল? ছিল না। কুল বাঁচাতে এবং দারিদ্র্যেব কারণে বাংলাদেশের অসহায় পিতা-মাতা তাঁদের কন্যাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন। *অন্নদামঙ্গল*-এর বিবাহসংক্রান্ত দৃশ্যগুলিতে আলোচ্য শতকের শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের দেখালেন সমাজের এক বিয়োগান্ত দৃশ্য—এক কমনীয়া কুমারীর বৃদ্ধ বরের প্রতিমূর্তি হিসেবেই শিব তাই সমকালের 'বাস্তব' চরিত্র হয়ে ওঠেন। এই বিবাহ দৃশ্যাবলীতে হিমালয় যথেষ্ট সংযতবাক

এক পিতা যিনি বরকে দেখে 'বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি'— কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া জানান না। কারণ জানেন এটাই কন্যার ভবিতব্য—নারদ উপলক্ষ মাত্র। আর মেনকা— নারদকেই এ-সব কিছুর জন্যে দায়ী করে বলেন :

ও রে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

কন্যার মা তো' তাঁর পক্ষে এরকম প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের সব চরিত্রই 'type'— সমালোচকদের মোটামুটি এটাই অভিমত। প্রসঙ্গত মুকুন্দের সঙ্গে তুলনাও এখানে এসে যায়। সমালোচকদের অভিমত অনেকটাই গ্রাহ্য—তবে এ-ক্ষেত্রে যে সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত থেকে চরিত্ররা উঠে আসছে সেই পরিপ্রেক্ষতটিও আমাদের স্মরণে রাখতে হয়। কারণ আমরা দেখলাম একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দুজন মানুষ তাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা-আবেগ অনুযায়ী দু-ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন—ভারতচন্দ্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তা ধরাও পড়েছে। চরিত্র পরিকল্পনায় বিষয়টি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

ভারতচন্দ্র শিবের প্রেমিক মূর্তিটি কিন্তু বার বার দেখিয়েছেন—প্রথমে সতীর মৃত্যুর পর, পরে বিবাহোত্তর হরগৌরীর কথোপকথন পর্বে। মর্ত্যে নর-নারীর মধুচন্দ্রিমার যেন ছায়া পড়েছে এই পর্বে। এ-শিব লোকায়ত অবশ্যই, কিন্তু কোথায় যেন একটু অন্যরকম। বিয়ের পর উমার প্রতি শিবের approach-টাই অন্যরকম (অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে কবিদের treatment-এ শিবের প্রেমিক মূর্তিটি ঠিক এভাবে প্রকাশ পায় নি)—মানবসংসারে প্রেমিক স্বামী যেমন তার প্রেমিকা স্ত্রী-কে প্রেম নিবেদন করে ঠিক সেইরকম ভাবে শিব গৌরীকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এতদিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আর বার।
সত্য করে কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥

শেষ পঙক্তিটি মানব সংসাবের চিরন্তন প্রেমের শর্ত হিসেবেই গ্রাহ্য। এক্ষেত্রে পঙক্তিটি শিবের মুখে কিন্তু অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সদ্য বিবাহিত (বয়সের পার্থক্য পাঠক ভুলে যান) শিব-পার্বতীর হৃদয় বিনিময়ের যে অন্তরঙ্গ ছবি (এমন মনে হয় কবি যেন সেই ঘরে উপস্থিত থেকেই সব শুনেছেন) পাঠককে উপহার দিলেন কবি তা এক কথায় অনবদ্য— যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির শ্লাঘার বিষয়। শিবের প্রেম নিবেদনের উত্তরে উমা অবশ্য শিবকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি কিন্তু তাতে কোন তীব্রতা নেই ঝাঁঝ নেই—এরকম ভাবে বিদ্ধ হতে যে-কোন পতিরই ভাল লাগবে—শিব তাই উমার কথা গায়ে না মেখে উমাকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করার কথা বলতে পারেন। উমা অনেক বাস্তব অসুবিধের কথা বলেও শেষে রাজি হয়ে যান (মধুচন্দ্রিমা-পর্বে এটাই তো স্বাভাবিক); তখন :

দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥

হর-গৌরীর এই কথোপকথন অংশে পৌরাণিক প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু পার্বতী-পরমেশ্বরের

যুগল মূর্তি অঙ্কনের অছিলায় যে মানব-মানবী-কে কবি আঁকলেন সে-চিত্র উৎকর্ষের শিখর-দেশ স্পর্শ করেছে।

এর পর সংসার জীবনের বাস্তবতা। দুটি পুত্রসন্তান নিয়ে হর-গৌরীর সংসার। পরিবারের কর্তা প্রেমিক হতে পারেন কিন্তু কর্তব্যকর্মে উদাসীন। নিজের অক্ষমতার দায়ভার অনায়াসেই স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনা তাঁর (বাঙালি পুরুষের সাধারণ চারিত্র্য লক্ষণ রূপেই কবি বোধহয় শিবকে এইভাবে এঁকেছেন)। 'হরগৌরী কন্দল' অংশে কবি শিবকে একেবারে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে আনলেন। সমকালের সাধারণ পুরুষের মতো শিবকে আচরণ করতে দেখা গেল। সেকালে বিবাহিত কুলীন পুরুষদের উপার্জনের প্রয়োজন হত না। কারণ কিছুদিন অন্তর অন্তর এক একজন স্ত্রী-র পিতৃগৃহে কাটিয়ে আসতে পারলে বছর ঘুরে যেত। শিবের কপাল অবশ্য অতটা ভাল ছিল না। তাছাড়া শিবের কথায় যে-গৃহিণী চণ্ডীর মতো 'গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী'—তাঁর তাড়নায় শিবকে অগত্যা ভিক্ষেয় বোরোতে হয়। ভিক্ষায় গমনোদ্যত শিবের অবস্থার বর্ণনায় কবির সহানুভূতি (পাঠকেরও) শিবের দিকেই :

বেলা হৈলা অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥

ক্ষুধার অনিবার্যতায় শিবকে ভিক্ষায় বেরোতে হয়, কিন্তু অভিমানটুকু পুরোমাত্রায় বজায় আছে—

ঘর উজারিয়া যাব ভিক্ষা যে পাই খাব
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিৎ বনবাস॥

এখানে কি শিবের আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে কবির উপদেশও মিশে গেছে?

আসলে বিবাহোত্তর হর-গৌরীর জীবনে অভাব-অনটনজনিত নিত্য বিবাদেব যে-ছবি কবি এঁকেছেন তাতে শিবের ভূমিকা এক সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের—যিনি সব দায়ভার স্ত্রীর ওপর চাপাতে চাইলেও মনে মনে জানেন এই অবস্থার দায় তাঁরও। তাঁর বোধে অজ্ঞাত থাকে না যে তিনি সমকালের এক দরিদ্র সরল মানুষ—বয়সের কারণে চাষ-বাস-বাণিজ্য কোন কাজের মাধ্যমেই উপার্জনে অক্ষম। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষায় বেরোতে হয়—সমকালেব এই ধরনের মানুষের অনিবার্য পরিণতি শেষ পর্যন্ত শিবকেও মানতে হয়। প্রচ্ছন্নভাবে পৌরাণিক তাৎপর্য থাকলেও এই অংশে কবি শিবকে দেবত্ব-বর্জিত এক অসহায় মানুষের প্রতিনিধি করেই এঁকেছেন। এই অসহায়তা আরও তীব্র মাত্রায় প্রকাশ পায়, যখন ভিক্ষাপ্রার্থী শিবের মধ্যে এক পাগল ভিক্ষুকের কৌতুক-উদ্রেককারী রূপটি ফুটে ওঠে, যাকে পথের বালকেরাও অবজ্ঞা করে। আর 'চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ'—বলে শিব আপন পৌরাণিক মহিমা প্রকাশ করেও শেষ পর্যন্ত অন্নসংস্থানে ব্যর্থ হন। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৌরাণিক মহিমা এমন মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছিল—তাই শিবের 'চেত রে চেত রে চিত' ডাক সাধারণ মানুষের ওপব আর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এ এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা—সমকালীন বাংলাব মানুষ যা প্রত্যক্ষ করেছেন। শেষ পর্যন্ত অন্নহীন শিবকে উচ্চারণ করতে হয় :

ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাদ।

তার কেন বিলাসের সাদ।

এই অনুশোচনার ভাষা আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীরই দরিদ্র-শোষিত মানুষের অসহায়তার ভাষা। ভারতচন্দ্র—সাধারণ মানুষের অসহায়তাকে রূপ দেওয়ার জন্যে শিবকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে এনেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভারতচন্দ্রের পৌরাণিক শিবকে লোকায়ত জীবনে সাঙ্গীভূত করা অনিবার্যই ছিল। চরিত্রাঙ্কনে ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতার এ এক অনন্য নিদর্শন।

ক্ষেত্র গুপ্ত লোকায়ত এই শিবের মধ্যেই শিবরূপী বাংলার কৃষক-জনতার ছায়াপাত ঘটতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন "অন্নের জন্য হাহাকার সারা দেশ জুড়ে না হোক, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বেদনা-বিদীর্ণ কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল, রাজসভার কবি তা ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্যে। শিবের 'হা অন্ন হা অন্ন' বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর প্রেরণায় যে অন্য কিছু নেই তা বলা যায় জোর দিয়ে।" এই সূত্রেই তিনি বলেছেন 'অন্ন যার ঘরে/সে কাঁদে অন্নের তরে/এ বড় মায়ার পরমাদ।' এই উক্তিতে শিবরূপী বাংলার কৃষক জনতাব সত্যকার পরিচয় আছে, অন্নস্রষ্টার অন্নাভাবের বেদনা আছে, পৌবাণিক কাহিনীর পাতলা আবরণে যে সত্য ঢাকা পড়ে না।" [*প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন*]

এই পৌবাণিক শিব-মহিমা একেবারেই ধূসর হয়ে গেল যখন অন্নপূর্ণা-প্রদত্ত অন্ন খেয়ে শিবের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে বালকের আনন্দ। ভারতচন্দ্রেব বর্ণনায় সেই ছবিটি এরকম :

পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিযা॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিযা॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥

শিবকে উপলক্ষ করে অন্নলাভে তৃপ্ত বুভুক্ষু মানুষের নির্মল আনন্দাতিরেক প্রকাশ ঘটেছে এই বর্ণনায়। পাঠকের মনে পড়তে পারে একালের অনাতম মহৎ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসের প্রসঙ্গ। সেখানে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের ভাগ্যে ভাত কদাচ জুটত। ভাত খেতে পাওয়ার সুযোগের দিন তাদের কাছে ছিল উৎসবের দিন। উপন্যাসের কথকের নিম্নবর্গীয় মানুষদের ভাত খাওয়ার দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। দেখেছিলেন ভাত খাওয়ার আনন্দে উজ্জ্বল মুখের কিছু অভিব্যক্তি—যার সঙ্গে শিবের আনন্দের কোথাও যেন যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। অন্নহীন মানুষের আনন্দের কারণ তো কালে-কালান্তরে একই হওয়ার কথা।

এসব সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হয় ভারতচন্দ্র অন্নদার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য লিখেছেন—যেখানে দৈবী মহিমার সব নির্মোক খসিয়ে ফেলা যায় না—ঔচিত্যবোধের কারণেই। তাই 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে ভারতচন্দ্র যখন নিন্দাচ্ছলে অন্নদার মুখে প্রশংসামূলক ব্যাজস্তুতি বসিয়ে দেন, তখন কুলীন শিবের কৌলীন্য মহিমা হারিয়ে গেলেও তার মধ্যে থেকেই প্রকাশ পায় শিবের দেবমাহাত্ম্য। তবে সেই সঙ্গে স্বীকার করে নিতেই হয় যে, সামগ্রিকভাবে এই উপস্থাপনাভঙ্গি লৌকিকতাকেই প্রকাশ করে। লোকায়ত ও দৈবী মহিমা—

এই দুই বিপরীতের সম্মিলনে ভারতচন্দ্রের শিবচরিত্র গড়ে উঠেছে—তবে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিবের মানব-ব্যক্তিত্বই অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমকালীনতার দাবি মেনেই শিবের মুখ দিয়ে কবি হরি ও হরের অভেদত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ শিব তো সমাজ-রূপান্তরের বার্তাবহ এক সমাজ-প্রতিনিধি। সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে *অন্নদামঙ্গল*-এর শিব অনন্য—মধ্যযুগের কোন কাব্যে—মুকুন্দ ও রামেশ্বর-অঙ্কিত শিব চরিত্রেও ভারতচন্দ্র-অঙ্কিত শিবের নানামুখী বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। 'নূতন মঙ্গল' রচনায় বসে এক অভিনব শিবকে কবি উপহার দিলেন পাঠককে—এ-কারণে ভারতচন্দ্রের কাছে আমাদের ঋণ থেকেই গেল।

॥ ব্যাসদেব চরিত্র ॥

দেবখণ্ডের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ব্যাসদেব। ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যে ব্যাসদেব পুরাণ-প্রণেতা দেবোপম চরিত্র। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে ব্যাসদেবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—ভারতচন্দ্র সেই সূত্রকে অবলম্বন করে ব্যাসদেবের চরিত্র পুনর্গঠন করেছেন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। বস্তুত ব্যাসদেবের মতো একটি পৌরাণিক চরিত্রকে যুগ-প্রেক্ষিতে স্থাপন করে তাঁকে একই সঙ্গে যুগের সৃষ্টি এবং যুগন্ধর করে তোলার অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের চরিত্র নির্মাণ ক্ষমতার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ব্যাসদেব। আমরা জানি অষ্টাদশ শতাব্দী সংশয়ের যুগ হিসেবেই চিহ্নিত। দেবখণ্ডের শিব এবং অন্নদা চরিত্রে সেই সংশয়ের চিহ্ন বর্তমান। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতার পরিচয় সেখানে বিশেষ নেই। কিন্তু ব্যাসদেবের চরিত্রে যুগের সংশয় ও অস্থিরতা পুরোপুরি বর্তমান। আসলে ব্যাসদেবের চরিত্র নির্মাণের সূত্রেই কাব্যে নানা প্রসঙ্গ এসেছে—সেগুলি যেমন যুগচ্ছবি হয়ে উঠতে পেরেছে তেমনি তার মধ্যে দিয়ে কবি-অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হয়েছে। ব্যাসদেবের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলি আলোচনায় উঠে আসবে।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাসদেবের চরিত্রকে type চরিত্র বলে মনে হলেও কোন বিশেষ ভাব বা তত্ত্বের বাহন তিনি নন। বরং যুগের অস্থিরতা ও সংশয় তাঁর চরিত্রে কিছুটা জটিলতারও সৃষ্টি করেছে। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল। ব্যাসদেবের চরিত্রকে অনেক আলোচক ভারতচন্দ্রের আত্মপ্রক্ষেপ হিসেবে দেখেছেন। ভারতচন্দ্রের সংঘাতময় জীবনের কথা ভাবলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই বিচার করতে হয়। সেক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি একবার দেখে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের পিতার সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারের সংঘাতের কারণে বালক কবিকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করতে হয়। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অগ্রজেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মূল্য দেন না। জীবিকার জন্যে তাই ভারতচন্দ্রকে রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফারসি ভাষা শিখতে হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রীতি নয় প্রয়োজনই তখন বড় হয়ে ওঠে। জীবনের এই পর্বে কোন স্থিতি খুঁজে পান নি ভারতচন্দ্র। পাননি আপনজনের স্নেহচ্ছায়া। ব্যাসদেবও জীবনে প্রয়োজনকেই বড় করে দেখেছেন এবং তিনিও কোন স্থির ভূমির সন্ধান পান নি। অগ্রজদের ইচ্ছায় ভারতচন্দ্রকে জমিসংক্রান্ত কাবণে বর্ধমানে যেতে হয়। সেখানে তিনি ঘটনাচক্রে কাবারুদ্ধ হন। তবে কারারক্ষীর সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়ে কটকে চলে আসতে সমর্থ হন। সেখানে বৈষ্ণব সঙ্গ করতে করতে বৈষ্ণব ভেক ধরেন। এক বৈষ্ণবদলের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তিনি খানাকুলে পৌঁছলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলে এবং তাঁকে সংসারে ফিরিয়ে আনে। ভারতচন্দ্রের জন্মান্তর হয়। এর পরের

ইতিহাস তো ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের কবি হয়ে ওঠার ইতিহাস। প্রথম বয়সে যে-কবি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছেন সেই কবি পরবর্তীতে 'চণ্ডী' নাটক রচনা করেন, রচনা করেন অন্নদার মহিমাজ্ঞাপক কাব্য *অন্নদামঙ্গল*। একই কবির বিভিন্ন দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্যরচনায় কোন আনুগত্য বদলের পরিচায়ক নয়, প্রয়োজনের দাবি মেনেই এই বহুদেবতার উপাসনা। ব্যাসদেবের জীবনেও একই ঘটনা ঘটেছে। বৈষ্ণবভক্ত ব্যাসদেব স্বার্থসিদ্ধির আশায় শিবভক্ত হয়ে গেছেন। আবার যখন জেনেছেন যে শিবকে পরিচালনা করেন দেবী অন্নদা তখন তিনি দেবীর উপাসক হয়ে যান। আসলে অস্থির আর সংশয়ের যুগে এমনটাই হয়। ভারতচন্দ্রের জীবনের প্রথম দিকে অনেকটা সময় সমকালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্থিতিশীল ছিল না। ব্যাসদেবের জীবনও অস্থিরতার জীবন—স্থিতিশীলতার অভাবে ব্যাসদেবকে এক অনিকেত জীবন যাপন করতে হয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন লক্ষ্যে তাঁর পৌঁছোনো হল না।

ভারতচন্দ্র নারায়ণ-অংশ রূপে ব্যাসদেবকে পাঠকের সঙ্গে পবিচয় করিয়েছেন—প্রসঙ্গত তাঁর পাণ্ডিত্য এবং পিতা-মাতার পরিচয়ও দিয়েছেন। নারাযণের অংশ—তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বৈষ্ণব—অন্য ধর্ম এবং সেই ধর্মের পূজ্য দেবতা তাঁর কাছে কোন মানে রাখেন না। তাই তিনি শিবের পূজক শৌনকাদি ঋষিদের শিব পূজাব অসারতা বোঝান .

বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবেব সেবন।।
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই।
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম।।
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্য জনে।
মোক্ষফল পাবে যদি ভজ নারায়ণে।।

উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে বেদব্যাসের একান্ত বৈষ্ণব নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে। এই নিষ্ঠার কারণ, একমাত্র নারায়ণ ভজনায় মোক্ষলাভ সম্ভব। ভারতচন্দ্র কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যাসদেবের অন্য ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করার কারণটি এখানে ছুঁয়ে গেছেন। কবি ব্যাসদেবের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন আজকের জীবন চর্যার সারকথা—'ভজনীয় সে জন যে মোক্ষ দেই'। কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে কাব্য লেখায় ভারতচন্দ্রের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এসেছিল (অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটাই ছিল মোক্ষ)। সুতরাং তিনিই বলতে পারেন ধর্মে আস্থা রাখার ব্যাপারটি শর্তসাপেক্ষ। 'শিবপূজা নিষেধ' অংশটিতে ব্যাসদেবকে কেন্দ্র করে ভারতচন্দ্র তৎকালীন ধর্মীয় পরিমণ্ডলের একটা চিত্র এঁকেছেন। 'শিবপূজা নিষেধ' অংশের শেষে দেখা গেল :

এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে।।

আর,

ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ।
পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্ত্তন।।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্পষ্ট বিভাজনের ছবি। বাঙলার ধর্মীয় ইতিহাসে এরকম অন্তর্কলহের ছবি আগেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের ব্যাস সম্পর্কিত অংশে এই কলহ একটা

নতুন মাত্রা পেয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ব শতাব্দীর মতো দেবনির্ভব ধর্মবাদ আব মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না—মানুষই নিজের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করেছে। ব্যাসেব মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও আজকের রাজনৈতিক দলগুলির মতো (যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও প্রসারিত করার জন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করে) নিজের স্বার্থে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এই দিক থেকে ভারতচন্দ্রের ব্যাসদেব ভবিষ্যতের বার্তাবাহক হয়ে ওঠেন।

বারাণসীতে পৌঁছে ব্যাস হরিভজনার সঙ্গে সঙ্গে শিবের নিন্দা শুরু করলেন। শিবনিন্দায় ক্রুদ্ধ নন্দী ব্যাসদেবের 'ভুজস্তম্ভ' 'কণ্ঠরোধ' করে শিবনিন্দার ফল ব্যাসদেবকে বুঝিয়ে দেয়। 'ভুজস্তম্ভ' কণ্ঠরোধের ব্যাপারটির ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র যুগপ্রবণতার ছায়াপাত ঘটালেন। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে একটা ক্ষীণ ঐক্যেব সুর শোনা যাচ্ছিল—সমকালীন জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসের দিকটি আর সেভাবে মানুষেকে প্রভাবিত করতে পারছিল না। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল দুটি শ্রেণী—একটি দেবতাদের, যারা দেবস্বার্থরক্ষায় তৎপর আর অন্যদিকে থাকল ব্যাসদেবের মতো জ্ঞানী মানুষেরা, যাঁরা স্থির প্রত্যয়ে আস্থা রাখতে পারছিলেন না—কারণ অবশ্যই দেবতাদেব শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখতে ভক্তদের বিশ্বাসকে উপেক্ষা কবা। কাব্য থেকে উদাহরণ নেওযা যাক

গোবিন্দ জানিলা ব্যাস পড়িলা সঙ্কটে।
কুণ্ঠভাবে উত্তরিলা ব্যাসের নিকটে।
বিস্তর ভর্ৎসিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সেই শিব।
শিবেরে করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥

[লক্ষণীয় 'কুণ্ঠভাব' শব্দটি। দেখা যাচ্ছে দেবতারা সকলেই একই শ্রেণীভুক্ত—পরবর্তীকালে অন্নদাও শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে আশ্রয়প্রার্থীকে (ব্যাসদেব) ছলনা করছেন। বিষ্ণু যথেষ্ট কুণ্ঠা নিয়ে ভক্তের কাছে এসেছেন—এসবই প্রমাণ করে একান্ত আনুগত্যের কোন প্রশ্ন অষ্টাদশ শতকে ছিল না।]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন ইষ্টে নির্ভরশীল থাকা অর্থহীন, কারণ ভক্তের স্বার্থের সঙ্গে দেবতাদের শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে ইষ্ট ভক্তের স্বার্থের মর্যাদা দেবেন না—শ্রেণী স্বার্থই তাঁর কাছে তখন বড় হয়ে দাঁড়াবে। কবি রূপকের আড়ালে সময়ের বাস্তবকেই তুলে ধরলেন।

ব্যাস বুঝলেন দেবতাদের অভিপ্রায়—বুঝলেন যে দেবতা বাঁচাবেন তাঁরই পূজা করা বাস্তবজ্ঞানের পরিচায়ক। অতএব ব্যাস শিবভক্ত হয়ে গেলেন, বৈষ্ণবের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে শিব-অনুগত হয়ে গেলেন ব্যাসদেব। শিব কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে (অথবা বলা যায় শ্রেণী স্বার্থকে সম্মান দিয়ে) বিষয়টিকে ভালভাবে নিতে পারলেন না। তিনি জানালেন

মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥

....

হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

অভেদে দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥

অতএব শিব জানালেন কাশীতে শিব ভিক্ষা পাবেন না। এই নির্দেশ ব্যাসদেবকে তিনদিন অনাহারে থাকতে বাধ্য করল। শেষ পর্যন্ত ব্যাসদেব কাশীবাসীকে অভিশাপ দিলেন :

কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥

ব্যাসদেবের চরিত্রের এই অ-নমনীয়তা তাঁর চরিত্রে অন্য মাত্রা এনেছে। ভারতচন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাস দাঁড়ালেন তার অর্জিত বিদ্যার সম্বল নিয়ে—অভিশাপ দিলেন কাশীবাসীকে—যে অভিশাপে 'ক্রমে তিন পুরুষের (কাশীবাসী) মোক্ষ না হইবে'। শুধু তাই নয় দেব-স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে দেবতা যে ভক্তকে পীড়ন করতে পারেন—ভিক্ষা বন্ধ করে তাকে অন্নহীন করে দিতে পারেন, ব্যাসের পরিণতি দেখিয়ে ভারতচন্দ্র দেব-চরিত্রের স্বার্থপরতাকে একেবারে অনাবৃত করে দিলেন।

এবার অন্নদাকে বাধ্য হয়ে আসরে নামতে হল সবদিক সামাল দিতে। আর কৃষ্ণচন্দ্রের উপাস্য দেবীকে দিয়েই যে সমস্যার সমাধান করতে হবে ভারতচন্দ্রের তা অজানা ছিল না। তবে তার মধ্যেও ভারতচন্দ্র দেবীর আচরণে অসঙ্গতিগুলো তুলে ধরেছেন। উপবাসী ব্যাসকে অন্ন দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন অন্নদা। বিনা স্বার্থে অবশ্য নয় কারণ অন্নদা জানেন তপস্যার বলে ব্যাসদেবের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব—তাই তাঁকে নির্বল করতে হবে। কাশীর অধিবাসী—যারা শিবকে মোক্ষের উপায়রূপে জানেন তাদের অভিশাপ দেওয়ার ব্যাপারটি শিব মেনে নিতে পারেন নি। তবু শিব ব্যাসের কাছে জানতে চাইলেন তপস্বী কে—আর তার ধর্ম কি হওয়া উচিত। শিব হয়তো আশা করেছিলেন ব্যাসদেব বলবেন শিব-পূজকই তপস্বী। কিন্তু ব্যাসদেব তপস্বীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিলেন যা শিবের পছন্দ না হওয়ারই কথা। ফলে শিবের আদেশ হল :

অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুন যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥

ব্যাস অবশ্য এখন অনেক পরিণত—তিনি জানেন অন্নপূর্ণাই পারেন তাঁকে শিবরোষ থেকে বাঁচাতে। তাই অন্নদাকে সন্তুষ্ট রাখতে উচ্চারণ করেন :

অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥

শক্তিমানের তোষামোদ করাই তখন যুগধর্ম। ভারতচন্দ্র সুকৌশলে ব্যাসের জবানীতে বাস্তবটিকে তুলে ধরলেন। এরপর ব্যাসদেবের একান্ত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটিও বেশ অভিনব :

পশুবুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥
পড়িনু পড়ানু যত মিথ্যা সে সকল।

সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥

অষ্টাদশ পুরাণ রচয়িতার এই আত্মবিদ্রুপ কি পরোক্ষে দেবীর প্রতি কটাক্ষ নয়! ভারতচন্দ্র এখানে পরোক্ষে ব্যাসদেবের জয়-ই সূচিত করেছেন—দেবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষের জয়। তোষামোদ-প্রিয় দেবী শেষ পর্যন্ত শিবকে শান্ত করে ব্যাসদেবকে বর দিলেন :

অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥

কাশী থেকে বিতাড়িত হওয়ার বিষয়টি ব্যাস মেনে নিতে পারেন নি—কারণ 'তেজোবধ হয় যার : প্রাণবধ ভাল তার : কোনখানে সমাদর নাই।' তাই ব্যাসদেব 'দ্বিতীয় বারাণসী' নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন। এ-বিষয়ে গঙ্গার সহায়তা তিনি আশা করেছিলেন, কারণ গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচারে তিনি ছিলেন সহায়ক। কিন্তু গঙ্গা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। ব্রহ্মাও জানালেন যে তাঁর প্রস্তাব অবাস্তব। ব্যাস কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে চান—তাঁর সাধনমন্ত্র :

যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীব পাতন॥

এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি শেষ ভরসা অন্নদার তপস্যায় রত হলেন। কারণ :

শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা॥
তদাবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড়॥

কিন্তু অন্নদা তো শিব-গৃহিণী। 'দ্বিতীয় কাশী' নির্মাণে ব্যাসদেবের সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ ব্যাসের তপস্যাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত ইতিকর্তব্য স্থির করে নিলেন—ব্যাসকে 'শাপ দিব বর দিয়া'; অতএব অন্নদার জরতী বেশ ধারণ এবং ছলনার সাহায্যে ব্যাসদেবকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন 'গর্দভ হইবে বুড়ি এখানে যে মরে'। ব্যাস দ্বিতীয় কাশী গড়তে চেয়েছিলেন এই আশা নিয়ে যে, এখানে মরলে সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষলাভ হবে—সে আশা আর পূরণ হল না। এরপর ব্যাসদেবের উদ্দেশে দৈববাণী হল :

ইতঃপর ভেদ দ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

আপাতভাবে দেখলে পরাজয়ই হয়েছে ব্যাসের। কিন্তু জরতী বেশে অন্নদার আসল পরিচয় জানার পর ব্যাসের অভিমানক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা :

শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্যদোষে হইল গর্দ্দভ বারাণসী॥

এই পরিণতির কাকে দায়ী করবেন ব্যাস? সম্ভবত কাউকেই দায়ী করেন নি—কারণ ব্যাস তো জেনে গেছেন কারোর ওপর আস্থা রাখার সময় তখন নয়—অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের সেই কালে মানুষ দেববাদ সম্পর্কে যে তীব্র সংশয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল

তারই প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাসের চরিত্রে। মানুষের মর্যাদা নিয়ে তিনি দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছিলেন—পারেননি, কারণ এই দেবতারা তো সমাজের সেই অংশের প্রতীক যারা মানুষকে মর্যাদা দেয় না। যারা সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের প্রতিপত্তি কায়েম করতে চায়। পুরাণের শর্ত মেনে ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবেকে 'দৈবাহত পুরুষ' করেছেন। কিন্তু কবির মনোগত অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম—তাই তিনি ব্যাসদেবকে উপলক্ষ করে দেবমহিমার নগ্ন রূপটিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন—সব ছাপিয়ে তাই সমগ্র ব্যাসপর্বে ব্যাসদেবের এই প্রতিবাদী প্রশ্নই শেষ পর্যন্ত রণিত হতে থাকে : 'কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া?' ব্যাসদেব আগাগোড়া আত্মসচেতন, আত্মসম্মানযুক্ত জ্ঞানী মানুষ হয়ে থাকতে চেয়েছেন—বস্তুত মধ্যযুগীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে তিনি নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাই তিনি হরি থেকে হরে এবং শেষে অন্নদায় যেতে পেরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি বুঝেছেন যে ক্ষমতাবানের ভজনা করারই যুগ সেটা। তবে ব্যাসের মাধ্যমে ভারতচন্দ্র যেটা বলতে চেয়েছিলেন সেটি বিদ্যাসুন্দর পালার একটি বিষ্ণুপদে উচ্চারিত হয়েছে :

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।

এটাই তো ছিল ব্যাসদেবের লড়াই।

অপ্রধান চরিত্র

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডের প্রধান তিনটি চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। অপ্রধান হলেও তিনটি চরিত্র—সতীর মা প্রসূতি, উমার মা মেনকা এবং সতীর পিতা দক্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু/চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

॥ প্রসূতি ও মেনকা ॥

পুরাণ অনুযায়ী প্রসূতি-কন্যা সতী বিনা আমন্ত্রণে পিতৃগৃহে উপস্থিত হন পিতা দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু সেখানে পিতা কর্তৃক শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞস্থলেই মত্যু বরণ করেন। পরের জন্মে সতী-ই হিমালয়-মেনকার সন্তান উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবের সঙ্গে বিবাহ হয়।

সতীর পিতৃগৃহে আসা কবির বর্ণনায় বিবাহিত বাঙালি-কন্যার পিতৃগৃহে আসার সঙ্গেই তুলনীয়। প্রসূতিকেও বাঙালি মায়ের আদলে গড়েছেন কবি—অনেকদিন অদর্শনের পর যে মা কন্যাকে দেখে আবেগে উদ্‌বেল হয়ে যান। সতী পিতৃগৃহে এসেছেন কৃষ্ণবর্ণা হয়ে, প্রসূতি আগের রাত্রে সতীর এই মূর্তি স্বপ্নে দেখেছেন—আর দেখেছেন ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তার আভাস। তাই প্রসূতির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে উৎকণ্ঠা আবার সস্নেহ ব্যাকুলতাও :

আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছে।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছে॥

প্রসূতি সতীর দেবস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—কিন্তু তবুও এক বাঙালি মায়ের মতোই প্রসূতি বলেছেন :

জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥

দক্ষের মৃত্যুর পর দক্ষের অন্যায়কে স্বীকার করেও তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে প্রসূতি বলেন 'ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী'। নারীর এই ট্র্যাজেডি প্রসূতির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন। জায়া এবং জননীরূপে প্রসূতি চরিত্র অল্প পরিসরে বেশ উজ্জ্বল।

এই কাব্যের আর এক দেবী চরিত্র উমা-জননী মেনকা। সতী উমারূপে জন্ম নিলেন হিমালয়-মেনকার গৃহে। নারদ এলেন উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে—স্বভাবতই তাঁরা এই বিবাহে রাজি হয়ে যান। এরপর উমা-জননী মেনকাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবাহ-সভায় স্ত্রী আচারের সময়। মেনকা আগে শিবকে দেখেননি—নারদের কথায় বিবাহে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহসভায় বৃদ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত শিবকে বর হিসেবে দেখে মেনকা বিরূপ হয়ে ওঠেন। এরপর মেনকার উপস্থিতিতেই শিব উলঙ্গ (নারদের কৌশলে) হয়ে পড়েন। এ সবের প্রতিক্রিয়ায় মেনকা প্রায় প্রাকৃত নারীর মতোই ভাষা প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবতই প্রথম কোপটি পড়েছে নারদের ওপর :

ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

এরপর হিমালয় দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মেনকার টার্গেট হয়েছেন স্বাভাবিক ভাবেই :

বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥

স্বামীকে দায়ী করার সময় মেনকার বোধহয় মনে ছিলনা যে উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে যখন নারদ হিমালয়ে উপস্থিত হন তখন তিনিও 'সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন (নারদের) পদ।' আসলে কোন কাজের ফল আশানুরূপ না হলে পতিব ওপর দোষ (যদিও সিদ্ধান্ত নেওয়া ব্যাপারটি দুজনেরই থাকে) চাপিয়ে দেওয়া নারীব একটি প্রবণতা। মেনকার চরিত্রেও আমরা এই প্রবণতা লক্ষ করলাম।

এই দুই জননী চরিত্র আমাদের খুব চেনা—বাঙালি ঘরের মা-রূপেই এঁদের এঁকেছেন কবি। এই মায়ের ছবি আমরা শাক্ত পদাবলীতেও পেয়েছি। এঁদের মধ্যে দিয়ে সে-যুগের বাঙালি পরিবারের কন্যাস্নেহতুরা সমস্ত জননীর মর্মবেদনা কবি রূপায়িত করেছেন।

॥ দক্ষ : সতীর পিতা ॥

দক্ষ আমাদের সহানুভূতি-বঞ্চিত—এর দুটি কারণ, শিব-বিরোধিতা ও দ্বিতীয়ত সতীর মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠা। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় দক্ষের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি জানানোর অবকাশ বোধহয় থেকেই যায়। যজ্ঞসভায় সতীকে দেখে দক্ষ জামাই শিবের নিন্দায় মুখর হয়েছেন সতীর উপস্থিতিতেই—যেটা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে এখানে সতীর পিতা হিসেবে নয়—এক উদ্ধত, অহংকারী, ক্ষমতাবান ব্যক্তি রূপে দক্ষ নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁব মুখে শোনা যায় :

বিধবা যখন হইবি তখন
অন্নবস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব॥

কিন্তু এর আগে দক্ষের উচ্চারণে একজন পিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ;

সতী ঝি আমার বিদ্যুত আকার
বাতুলের হৈল জায়া

আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালি।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমরা রহিল গালি॥

এখানে কন্যার দুরবস্থায় এক পিতার আক্ষেপই যেন বর্ণিত। নারদের কথায় পাত্র না দেখেই তিনি শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবেননি যে অন্নের অভাবে সতীর দেহ কালিবর্ণ হবে, বস্ত্রের অভাবে বাঘছাল পড়তে হবে এবং এ-সবের জন্যে নিজেকেই দায়ী করেছেন। দক্ষের এই অসহায় উক্তি সে-যুগের অসহায় পিতাদের—যাঁরা উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারতেন না তাদের কথাই মনে করায়।

অন্যান্য অপ্রধান দেব চরিত্রের মধ্যে **লক্ষ্মী, গঙ্গা** প্রমুখেরা প্রত্যেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগবৈশিষ্ট্যের ফসল। তাই গঙ্গা দেবী হয়ে অত্যন্ত অশালীনভাবে প্রাকৃত ভাষায় ব্যাসের সঙ্গে কলহ কবতে পারেন। লক্ষ্মী আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নাভাবের দিকটিকেই প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্মীর কাছেও শিব ভিক্ষা চেয়ে অন্ন পাননি। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষমতার খেলা চলছিল। ক্ষমতাবানের কৃপা না থাকলে সে-সময়ে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। লক্ষ্মীর প্রতীকে কবি এই সত্যই প্রকাশ করেছেন। অন্নপূর্ণা পৃথিবীর সব অন্ন কৈলাসে জমা করেছেন—লক্ষ্মীর ঘরেও তাই অন্ন নেই। নিজের অসহায়তার কথা স্বীকার করে লক্ষ্মী জানাচ্ছেন :

কহে শুন গৌরীপতী
কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি।

দেবী লক্ষ্মীও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-মহিমায় অবস্থার শিকার।

গৌরীর সখী **জয়া** এক বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্না বাঙালি নারী। তিনি পরামর্শ দেন গৌরীকে কিভাবে শিবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৌরী পুত্রদের নিয়ে পিতৃগৃহে যেতে চাইলে এই সংসার-অভিজ্ঞা নারীটি তাঁকে নিবৃত্ত করেন। বিবাহিত-কন্যা (পিতা-মাতার স্নেহ সত্ত্বেও) পিতৃগৃহে বেশিদিন সম্মান নিয়ে থাকতে পারে না। প্রথমত ভাই-এর বৌ ব্যাপারটি ভালভাবে মেনে নেয় না—এমন কি বাবা মাও একসময় নিস্পৃহ হয়ে যান। গৌরীর সমব্যাথী সখী হিসেবে পিতৃগৃহে গমনোদ্যতা গৌরীকে তাই নিষেধ করেন বাপের বাড়ি যেতে :

জননীর আসে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥

এইভাবে দেবখণ্ডের নানা চরিত্র তাঁদের বিচিত্র কার্যকলাপের দ্বারা *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অবশ্য দেবখণ্ডের চরিত্র হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের দেবমহিমা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। শিবকে তো অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়েছে। আসলে এঁরা সকলেই অষ্টাদশ শতকের যুগ-চিহ্ন বহন করায় কারও দেব-মহিমা অটুট থাকে

নি। প্রচ্ছন্নভাবে দেবমহিমা আরোপের একটা চেষ্টা সব সময় ছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে। তবে যে-কথাটি মানতেই হয় তা হল ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্বের কারণে এঁরা কেউ-ই বোধহয় পুরোপুরি 'type'-চরিত্রে পরিণত হন নি।

নরখণ্ডের চরিত্র

।। হরিহোড়-সোহাগী।।

প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয় কোন দেব-দেবীর পুজো মর্ত্যে প্রচলিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। যার জন্যে স্বর্গের দেবতা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন এবং পুজো প্রচলন করে শাপমুক্ত হয়ে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। *অন্নদামঙ্গল*-ও তার ব্যতিক্রম নয়। কুবের-অনুচর বসুন্ধর অন্নদাপুজোর জন্যে ফুল তুলছিল। কিন্তু চয়িত ফুলের মালা নিয়ে দেবী-পুজোর পরিবর্তে স্ত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে রতিরঙ্গে মেতে ওঠায় অন্নদার অভিশাপে হরিহোড় নামে মর্ত্যে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এবার যথারীতি মঙ্গলকাব্যধারার ঐতিহ্য মেনে হরিহোড়কে বরদানের পালা—দেবীর আশীর্বাদে হরিহোড় দারিদ্র্যমুক্ত হল।

দরিদ্র হরিহোড়ের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের এক সরল নির্লোভ মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অন্নপূর্ণা হরিহোড়ের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন ('হাসিয়া কহেন দেবী দেখরে চাহিয়া। বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া।। মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে। দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে।। কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে। শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে।।'—মনে পড়তে পারে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর কালকেতু-ফুল্লরার সামনে আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গ)। দেবীকে স্বরূপে দেখে হরিহোড় মূর্ছিত হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরলে হরিহোড় দেবীকে সম্বোধন করে বলে :

হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা।।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সংশয়ের আবহে দেবতার প্রতি এই আস্থা কবির মধ্যে যে আস্তিক সত্তা ছিল তারই পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। হরিহোড়ের ভক্তিপ্রাণতার সঙ্গে এক নির্লোভ মানুষের (সে যুগে যা দুর্লভ বললেই হয়) চিত্র পাঠকের সামনে ধরে দিয়েছেন কবি। হরিহোড় তাই অযাচিত ভাবে পাওয়া ঐশ্বর্যের দাতার স্বরূপ জানতে চায়—দেবী অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেন : 'হাসিয়া কহিলা দেবী সে হবে শেষে। কিছুদিন সুখ ভোগ করহ বিশেষে।।' এখানে কর্মশেষে—মর্ত্যে দেবীর পুজো প্রচলনের পর হরিহোড়ের পুনরায় স্বর্গে ফিরে যাবার ইঙ্গিত দিয়েছেন দেবী। কিন্তু ভারতচন্দ্র ছাড়বেন কেন—তিনি হরিহোড়কে দিয়ে বলিয়ে নিলেন :

চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা সমান।।
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে।।
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর।।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একেবারে নির্ভেজাল ভক্তিপ্রাণতা সম্ভব ছিল না, তাই ভারতচন্দ্র হরিহোড়ের মনের ক্ষীণ সংশয়টুকুকে কৌশলে প্রকাশ্যে আনলেন—আর তাতে চরিত্রটিও

বাস্তব হয়ে ওঠার অবকাশ পেল। হরিহোড় চরিত্র অবলম্বনে সমাজের বাস্তব চেহারাটি অন্যভাবেও দেখালেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র জানাচ্ছেন দেবীর কৃপায় হরিহোড়ের 'কোঠা' হয়েছে—আর বিপুল ধনের অধিকারী হওয়ার সংবাদে হরিহোড় ঘোষ বসু মিত্র—তিন মুখ্য কুলীনের কন্যাকে ভার্যা হিসেবে লাভ করেছেন। ধনলাভের পূর্বে কায়স্থ সমাজে তাঁর কোন মূল্যই ছিল না। এইভাবে হরিহোড় চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে সমাজের বাস্তব চেহারাটি দেখিয়ে দিলেন ভাবতচন্দ্র।

এবার সোহাগীর কথা একটু বলতে হয়। অভিশাপসহ বসুন্ধর তো মর্ত্যে এলেন, বিয়েও করলেন তিন কুলীন কন্যার সঙ্গে। স্বভাবতই বসুন্ধরার দুঃখ পাওয়ার কথা—দুঃখ প্রকাশও করে ফেললেন অন্নদার কাছে :

আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥

অতএব বসুন্ধরা বসুন্ধরের মর্ত্য-মানবী সোহাগীরূপে জন্ম নিল কোন্দল-স্বভাবের নারী ধুমীর গর্ভে। *অন্নদামঙ্গল* রচনার আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্নপূর্ণাকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের প্রশস্তি রচনা। এর জন্যে হরিহোড়ের গৃহ ছেড়ে অন্নপূর্ণাকে ভবানন্দের গৃহে যেতে হয়। দেবীর সখী জয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমতী—তিনিই হরিহোড়কে ছেড়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে বার করলেন। যে-গৃহে অশান্তি থাকে অন্নপূর্ণা সেখানে থাকেন না—হরিহোড়ের গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হল চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে সোহাগী আসার পর। যে-নারী স্বর্গে বসুন্ধরকে রতিসুখ দিয়েছিল তার পক্ষে মর্ত্যে তার স্বামী তিন স্ত্রী নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছে—এমন দৃশ্য দেখা কষ্টকর—স্বভাবতই তা ঈর্ষার জন্ম দেয়। আর ঈর্ষা থেকে কোন্দলের সৃষ্টি হয। ভাবতচন্দ্র তাই সোহাগীকে কোন্দল-পরায়ণা নারী রূপেই সৃষ্টি করলেন। সোহাগীর মা ভাঁড়ু দত্তের বংশের পুরুষ ঠক ঝাড়ু দত্তের স্ত্রী—'ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া'। এ হেন মায়েব কন্যা 'সোহাগী' স্বামীগৃহে এল—সঙ্গে এল লকলকি নামে দাসী—সোনায় সোহাগা। সোহাগী আর 'লকলকি' দাসী মিলেমিশে হরিহোড়ের গৃহকে নরকে পরিণত করলে .

কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
....
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥

চলে যাবার জন্যে একটা ছল তো চাই। অন্নপূর্ণা এ-বিষয়ে পুরোপুরি যুগের প্রতীক। তিনি হরিহোড়ের কন্যা হয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আগের দিন জামাই এসেছে কন্যাকে নিয়ে যাবার জন্যে। স্বভাবতই কন্যা চলে যাবে বলে হরিহোড়ের মন ভাল ছিলনা। এমন একটি ক্ষণ বেছে নিয়ে অন্নপূর্ণা :

অন্নপূর্ণা (কন্যার রূপ ধরে) বিদায় চাহিল সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুমদার ঘরে॥

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কন্যাকে দেখে হরিহোড় বুঝলেন ছলনা করে দেবী বিদায় নিয়েছেন—তখন হরিহোড়—

অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥

....

সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যকে এভাবেই কবি *অন্নদামঙ্গল*-এ জুড়ে দিলেন। তবে সোহাগীর চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন রেখেছেন কবি। হরিহোড় সোহাগীর সহমরণ আমাদের সচেতন করিয়ে দেয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। তাছাড়া এই শতকের আগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহে মঙ্গলকাব্যের চরিত্র রূপে শাপগ্রস্ত দেবতারা (নারী পুরুষ উভয়েই) মর্ত্যের পালা সাঙ্গ করে পুনরায় স্বর্গে ফিরেছেন—কিন্তু কোথাও সহমরণের প্রসঙ্গ উঠে আসেনি।

দ্বিতীয়ত ঘরে সতীন থাকলে কোন্দল যে অবশ্যম্ভাবী তা সোহাগীর আগমনেই প্রমাণিত হল। সোহাগীর মধ্যে দিয়ে 'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্যা'-র সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই কৌতুকের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কবি।

তৃতীয়ত যে-পুরুষকে (বসুন্ধর) রতিসুখ দিতে গিয়ে বসুন্ধরা স্বামীহারা হন তাঁকে মর্ত্যে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সুখে কাল কাটাতে দেখে বসুন্ধরার ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। সোহাগীরূপে জন্ম নিয়ে তাই তাঁর কার্যকলাপ যথেষ্ট বাস্তব—ভারতচন্দ্রের দক্ষ কলম সেই বাস্তবকে রূপায়িত করেছে। ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনায় এইভাবে সোহাগী এক অন্য নারী হয়ে উঠেছেন—মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই।

॥ নলকুবর-পদ্মিনী-চন্দ্রিণী • ভবানন্দ-চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখী॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে এঁদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দকে নিয়ে কবি স্বতন্ত্র খণ্ড রচনা করেছেন—এখানে কেবল ভূমিকাটুকু করে রাখলেন। তবুও স্বল্প পরিসরে নলকুবর চরিত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়িত জীবনযাত্রার ছবিটি একেবারে অনাবৃত করে কবি দেখালেন। যুবতীসঙ্গে কামবিহারে মত্ত নলকুবরকে ব্রাহ্মণ বেশী অন্নদা স্মরণ করিয়ে দিলেন এ-সময় রতিবিহারের সময় নয়—অন্নদা পুজোর তিথি। উত্তরে নলকুবর বলেছে ;

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥

....

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥

এরপরে জানিয়েছে :

জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥

আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥

ভয়ঙ্কর কথা—কিন্তু যুগের পরিচয়বাহী অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিহীন প্রাকৃত জীবনযাত্রার ছবিটি কবি নলকুবরের চরিত্রের আচরণ ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দেবীর ভূমিকাটিও বেশ প্রাকৃত। তিনি দেব মহিমা ভুলে ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী-কে আদেশ দিলেন নলকুবরকে ধরে আনতে। সেই কাজ সমাধা হলে অভিশপ্ত নলকুবর ভবানন্দ হয়ে মর্ত্যে জন্মালেন—যাঁর গৃহে দেবী অধিষ্ঠান করবেন। দেবীর কৃপাধন্য ভবানন্দ মজুমদার কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। দেবীকে ভবানন্দের গৃহে অধিষ্ঠিত করে কবি তাঁর দায় চোকালেন।

॥ ঈশ্বরী পাটুনী॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসু *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন : "বিরল ক্ষেত্রে কাব্যের শেষাংশ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ হয়। এখানে তাই হয়েছে।" দুটি কারণে এটা সম্ভব হয়েছে, প্রথমত ভারতচন্দ্র শেষ পর্যন্ত দেবীকে স্বরূপেই প্রকাশ করলেন। আর দ্বিতীয়ত, এখানে তিনি এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন যা সমগ্র মধ্যযুগে একক মহিমায় অবস্থিত—যার মধ্যে দিয়ে বাঙালির প্রাণের স্বপ্ন-কামনার প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুতই ঈশ্বরী পাটনী কবির অসামান্য সৃষ্টি।

দেবীর ভবানন্দ ভবনে যাত্রার সময় আমরা প্রথম ঈশ্বরী পাটুনীর সাক্ষাৎ পেলাম। দেবীকে নদী পার হয়ে যেতে হবে ভবানন্দ-গৃহে। সেই লক্ষ্য নিয়ে দেবী :

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥

বোঝাই গেল ঈশ্বরী পাটুনীর জীবিকা ছিল খেয়া পারাপার করা। জীবনকে ভালবাসলে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা যে কত গভীর হতে পারে এই চরিত্রটির ব্যক্তিভাবনায় তা ধরা পড়েছে। নির্জন খেয়াঘাটের সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবীকে দেখে ঈশ্বরী পাটনীর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর কল্পিত বর্ণনা দিয়েছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু : "সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকিনী "কুলকামিনী—গৃহত্যাগিনী কী? কেন? অপকর্মের উদ্ধত বা ভীত পদক্ষেপ তো নয়। দেখলেই কেমন ভাল লাগে, যেন ভক্তি হয়, মা বলতে ইচ্ছা করে, পরের ঘরে চলে-যাওয়া নিজের লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মেয়েটির কথা মনে পড়ে। অব্যক্ত ব্যথায় পাটনীর বুক টনটন করে ওঠে, সে আনমনা হয়ে পড়ে, আহা, না জানি শ্বশুরবাড়িতে সে কেমন আছে? এই মেয়েটিও নিশ্চয় যন্ত্রণা সইতে না পেরে গৃহত্যাগ করেছে।...পাটনীর কষ্টবোধ হতে থাকে।...পাটনী আবার চিন্তিতও হয়—মেয়েটিকে দেখে তো বড় ঘরের বউ মনে হচ্ছে।" (*কবি ভারতচন্দ্র*, প্রথম দেজ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২০০৭) এই চিন্তা থেকে, যাতে কোনরকম ঝামেলায় পড়তে না হয় তাই পাটুনী দেবীর পরিচয় জানতে চায়। দেবী দ্ব্যর্থক ভাষায় নিজের পরিচয় প্রদান করেন। সমাজ-অভিজ্ঞ পাটুনী সব শুনে মন্তব্য করে :

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥

পাটুনী-কথিত এই দুটি চরণের মধ্যে ধরা আছে বাঙালি নারী জীবনের জীবন-যন্ত্রণার অকথিত

কাহিনী। পাটুনীর অভিজ্ঞতায় এ-রকম ঘটনার স্মৃতি হয়তো আরও আছে। তাই সে বলে :

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল।

এর পরে দেবী ও পাটুনীর কথোপকথন—শহরীপ্রসাদ বসু যাকে 'দিব্য কাব্যনাট্য' বলেছেন। এই কথোপথনের মধ্যে পাটুনী চরিত্রের যেমন নানা দিকের প্রকাশ আছে, তেমনি আছে দেবী অন্নপূর্ণার স্নিগ্ধ রূপের অপরূপ ছবি। উদ্ধার করতেই হয় সেই সব অসামান্য পঙক্তিগুলি :

পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
[দেবী নৌকোর বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন]
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥

এখানে পাটুনীর চরিত্রে পিতৃস্নেহের (ঈশ্বরী পাটুনী স্ত্রী বা পুরুষ সে দ্বন্দ্বে আমরা যাচ্ছি না) একটা প্রচ্ছন্ন ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টি মাঝিরা দেখে—কিন্তু এখানে বিষয়টি একটু বাড়তি মাত্রা পেয়েছে। হয়তো পাটুনী দেবীর মধ্যে নিজ-কন্যার ছায়া লক্ষ করে থাকবে তাই বেশি সতর্কতা—দেবীকে সেঁউতির ওপব পা রাখতে বলায় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে। তবে কবির অন্য অভিপ্রায়ও ছিল। একটু পরেই তা বোঝা গেল

সেঁউতীতে পদ দেবী বাখিতে রাখিতে
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

দেবী প্রকাশিত হলেন তাঁব অপরূপ করুণাময়ী মূর্তিতে। আব পাটুনী বুঝল :

সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥

সুতরাং এবার তো বর চাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ—কারণ দেবী তো বলেছেন 'বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব'—কী বর চাইল ঈশ্বরী পাটুনী!

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

কালকেতু দেবীর কৃপায় ঘড়াঘড়া মোহর পেয়েছে, রাজা হয়েছে—সেখানেই হয়তো সে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে, এ কাব্যের হরিহোড়ও ধনসম্পদের পরিবর্তে জগজ্জননীর চরণাশ্রয় প্রার্থনা করেছে—হয়তো নিজের মোক্ষ লাভের উপায়ের কথা মনে রেখেই এই প্রার্থনা। ঈশ্বরী পাটুনীর কণ্ঠে কিন্তু উচ্চারিত হল অসাধারণ অথচ শতাব্দীর একান্ত বাস্তব প্রার্থনা : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। কেন এই প্রার্থনা—কারণ মানুষ তো তার সন্তানদের মধ্যে নিজের জীবনের, নিজের বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়—তাই উত্তরপুরুষের বিঘ্নহীন জীবন তাব কাম্য যা প্রতিফলিত হয়েছে পাটুনীর প্রার্থনায় : 'আমার সন্তান যেন থাকে

দুধে ভাতে'। খ্রিস্টধর্মেও এরকমই প্রার্থনার কথা আছে : 'Give us this day our daily bread.' অষ্টাদশ শতকে ঈশ্বরী পাটুনীর এই প্রার্থনার পৃথক তাৎপর্য আছে। অন্নের জন্য হাহাকার এই শতকে তীব্র হয়ে উঠেছিল। কবির আরাধ্য অন্নপূর্ণা সকলকে অন্ন জোগান। অন্নের সেই সংকটের কালে ঈশ্বরী পাটনী তার আপনজনের জন্য অন্নপূর্ণার কাছে তো অন্নের প্রার্থনাই করতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হয় ঈশ্বরী পাটুনীর এ-প্রার্থনায় প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণ বাঙালির আন্তন্তিক কামনা। সব মিলে তাই ঈশ্বরী পাটুনী সমগ্র মধ্যযুগে একক বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান।

আমরা চরিত্র আলোচনা করতে বসেছি—কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে চরিত্র-রচয়িতার কথা একটু বলে না নিলে এই আলোচনা পূর্ণতা পাবে না। শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন ভারতচন্দ্র কি হতে পারেন *অন্নদামঙ্গল*-এর শেষের এই কয় পৃষ্ঠা তার প্রমাণ। আমাদের মনে হয় ভারতচন্দ্র প্রকৃতই কি ছিলেন তারও হয়তো নিদর্শন শেষের এই কয়েক পৃষ্ঠা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন : 'বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অবস্থার এমন শুচিসুন্দর ছবি কোথায় পাব।...বাকচতুর ভারতচন্দ্র হারিয়ে গিয়ে পরিবর্তে কুলু কুলু পয়ার প্রবাহের আর এক ভগীরথ-কবিকে আমরা এখানে পাচ্ছি।'' যে-কবি ছায়াব মতো ঈশ্বরী পাটুনী ও দেবীকে অনুসরণ করেছেন—জননী নায়ের বাড়ে পা নামিয়ে বসলে যে-শোভা নদীতে দেখা গেল তা-ও ধরা পড়েছে কবির বর্ণনায় :

বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥

দেবী ও ঈশ্বরী পাটুনীর ছায়াসঙ্গী কবি ঈশ্বরী পাটুনীর প্রতি নিজের ঈর্ষাও (অবশ্যই সদর্থে) প্রকাশ করে ফেললেন :

যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে ঘরে পার॥

কবি আর নিজেকে অপ্রকাশিত রাখতে পারলেন না—বক্রতার কৃত্রিম আচ্ছাদন সরিয়ে ভক্ত-কবি নিজেকে প্রকাশ করে ফেললেন—সেই সঙ্গে দেখালেন বাঙালির চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের করুণাময়ী দেবীর মমতাময় মুখখানি। আর এভাবেই বোধহয় *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে (প্রথম খণ্ডে) কবিও এক চরিত্র হয়ে যান।

অন্নদামঙ্গল কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ

মঙ্গলকাব্যের বিকাশ তুর্কি আক্রমণোত্তর পালাবদলের পটভূমিতে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তখন নৈরাজ্যের মুখে অসহায়। এই অসহায়তাই এক সময় প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নতুন করে শুরু হয়েছিল আত্মসংরক্ষণের প্রক্রিয়া। ঐতিহ্য পুনরুত্থানের সচেতন প্রয়াস। আত্মহারা দেশ ও জাতিকে পূর্ব-ঐতিহ্যে সংস্থাপিত করতে পুরাণ-মনস্কতা প্রবল হয়েছিল। সমকালীন সাহিত্যে পৌরাণিক ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের কারণ এটাই।

মঙ্গলকাব্য রচনার উৎসে পৌরাণিক প্রেরণা এই ঐতিহ্যমুখিনতারই ফল। মুখ্যত দেবখণ্ড এবং অংশত নরখণ্ডকে আশ্রয় করে এর বিস্তার। ভারতচন্দ্র রাজসভাকবি এবং সংস্কৃত কাব্য-পুরাণে ছিল তাঁর বিশেষ অধিকার ; আর ছিল বৈদগ্ধ্য, রুচিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়বিলাসের পাশাপাশি এক অভিনব আধুনিক মন। তবু পূর্ব ঐতিহ্যের টানকে অস্বীকাব করতে পাবেননি তিনি। স্বভাবতই তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অংশে পুরাণ চেতনার অভিপ্রকাশ ঘটেছে নিখুঁতভাবে। পূর্বসূরির মতো তিনিও বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন। প্রথমেই **গণেশ বন্দনা** করেছেন। পুরাণে বিঘ্নরাজ গণেশ সম্পর্কে যে সংস্কার ও কাহিনী প্রচলিত আছে তাকে অবলম্বন করে শঙ্করাচার্য 'গণেশধ্যান' রচনা করেছিলেন :

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্মাদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্ ।।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরঃ শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদংকামদম্ ।।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশের 'গণেশ বন্দনা'-য়-এর হুবহু অনুসরণ ঘটেছে—

গণেশায় নমঃ নমঃ আদি ব্রহ্মনিরুপম
পরমপুরুষ পবাৎপর।
খর্ব স্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর ।।...

শিববন্দনা-য় দেখা যায় পৌরাণিক শিবের যে মহিমা স্কন্দপুরাণেব কাশীখণ্ডে নানা ভাবে বলা হয়েছে ভারতচন্দ্র সেগুলিকে যথাসম্ভব স্পর্শ করেছেন। যেমন তিনি সর্বরোগ-তাপ-শোক হরণকারী। তাঁর কৃপায় চতুর্বর্গদান সম্ভব। পৌরাণিক idea এখানে অক্ষুণ্ণ।

শঙ্করায় নমঃ নমঃ গিরিসুতাপ্রিয়তম
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রিনয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ।।
হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকরশেখর শঙ্কর ।।

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডের এক-পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে কেশবাদিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগাশ্চত শো ক্ষ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

অর্থাৎ 'সাতজন্মে আমি আজন্ম যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, মাকরী, সপ্তমী আমার সেই সকল পাপ, রোগ ও শোক দূর করুন।'

ভারতচন্দ্র **সূর্যবন্দনা**-য় সূর্যকে এই ভয় ও পাপ হরণকারী রূপে বন্দনা করেছেন :

বরাভয় কর ত্রিনয়ন ধর
মাথায় মাণিকবর
স্মরিলে তোমায় পাপ দূরে যায়
আসরে সদয় হবে।

বিষ্ণু বন্দনা-র শুরুতেই ভারতচন্দ্র লিখছেন :

কেশবায় নমঃ নমঃ পুরাণ পুরুষোত্তম
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদঘটা হৃদয়ে কৌস্তুভছটা
বনমালা নানা আভরণ॥

বিষ্ণু বন্দনার পর কবি দেবী **কৌষিকী-র বন্দনা** করেছেন :

কৌষিকী কালিকে চণ্ডিকে অম্বিকে
প্রসীদ নগনন্দিনী।
চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী॥

লক্ষ্মী-বন্দনা-য় 'রূপ গুণ জ্ঞান/যত যত স্থান/তুমি সকলের শোভা'...এই বর্ণনায় এসে মিলেছে বিষ্ণুপুরাণের ইন্দ্রকর্তৃক লক্ষ্মীস্তব, ব্রহ্মপুরাণের 'যদ্‌যদ্রম্যং সুন্দরং বা 'তত্তল্লক্ষ্মীবিজ্জৃম্ভিতম্' এবং কূর্মপুরাণের 'লক্ষ্মীশ্চারুরূপাণাম'-এর স্তব।

সরস্বতী বন্দনা-য় আঠার পুরাণের প্রসঙ্গ এনেছেন—

আগমের নানা গ্রন্থ আর যত গুণপন্থ
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত কবি সেবে অবিরত
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান॥

'বেদবিদ্যা তন্ত্র যন্ত্র, বেণু বীণা আদি যন্ত্র, নৃত্যগীতবাদ্যের ঈশ্বরী'—অংশে মিলিত হয়েছে বেদের 'সুনৃতানাং চেতংতী সুমতী নাম' অংশ। তন্ত্র ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সরস্বতীস্তোত্র-ও প্রভাব বিস্তার করেছে এই অংশে।

তবে বন্দনা-অংশে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে কবির অন্নপূর্ণা বন্দনা। বেদ ও পুরাণের এক অকৃত্রিম অভিন্ন দেবীকেই তাঁর মঙ্গলকাব্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গ্রহণ করেছেন কবি—

আগম পুরাণ বেদ না জানে তোমার ভেদ
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান॥
ঘটে কর অধিষ্ঠান শুন নিজ গুণগান
নায়কের পূর্ণ কর আশ।

বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তি হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া, তিনিই অন্নপূর্ণা। *অন্নদামঙ্গল*-এর

'গীতারম্ভ'-অংশে বিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্যকে ব্যক্ত করেছেন কবি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আবর্তে ঘনীভূত বিশ্বজীবনরহস্য। আর সেই রহস্যভেদেই মেলে মোক্ষসাধনার প্রকৃত পথের সন্ধান। এই মোক্ষতত্ত্বের মধ্যেই আছে শিব-শক্তিতত্ত্ব। দেবী অন্নপূর্ণার মহিমাকথায় তাই শিব-শক্তিতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কাহিনী আগাগোড়া মণ্ডিত হয়ে আছে পুরাণানুগ দেবতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ও মোক্ষতত্ত্বের আলোচনায়। এই সবক্ষেত্রেই সৃষ্ট হয়েছে পুরাণোক্তির প্রতিধ্বনিতে নিরন্তর আবর্তিত এক পৌরাণিক ভাবমণ্ডল। পুরাণে বন্দিত শিব :

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম্

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে শিব অভিব্যক্ত হয়েছেন এইভাবে :

মায়ামুক্ত তুমি শিব মায়াযুক্ত তুমি জীব
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।

'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' অংশে 'শিবশক্তি' তত্ত্বের মেলবন্ধন আরো স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল। বস্তুত এই অংশেই দেবখণ্ডের যথার্থ সূত্রপাত । সতীর দক্ষালয় যাত্রা বর্ণনায় শিব দেখছেন দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত দেবী জগতের সমস্ত বস্তুতে প্রতিবিম্বিত :

এ কি মায়া এ কি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥

ব্যাস-প্রসঙ্গে জরতীবেশে দেবীর ছলনায় ব্যাসের সর্বস্ব-পণ করা সাধনা বিফল হয়ে যাওয়ার পরও ব্যাসদেব দেবীর স্বরূপমায়ার যে পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন—

প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্মস্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥

সেখানে প্রতিধ্বনিত বিষ্ণুপুরাণের উক্তি 'হেতের্ভূতমশেষস্য প্রকৃতি পরমামূলে'। শিবশক্তি যে এক ও অভিন্ন, শিববিরোধী দ্বিতীয় কাশীনির্মাণের সাধনায় আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ যে পাওয়া যায় না, দেবীমায়া যে অশেষ অপার, এবং দেবীকৃপাসংযোগ ছাড়া যে জগতের কোনো ক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না—এই উপলব্ধি ব্যক্ত করলেন ব্যাসদেব :

বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥

পুরাণান্তর্গত শিবকথিত আত্মস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্যাখ্যায় এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়...

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ
শক্তিযুক্তো যদা দেবী শিবোহহং সর্বকামদঃ॥

হরগৌরীর রঙ্গবিলসিত প্রমোদকাম কথোপকথনেও এভাবেই পুরুষ-প্রকৃতির অদ্বয়তত্ত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে :

হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যে মোক্ষতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। ব্যাসদেবের সমস্ত উপদেশ ও দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সাধনায় মূল লক্ষ্য ছিল মোক্ষলাভ। সেই মোক্ষের কথায় ব্যাস যখন বলেন—'মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম' তখন কাশীখণ্ডের ব্যাসোক্তিই স্মরণে আসে—'একঃ কামপ্রদশ্চক্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোহচ্যুতঃ'। একদিকে অধ্যাত্ম রামায়ণের কথার প্রতিধ্বনি করে ব্যাস যেমন বলেন, 'কাশীতে মরিলে জীব : রাম নাম দিয়া শিব : কত কষ্ট মোক্ষ দেন শেষে।' তেমনি

কাশীখণ্ডের বচন উদ্ধার করে বলেন, 'তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে'। এমন যে মোক্ষস্থান কাশী তার মাহাত্ম্যগাথা রচনা করেছেন ভারতচন্দ্র 'শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞানবাণী কূলে রয়ে, সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না যাব।' অকৃত্রিম ভক্তিরসাশ্রিত এই চরণে সুস্পষ্ট অনুরণন শোনা যায় 'মৃগেন্দ্র আগম'-এর বাণীর : 'নিরন্তরং শিবোঽহমিতি ভাবনাপ্রবাহেন শিথিল পাশ তয়া গত পশুভাব উপাসকঃ শিব এব ভবতি।'

এই দেবশ্রেষ্ঠ শিব, দেবখণ্ডকাহিনীর মূল দেবতা এবং দেবী স্বয়ং অন্নপূর্ণা—উভয়ই অনিঃশেষ গুণ বৈচিত্র্যে ভূষিত। বিশেষত শিব চরিত্র, পৌরাণিক ও লৌকিক—দুই বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে দ্যোতিত। আর্য ও অনার্য দ্বিবিধ গুণসংমিশ্রণে রচিত শিব। পৌরাণিক ত্রিদেবতার মধ্যে তাই বৈপরীত্যের মিশ্রণে সর্বাধিক জটিলস্বভাব দেবতা। ভারতচন্দ্রও অনুরূপভাবে যেমন তাঁর লৌকিক রঙ্গ-পরিহাসময় জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি তাঁর পৌরাণিক মহিমাও অনবদ্যভাবে স্ফুরিত করেছেন। দক্ষের শিবনিন্দায় শিব চরিত্রের যে পরিচয় পরিস্ফুট ব্যাজস্তুতি অলংকারের মহিমায় তার প্রায় সমস্তটাই স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে বর্ণিত দক্ষের শিবনিন্দার অনুরূপ। ব্যাসকৃত শিবনিন্দা, 'যত অমঙ্গল সকল মঙ্গল তাহারে বেড়িয়া ফিরে'—এই উক্তি কাশীখণ্ডের

ডমড্ডমরুকবপ্রহস্তাগ্রঃ খণ্ড চন্দ্রভৃৎ
তাণ্ডবাড়ম্বররুচির সর্বামঙ্গলবেষ্টিতঃ।। উক্তির অনুরূপ

এ হেন শিব যখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ স্বামী, চণ্ডী স্ত্রীর প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতায় ভিক্ষায় বহির্গত—তখন তাঁর লৌকিক রূপটি চমৎকার ফুটেছে .

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।

তবু তখনও সব লৌকিক দেবস্বভাবের আবরণ ভেদ করে পৌরাণিক মহিমান্বিত শিব, ক্ষুধাদীর্ণ কণ্ঠে হলেও চিৎকার করে ঘোষণা করেন চৈতন্যের মহিমা :

চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ।।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় ভগবান কৃষ্ণ এমন কথাই শুনিয়েছিলেন অর্জুনকে :

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যান্নাত্মনি তুষ্যতি।।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'শিব-ব্যাসে কথপোকথন' প্রসঙ্গের প্রথমাংশ পুরোপুরি স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে নেওয়া। কিন্তু উত্তরাংশে ব্যাসের 'কাশী নির্ম্মাণো'দ্যোগের ও ব্যর্থতার চিত্রণে কবি তাঁর প্রতিভা ও কল্পনার মৌলিকতা দেখিয়েছেন। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদের প্রতি ব্যাসের উপদেশ :

সত্য সত্য এই সত্য আরো সত্য করি।
সর্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্বদেবে হরি।।
বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে।।

এই অংশে অবিকল প্রতিধ্বনিত হয়েছে কাশীখণ্ডের ব্যাসকথিত উপদেশ :

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ।
ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ।।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণেষু চ ভারতে।
আদি মধ্যাবসানেষু হরিরেকোহত্র নাগরঃ।।

অতঃপর নন্দীর ক্রোধে ব্যাসের ভূজস্তম্ভ ও বাক্‌স্তম্ভ বর্ণনায় কাশীখণ্ডের-ই বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন কবি। ব্যাসের এরূপ দুর্গতিতে অলক্ষ্যে বিষ্ণু এসে ব্যাসকে তিরস্কার করলেন। বাক্‌স্তম্ভ দূর করে আদেশ দিলেন শিবস্তুতি করতে ... 'ইদানীং স্তুহি তং শম্ভুং যদি মে শুভমিচ্ছসি'। ব্যাসের তপস্যায় তুষ্ট নন্দী তাঁর ভূজস্তম্ভ দূর করলেন। এবার গোঁড়া শিবভক্ত হয়ে উঠলেন ব্যাসদেব।

তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস।।
মুছিয়া ফেলিলা হরিমন্দির তিলকে।
অর্ধচন্দ্রফোঁটা কৈলা কপাল ফলকে।।

কাহিনীর এই স্থানে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন ভারতচন্দ্র। কাশীখণ্ডে শিব অতঃপর ব্যাসের শিবভক্তিব গভীবতা পরীক্ষা করার জন্য তার ভিক্ষা বারণ করেছিলেন কাশীতে। কিন্তু ভারতচন্দ্র ব্যাসের ভিক্ষা বারণের কারণ দেখিয়েছেন তাঁর ধর্মীয় গোঁডামিকে। শিব বললেন, 'দেখ দেখ অহে নন্দী ব্যাসের দুর্দ্দৈব। ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হৈল গোঁড়া শৈব।।' সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদী কবির কাব্যে শিব আরও বললেন 'মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি। আমি তো তাহার পূজা গ্রহণ না করি।।' .. 'হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।।' অবশ্যই কবির এই উক্তিগুলি নিজস্ব কল্পনা নয়। কাশীখণ্ডে, শিবপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে এই অভেদবাণী ঘোষিত হয়েছে। যেমন *শিবপুরাণ*-এ শিবকর্তৃক কথিত হয়েছে :

মমৈব হৃদয়ে বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ে হ্যহম্।
উভরোন্তরং বো বৈ ন জানাতি মনো মম।।

কিন্তু মহাজ্ঞানী ব্যাসের এ সময়ে এমনই মোহ উৎপন্ন হয়েছে যে, অহংকারে অভিমানে তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রকে বারংবার পরিবর্তন করতেও যেন প্রস্তুত। তাই ভিক্ষা না পেয়ে বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ শিব 'চেত রে চেত রে চিত' বলে অধ্যাত্ম-চৈতন্যের জয় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু উপবাসী ব্যাস ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে অহংকারমত্ততায় কাশীতে শাপ দিলেন :

তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ।।
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী।।
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে।।
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে।।

এই শাপের সমস্তটাই কাশীখণ্ডের অবিকল প্রতিধ্বনি।...

যদ্যন্যত্রার্জ্জিতং পাপং তৎ কাশীদর্শনাদ ব্রজেৎ।

কিন্তু এরপরও ব্যাস ভিক্ষা পেলেন না। তিনদিন উপবাসী ব্যাস যখন ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ক্ষিপ্ত তখন দেবী অন্নপূর্ণা স্বয়ং ব্যাসের কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর গৃহে অতিথি হবার

আমন্ত্রণ জানালেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ ব্যাস 'কাশীখণ্ডে' কথিত ভাষাতেই সপ্রসন্ন বন্দনা করলেন দেবীকে :

শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে কেবা অন্ন দেই॥

কাশীখণ্ডে ব্যাস বলেছেন—'বারাণস্যাঃ কিমথবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্বম্। কিংবা নির্বাণলক্ষ্মীস্ত্বং যা কাশ্যাং পরিগীয়তে॥'

ব্যাস অতঃপর গেলেন অন্নপূর্ণাভবনে। সেখানে পরম পরিতোষ সহকারে আহারের পর শুরু হল বৃদ্ধবেশী শিবের সঙ্গে কথোপকথন। ভারতচন্দ্র দেবীর পরিবর্তে শিবের মুখেই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন :

তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম তার।
কি কর্ম করিলে পায় পরলোকে পার॥

ব্যাসদেব উত্তরে সৎ জীবনযাপনের কথা বলে সন্ন্যাসকেই শ্রেষ্ঠ তপস্যা বললেন, 'তপস্যার নানাভেদ প্রধান সন্ন্যাস'। তখন ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন ব্যাসকে শুভবুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন করাতে শিবের ভূমিকা এবং সমন্বয়ধর্মে স্থিত করতে শিবের ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত হল :

কি মর্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
....
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এইক্ষণে বারাণসী হইতে দূর হও॥

—সর্বত্রই কাশীখণ্ডের অনুসরণ। এরপর ভারতচন্দ্রের নিজস্ব কাহিনী কল্পনা।

'কাশীপরিক্রমা' নামে এক অর্বাচীন গ্রন্থে ব্যাসকাশী নির্মাণের এবং অন্নদার ছলনার যে ইঙ্গিত আছে ভারতচন্দ্র সেই সূত্র থেকে কিছু রসদ সংগ্রহের পাশাপাশি স্বকীয় উদ্ভাবনা ও সংযোজনার ওপরেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ব্যাসচরিত্র নির্মাণে অপমানিত ও বিতাড়িত ব্যাসদেবের চরিত্রায়ণে আধুনিক ব্যক্তিত্বের আত্মাভিমান পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সংকল্প নিয়ে ব্যাসদেব গঙ্গার কাছে গিয়ে তাঁর যে স্তব করলেন, কিংবা ব্যাসের প্রতি গঙ্গার বক্রকটাক্ষপাতে কাশী ও কাশীনাথের যে গুণাবলী কথিত—সেই সব ক্ষেত্রেই পুরাণানুসরণ ঘটিয়েছেন কবি। অন্যদিকে ব্যাসকৃত গঙ্গা তিরস্কার এবং গঙ্গাকৃত ব্যাস তিরস্কার উভয়ই মহাভারতকথার ছায়াবলম্বনে তির্যক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস। অতঃপর ব্রহ্মা যখন ব্যাসকে স্নিগ্ধকথায় বুঝিয়ে শান্ত করার সময়ে বলেন, 'অন্যের যে অমঙ্গল তারে সে মঙ্গল', তখন প্রতিধ্বনি শোনা যায় পাশুপাত সূত্রের বাণীর :

ক্বচিৎ অমঙ্গলং মঙ্গলং ভবতি।

অবশেষে জরতীবেশিনী অন্নদার ছলনায় ব্যর্থ, সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব, তপোধন ব্যাসদেব মর্মান্তিক দুঃখে যখন—

শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥

বলে ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে প্রস্থান করলেন শ্রান্ত শূন্যতায় তখন এক নতুন পৌরাণিক

মহিমা যুক্ত হল ব্যাসের ট্র্যাজেডিতে ব্যাসকাহিনীর রসপরিণাম অন্যতর মাত্রা পেল। নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করা যায় না। মহাজ্ঞানী ব্যাসের এই মোহ যেন নিয়তিরই খেলা। সে খেলায় হেরে গিয়ে ব্যাসদেব প্রমাণ করলেন দেবমহিমার গুরুত্ব ও বিরাটত্ব।

দেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের যে দুটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী মঙ্গলকাব্যিক রীতিবদ্ধতায় এ-কাব্যে এসেছে তার মূলেও আছে পৌরাণিক হস্তক্ষেপ। মর্ত্যের হরিহোড় আর ভবানন্দ মজুমদার যথাক্রমে কুবেরের অনুচর বসুন্ধর এবং পুত্র নলকুবর। ঐশ্বর্যমত্ততা ও কামোন্মত্ততার দরুণ তাঁদের অভিশপ্ত করার পূর্বসূত্র কবি পেয়েছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের যমলার্জুন আখ্যান থেকে। হরিহোড়ের কাহিনীতে অতি অল্প পরিসরেই তাই দেবীপূজা প্রচার অসঙ্গতি দোষে পীড়িত হয়নি। পূর্ণ পৌরাণিক সঙ্গতি রেখেই দেবী ঘোষণা করতে পেরেছেন অন্নপূর্ণা স্তোত্রের কথা :

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটি মুটা ধর যদি সোনা মুটা হবে॥

দেবীপূজা প্রচারিত হয়েছে দীন দরিদ্র থেকে অভিজাত সমাজে। হরিহোড়, ঈশ্বরী পাটুনি থেকে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে। পুরাণ-চেতনায় সমৃদ্ধ কবি লোকজীবনেরও নিপুণ কথাকার। তাই আরাধ্যা অন্নদা পৌরাণিক আবহে স্নান করেও গণজীবনের বন্দিতা হয়ে রইলেন।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে লোক উপাদান ও লোক ঐতিহ্য

অন্নদামঙ্গল কাব্যে পুরাণের প্রভাব মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে একেবারে যথাযথ। তবু ভারতচন্দ্র প্রচলিত সাহিত্যধারায় অন্য সুর সংযোজন করে স্বাদ বদলালেন কাব্যের—'নূতনমঙ্গল' নামে তাই তিনি তাঁর কাব্যকে চিহ্নিত করলেন। দেবতার কথা, দেবতার জীবন মানুষের ছায়ায় মানবপ্রতিম হল। স্বভাবতই পৌরাণিক ঐতিহ্যের পালনীয় আচারটুকু মেনে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে কবি সঞ্চারিত করলেন প্রচলিত লোকজীবনের ধারা। এই কাব্যের প্রথম খণ্ডে লোক-ঐতিহ্যের কাছে কবির বার বার ফিরে যাওয়া তাঁর লোকজীবনগত ইহমুখিনতাকেই প্রমাণ করল।

'লোক' এবং 'ঐতিহ্য'—এ দুইয়ে মিলেই গড়ে ওঠে 'লোকঐতিহ্য'। এই 'লোক' বিশেষ কোন ব্যক্তি মানুষ নয়, বরং এর আড়ালেই লুকিয়ে থাকে এক বৃহৎ লোকসমাজ। এখানে ব্যক্তি গৌণ সমষ্টিই মুখ্য। অন্যদিকে ইংরেজি Tradition শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দটি। ঐতিহ্য হল প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত ধারণা, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদির হস্তান্তর। তা হস্তান্তরিত হয় মুখে-মুখে, আচারে-ব্যবহারে, এবং একে আয়ত্ত করতে হয় চেষ্টাপ্রসূত অনুকরণের দ্বারা। তবে ঐতিহ্য শুধুমাত্র অতীতসর্বস্ব নয়, তা একাধারে Temporal এবং Timeless.

এই লোক-ঐতিহ্যকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) বস্তুকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(খ) বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(গ) বিশ্বাস-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(ঘ) অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(ঙ) ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

(চ) লিখন বা অঙ্কনকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য।

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডকে অবলম্বন করে এই বিবিধ লোক ঐতিহ্যের প্রকাশ আমরা দেখব।

ক. বস্তুকেন্দ্রিক-লোকঐতিহ্য :

জীবন ধারণের উপযোগী বহু বিচিত্র বস্তুসম্ভার এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন—

(১) খাদ্য-পানীয় : *অন্নদামঙ্গল* রাজ-সভাকাব্য হয়েও দরিদ্র মানুষের অন্নবাসনাকে সঠিকভাবে প্রকাশিত করেছে। এর প্রথম খণ্ডে আসন্ন মন্বন্তরমুখী ক্ষুধাতুর চরিত্রগুলোর বুভুক্ষা এবং তার থেকে মুক্তির স্বপ্নের মধ্যেই ঐ বিশেষ অর্থনৈতিক সংকটকালে বাংলার বৃহত্তর জনমানসের সাধারণ খাদ্যতালিকার হদিস পাওয়া যায়।

এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥

কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥

—একসময় অন্নদা শিবকে অন্নদান করেছেন। উপবাসী শিবের স্বপ্নের আহার্য তালিকায় আছে :

সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা।।
....
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া।।
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া।।

সাধারণ খাদ্য-পানীয়ের পাশাপাশি নেশাগ্রস্ত শিবের প্রয়োজনের তালিকায় ছিল পোস্ত, আফিম ভাঙ :

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল।।

'সিদ্ধি'—কাব্যের প্রথম খণ্ডে স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। ভারতচন্দ্র কাব্যের দুটি অংশের নাম রেখেছেন যথাক্রমে 'সিদ্ধিঘোটন' ও 'সিদ্ধিভক্ষণ'।

(২) গৃহস্থালি দ্রব্যাদি : অনাহারী মানুষের গৃহস্থালি শুধু মাথা গোঁজার একফালি আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘব বানাতে লাগে সামান্য কাঠ, খড় এবং বিস্তর পাতা। ঘুঁটে কুড়িয়ে যাদের জীবন চলে, বাড়ির মাটির দেওয়াল সেই ঘুঁটের আলপনাতে সেজে উঠত নিজেই ·

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে।

—আর এমন বাড়িতে সম্ভার বলতে গুছিয়ে রাখা কাঠ আর ঘুঁটে :

কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া।
আর বাছা না পারি বহিতে।

(৩) পরিধান-প্রসাধন : *অন্নদামঙ্গল*-এ যখন 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গলে'র সম্পদেব স্ফীতি বর্ণিত হয় তখন তার ভাষা হয় একরকম—প্রসাধনও তাই। কিন্তু তা যখন প্রথম খণ্ডের মত দুস্থ লোকজীবনের নির্ভেজাল দলিল হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় অন্নদার আসন্ন কৃপা-পুষ্ট হতে চলা পদ্মিনীর বেশবাস—

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উঠে গায়।।

—সে নিজেও বলে এয়োতির চিহ্ন বলতে তার একগাছি লোহা ছাড়া কিছু নেই। পদ্মিনী নামের চিহ্ন একবিন্দু অবশিষ্ট নেই তার। তাই তার ব্যঙ্গোক্তি—

পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী।।

অবশ্য 'অন্নদার মোহিনীরূপ' অংশে কবি সমৃদ্ধির চমৎকার ঘটিয়েছেন। 'মণিময় আভরণ', 'রতন কাঁচুলি শাড়ী', মুক্তাসজ্জিত তনু-বিকরণে অন্নদা এখানে মোহময়ী।

(৪) যানবাহন : দূরে যাত্রার জন্য এবং সেই সঙ্গে চারপাশের পরিবেশ আর মানুষকে জানতে লোকসমাজ উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন প্রস্তুত

করেছে। এগুলিকে বলা যায় 'লোকযান'। এই লোকযান দু-ধরনের—স্থলযান ও জলযান। 'স্থলযানে'র মধ্যে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি এবং পালকির বহুল ব্যবহার দেখা গেছে। প্রথম খণ্ডে হিমগিরির কন্যার সঙ্গে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গে এসেছে বরবেশী মহাদেবের বলদবাহনের কথা।

বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এল বর ভূতনাথ॥

—আর অন্নদার ভবানন্দভবনে-যাত্রা প্রসঙ্গে এসেছে জলযানের কথা। গঙ্গার তীরে উপনীত অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর খেয়ায় নদী পারাপার করেছেন। ক্ষুদ্র সেই ডিঙ্গিতে স্থান সংকুলানের অভাব ছিলই। তাই ঈশ্বরী সাবধান করেছে অন্নদাকে।

(৫) বাদ্যযন্ত্র : দৈনন্দিন জীবনচর্যার বাইরে আমোদ-প্রমোদ তথা অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রেও লোকসমাজ তার সৃজনীশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে নানান বাদ্যযন্ত্র। আলোচ্য কাব্যে এই সূত্রে পাওয়া যায় বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রের নাম। ডমরু, পিনাক, শিঙ্গা ইত্যাদি।

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা।
বাজত ডমরু পিনাক রসালা॥

খ. বাককেন্দ্রিক লোকঐতিহ্য

লোকজীবনচর্যার যে সমস্ত উপকরণ মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই জীবিত আছে সেগুলি বাক্-কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের "জন্ম যেমন মুখে মুখে, পূর্ববর্তী সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে, এক দেশ বা সমাজ থেকে অন্য দেশে বা সমাজে, তার প্রচারও তেমনি মুখে মুখেই হয়ে থাকে।" ছড়া, প্রবাদ, কথা, ধাঁধা, গীতি, গীতিকা প্রভৃতি বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের অন্তর্গত।

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্য মূলত প্রবাদকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে। এই সব প্রবাদের স্রষ্টা স্বয়ং কবি। সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এগুলির জন্ম।

প্রবাদ হিসেবে স্বীকৃত চরণ বা পঙক্তির সংখ্যা অগণন। তার মধ্যে দু-একটি—

ক. ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার।
খ. লোহা যেন হেম হয় পরশ-পরশে॥
গ. ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে না পাবে॥
ঘ. মাটি মুটা ধর যদি সোনা মুটা হবে॥
ঙ. অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥

বাক্‌কেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'লোককথা'। লোককথা মানে লোককাহিনী বা মুখে মুখে প্রচলিত গল্পের ধারা। একে বলা যায় মৌখিক কথাসাহিত্য। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথমখণ্ডে শিবের বিবাহযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভূত-প্রেত ইত্যাদি উপকরণের সমবায়ে 'লোককথা'-র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কবি।

শিবের সঙ্গে উমার পরিণয়ের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। মহাদেব সঙ্গীসাথী নিয়ে যাত্রা করলেন হিমালয়ে উদ্দেশে। বরযাত্রীদের মধ্যে দেবতা-ভূত-প্রেত সকলেই আছেন। কিন্তু

ভূত-প্রেতের প্রমত্ত উল্লাসের ঠেলায় শেষপর্যন্ত দেবতারা সরে পড়লেন। এদের উল্লাসবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখছেন :

ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্প ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো
থাবায় থাবায় মশাল নিবায়
আন্ধারে শোভিল ভালো॥

বেশ কৌতুককর আবহ রচিত হয়েছে এই অংশে।

গ. বিশ্বাস-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোক-ঐতিহ্যের প্রয়োগ :

লোক-বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি প্রভৃতি লোকজীবনের বিভিন্ন দিকগুলি এ-শাখার অন্তর্গত।

(১) বিশ্বাস-সংস্কার অবশ্য ব্যক্তিগত নয় গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দীর্ঘ ঐতিহ্যের দ্বারা লালিত। এ-বিশ্বাসে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কার্যকরী না হওয়ায় এর সত্যাসত্য নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে (১ম খণ্ড) ভারতচন্দ্র দুঃখের-আভূষণে সজ্জিত হরগৌরীর গৃহস্থালিতে বেদনা, অশ্রু, বঞ্চনা আর অনশনের অনিবার্য-পরিণতি দাম্পত্য-কলহে—এই লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখিয়েছেন। বিষের-জ্বালার চেয়ে বড় খিদের জ্বালা—নীলকণ্ঠ মহাদেব ক্ষুধাভগ্ন কণ্ঠে স্ত্রীর সঙ্গে কলহে মেতেছেন। পারস্পরিক বাক্যবিনিময়ের মধ্যে সক্রোধে বেরিয়ে এসেছে লোক-বিশ্বাসের এক-একটি দিক :

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
... ...
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর॥
... ...
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥

(২) বিশ্বাস-সংস্কার ছাড়া এখানে প্রথা-লোকাচারের বিষয়টিও এসে যায়।

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু সমাজের এই বহিঃরূপান্তরের অন্তরালে সামাজিক আন্তর-সত্তার একটি মূলগত ঐক্য লক্ষ করা যায়। সমাজদেহে সঞ্চালিত মানব-আচরণের একটি প্রায় স্থায়ী আদর্শের জন্যই এই ঐক্য সৃষ্টি হয়। এরই নাম 'প্রথা'। এই প্রথার নানাবিধ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে একটি হল লোকাচার। যে-কোনো প্রথার লোকাচার হিসেবে পরিগণিত হওয়ার প্রধান শর্ত হল কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সংযুক্তি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'শিববিবাহ' অংশে মা মেনকা ও তাঁর সঙ্গিনী এয়োগণকে দিয়ে জামাতা বরণের সময় এ হেন লোকাচারের ছোঁয়া পাওয়া যায় :

শিব গোত্র শম্ভু শৰ্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
... .
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া॥...

ঘ. **অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক এবং (ঙ) ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোক ঐতিহ্য :**

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথমখণ্ডে শিবনৃত্য, নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতির ভূতনৃত্য কিংবা 'রাঙ্গাচিঙ্গা' বালকদের শিবকে ঘিরে নানাবিধ কৌতুক ক্রীড়ায় এই ধরনের লোক-ঐতিহ্যের ধাবা অনুসৃত হয়েছে।

এইসব নানাবিধ লোক-ঐতিহ্যের উপাদানসমবায়ে ভারতচন্দ্রেব কাব্যে লোকজীবন স্পষ্টতা পেয়েছে। একদিকে হর-গৌরীর কলহ-বিবাদে তৎকালীন বাংলাব লোকজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে—নিষ্কর্মা উদাসীন স্বামী, অভাবে জর্জ্জরিতা স্ত্রী আর সেই সঙ্গে বাউন্ডুলে কতগুলো ছেলে-মেয়ে—একবেলা আহার জোটে তো আরেক বেলা জোটেনা—বাঙালির সংসারের এ অতি বাস্তব ছবি—অন্যদিকে ঈশ্বরী পাটনীর মতো লোকচরিত্র। খেয়াঘাটের মাঝির দিনগুজরানের সামর্থ্য অতি ক্ষীণ। অনাহারে অর্ধাহারে কোনোক্রমে দিনাতিপাত। একদিন ছদ্মবেশিনী অন্নদার তাঁর নৌকায় পদার্পণ। ভাঙা কাঠের সেউতির সোনাব কাঠামোয় রূপান্তর। তবু ব্যক্তিত্বে অবিচল ঈশ্বরী। সেধে কিছু চায়নি দেবীর কাছে। শেষপর্যন্ত অন্নদার অনুরোধে তার প্রার্থনা :

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

যে ঈশ্বরী পাটনীর ভাঙা নৌকা দিয়ে অবিরাম জল ওঠে, নৌকাটুকু ভেঙে গেলেই যার রুজি-র পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই পাটনী দেবীকে নাগালের মধ্যে পেয়েও রাজ-ঐশ্বর্য বা পরকালের স্বর্গসুখ কামনা করে না। তার প্রার্থনা—ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষের সুরক্ষিত জীবন। সন্তানের জন্য দু'বেলা দুমুঠো অন্নপ্রার্থনা—দেবীর কাছে ঈশ্বরীর এই বর প্রার্থনা আসলে তৎকালীন লোকসমাজের দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত প্রতিটি অভাবী মানুষের প্রার্থনা—অফুরন্ত চাহিদার শক্তিটুকুও যাদের লোপ পেয়ে গেছে।

লোক ঐতিহ্যের শ্রেণীগত বিভাজনে যে-সব লোকজীবনের ছবি কাব্যে আছে সেগুলি আলোচিত হল। কিন্তু এ-ছাড়াও লোক-জীবনের আরও ছবি আছে যেগুলি কবির লোক-জীবন সম্পর্কে নিবিড় অভিজ্ঞতার নিদর্শন। হর-গৌবীর কোন্দলের যে ছবি এঁকেছেন তাতে মনে হয় একটি আস্ত দরিদ্র-পরিবারকেই কাব্যে তুলে আনা হয়েছে—পাত্র-পাত্রীদের চলাফেরা, অঙ্গ-ভঙ্গি সবই যেন চলচ্চিত্রের চলমান ছবির মতো। ক্ষুধার্ত শিব, যার 'ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ'—তিনি

সংসারের ওপর তিত বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলেন 'আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ। কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ॥' আর এর জন্য দায়ী করেন অবশ্যই ঘরনিকে, কারণ 'গৃহিণী ভাগ্যেব মত পাইয়াছি চণ্ডী॥' অন্য গৃহস্বামীদেব শিব ঈর্ষাও করেন, কাবণ 'আর আব গৃহীর গৃহিণী আছে যারা। কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥'—তাদের দেখলে 'আহা মবি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥' বৃদ্ধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন অকর্মণ্য স্বামীর এই অভিযোগ গৌবী মেনে নেবেন? এরকমটি হতেই পারে না। শিবকে আঘাত করলেন তাঁর রূপ, গুণ, বয়স, সম্পদ ও অভিযোগ নিয়ে :

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী॥
[শিব নিজের মুদ্রায় উত্তরটি ফেরৎ পেলেন]
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নেই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের পুঁজি॥

এইসব বলে টলে গৌরী পুত্র দুটিকেও বাপের প্রতিনির্ধি হিসেবে তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন। তাব পর গৌরীর গলায় একটু অভিমানের সুর :

সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ি সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

কার বিরুদ্ধে অভিমান? আপাত দৃষ্টিতে স্বামীর বিরুদ্ধে নিশ্চয়। কিন্তু স্বামীকে উপলক্ষ করে এই অভিমান ব্যক্ত হয়েছে গোটা সমাজের বিরুদ্ধে—যে সমাজ দরিদ্রকে আবও দরিদ্র করার প্রয়াস চালিয়ে যায়—যে সমাজ সাধারণ মানুষকে অন্ন থেকে বঞ্চিত রাখে। সেই সমাজের প্রতি গৌরীর অভিমান—এখানে তিনি দেবী নন, আঠারো শতকের এক দরিদ্র পরিবারের ঘরনি। জয়া-বিজয়াকে উদ্দেশ্য করে বলার মধ্য দিয়ে এ-অভিমান ব্যক্ত হয়েছে আঠারো শতকের গোটা সমাজের প্রতি। আমাদের কবির কানে অভিমানী কণ্ঠের সেই আর্তি পৌঁছেছিল- —তিনি সেই আর্তিকে ভাষায রূপ দিয়েছেন, আর আমরা পাঠক ইতিহাসের সেই বাস্তব ছবি প্রত্যক্ষ করছি। সম্ভবত রাজসভার কবি রাত্রিকালে সবার অলক্ষ্যে ভ্রমণ করে কান পেতে শুনতেন দারিদ্র্যের যন্ত্রণা, প্রত্যক্ষ করতেন দরিদ্র-পরিবারে সদস্যদের অসহায় মুখগুলি—না হলে এমন ছবি আঁকা বোধহয় সম্ভব হত না।

একই রকম একটি লোক-দৃশ্য শিবের ভিক্ষা যাত্রা। এই দৃশ্যে শিবের পৌরাণিক মহিমা আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ভিক্ষাযাত্রা-র দৃশ্যটি আজকের অভিজ্ঞতায়ও সমর্থন পায়। 'শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ' অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করছি শিবের সেই অসহায় মুখের ছবি। 'হেঁটমুখে পঞ্চানন/নন্দীরে ডাকিয়া কন/বৃষ আন যাইব ভিক্ষায।' বেশ আড়ম্বর সহকারেই শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, শিঙ্গা, ডমরু বাজিয়ে নিজের আগমনের বার্তা পৌঁছে

দিচ্ছেন—আর তাতেই গোলযোগ। পাড়ার অর্বাচীন বালকেরা শিবকে খেপাবার রসদ পেয়ে যায় :

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥

উদ্ধৃত অংশের প্রতিটি পংক্তিতে পৌরাণিক শিব-মহিমার কথা প্রচ্ছন্নভাবে থেকে গিয়েছে—ভিক্ষা চাওয়ার সময় শিব পৌরাণিক তত্ত্বকথা শুনিয়াছেন, তা সত্ত্বেও শিবের ভিক্ষাযাত্রার দৃশ্যটি একটি সার্থক লোক-চিত্র রূপেই গণ্য হবে।

ব্যাসকে ছলনা করবার জন্য অন্নদা জরতীবেশ ধারণ করেছিলেন। একটু দেখে নেওয়া যাক সেই ছবি :

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বামকক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলিবিলি।
কুট্‌কুটি কানকোটারি কিলিবিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়ে নাসা ডাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকে সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার॥

উদ্ধৃতিটি একটু বড়ই হল। কিন্তু বোঝা গেল লোক-চিত্র আঁকতে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবির সন্ধান মেলা ভার। রাজসভার কবি হলেও তাঁর অভিজ্ঞতার দৃষ্টি যে জনপদের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যাবে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের নানা অংশে। আসলে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে (প্রথম খণ্ড) পৌরাণিক ভাবনা অপেক্ষা লৌকিক ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে বেশি। তাই দেবী গৌরী ও দেবাদিদেব শিব পৌরাণিক নামটুকু মাত্র অবলম্বন করে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট পরিবারের অসহায় স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়েছেন। লক্ষ করতে হয় তাঁদের মুখে কবি যে ভাষা বসিয়েছেন তাও কলহপরায়ণ বিপর্যস্ত নর-নারীর ভাষা হিসেবেই মান্যতা পায়। এ-সব নিয়েই গ্রামবাংলার একটা নিটোল লোক-জীবনের ছবি আমরা পেয়ে যাই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে। এক অর্থে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য যেন লোকজীবনের অবলম্বন—যার পাতা ওলটালেই একের পর এক লোক জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ হতে থাকে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে লিরিক ও নাট্যলক্ষণ

কবির আত্মানুভূতির আবেগবিহ্বল প্রকাশ হল লিরিক। লিরিকের প্রাথমিক শর্ত গীতিপ্রাণতা—হৃদয়ানুভবের তন্ত্রিতে গান হয়ে বেজে ওঠা। সুরের সংযোগ থাক বা না থাক তাকে সংগীতরসাত্মক হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে 'গান' বলে উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য সব মঙ্গলকাব্যেরই পরিণতি মঙ্গলগানে। মঙ্গলবাগে ও তালে তার গণপ্রচারিত হওয়া। কারণ বাংলা মঙ্গলকাব্য কেবলমাত্র রচয়িতার সম্পদ নয়, তা মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় সমাজের বেঁচে থাকবার রসদও। বিশেষ ধর্মভাবনায় বিশ্বাসী ভক্তের কাছে কাব্যরসাবেদনকে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত মাধ্যম এই গান। সুতরাং মধ্যযুগীয় বাংলা লিরিক কবিতা যা নাকি মূলত মঙ্গলকাব্যকেন্দ্রিক তার উভয়বিধ লক্ষণই থাকতে পারে। সঙ্গীতধর্মযুক্ত গীতিপ্রাণতা অথবা সুরসংযোগে গান হয়ে ওঠা।

ভাবতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য এই দুই বৈশিষ্ট্যেরই বাহক। মঙ্গলকাব্যিক ঐতিহ্যের স্বীকরণে কবি নিজেই বলেছেন :

ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্ররায়
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়
নীলমণি প্রথম গায়ন॥

'ডিউ সাঁই নীলমণি' গায়ক কথক—সেই প্রাচীন প্রবহমান রীতি কিংবা পরিবেশ—গ্রামীণ চণ্ডীমণ্ডপে বা অনুষ্ঠানমঞ্চে গ্রামবাসীকে একত্রিত করে শোনানো—এ সবই আছে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ঐতিহ্যে।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে লিরিকের খোঁজে এই মঙ্গলগানের ধারানুসরণই শেষ কথা নয়। লিরিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর কাব্য কবি-চৈতন্যের গভীরতম আবেগ-অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছে। ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে কবির তন্ময় মানবপ্রীতি এবং জীবনবোধের স্বরূপ উপলব্ধির কারণে। ভারতচন্দ্রের পরেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের আরম্ভ। লিরিক কবিতার উদ্ভব আর প্রতিষ্ঠায় সেযুগের ব্যাপকতা। বস্তুনিষ্ঠ কাব্য এই নবযুগে দাঁড়িয়ে আত্মনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তন্ময়তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে মন্ময়তায়। উনিশ শতকের মহাকাব্যিক চেতনাতেও পড়েছে তার ছায়া। বাল্মীকি রামায়ণের মধুসূদনীয় *মেঘনাদবধ* কাব্যে রূপান্তরীকরণ তাই আর কিছু নয়—সাহিত্যে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শনের তদ্গত অথচ বাঙ্ময় প্রতিষ্ঠা। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বহিরঙ্গ মঙ্গলছাঁচে ঢালা। তবু এ-কাব্যের ধুয়াগানগুলি অনেক সময়েই বিচ্ছিন্ন, অপ্রাসঙ্গিক কিংবা নিছকই পালাগানের প্রস্তাবক হিসেবে সংস্কৃত নাটকের সূত্র ধরে ঐতিহ্যকে স্মরণ করে রচিত হয়েছে—তবু এইসব ধুয়াগানেই গীতিকবির মূল মর্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের রস যে গীতিকবিতার সঙ্গে এক হবার নয়, উভয় শ্রেণীর কাব্যে কবিত্ব-স্ফুরণের উপায় যে পৃথক তা ভারতচন্দ্র জানতেন। তাই কাব্যের আঙ্গিকে বা বস্তুগত ভাবনা পরিকল্পনার স্বধর্মী হিসেবে তিনি লিরিক উপাদানকে ব্যবহারের খামখেয়াল দেখাননি। মঙ্গলকাব্যের বহির্কাঠামোকে রেখেছেন তার মতো করেই। কিন্তু মঙ্গলকাব্যিক নিয়ম লঙ্ঘন না করেও ধুয়াগানের ক্ষেত্রে সুযোগ বুঝে প্রাণের বিশেষ মর্জি বা লিরিসিজমকে সঞ্চার করে

দিয়েছেন। এগুলো যেন কবিপ্রাণের হঠাৎ গেয়ে ওঠা গান। যে সুর অবরুদ্ধ ছিল শিল্পের নিয়মশৃঙ্খলার কারাগারে তা যেন কোন্ মায়া হাতছানিতে অকস্মাৎ মুক্তি পেল।

আগেই বলেছি, *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ধুয়াগানগুলোর বিচার দু'ভাবে হতে পারে। প্রথমত, কাব্যকাহিনীর বিভিন্ন পালাগানের উপক্রমণিকারূপে, যেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি কবির ভক্তিভাব তাঁর ব্যক্তিমানসকে উদ্‌ঘাটিত করে গীতিময় হয়। যদিও বিশুদ্ধ লিরিক রূপকল্প এই সব গানে অনুপস্থিতই থাকে। পক্ষান্তরে এগুলি শিল্পকর্মের অঙ্গীভূত অংশ হিসেবেই অধিকতর গ্রাহ্য হয়। আর দ্বিতীয়ত, পালাগানগুলোর মুখবন্ধের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ধুয়াগান। বিশুদ্ধ লিরিক্যাল মর্জি থেকেই এগুলোর রচনা। মনে হয়, কাব্যের কাহিনী ভুলে কবি যেন এখানে সঙ্গীতরসসুধায় শুধুই অবগাহন করে চলেছেন। আত্মবিস্মৃত, সমাহিত কবির কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে কাব্যশিল্পের কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলা। তবে এও ঠিক, এইসব গানগুলোর ক্ষেত্রে মূলকাব্যের প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ—*অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডের প্রথম ধুয়াপদটি। 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্‌যোগ' কবিতার প্রবেশক এই অংশ। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে মাথায় রেখে এ-গানের অবতারণা :

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো।
অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো।
রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥

ব্যক্তিহৃদয়ের বেদনা ও প্রার্থনা ভাষারূপ লাভ করেছে এ-গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে। তবু গানটির লিরিক মূর্চ্ছনার আবেদন কম। সুর-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে আস্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিই এখানে কবির লক্ষ্য। অব্যবহিত পরবর্তী সতীর দশমহাবিদ্যারূপ গ্রহণের প্রবেশক সঙ্গীতরূপে গানটি কাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে।

আবার দক্ষযজ্ঞ পণ্ড ও দক্ষের মৃত্যুর পর শিবকে সন্তুষ্ট করবার মানসে দক্ষপত্নী প্রসূতির যে প্রার্থনা :

শিবনাম বলরে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে
দমন করিব সুখে শমনে।
....
কাতরে করুণা কর পাপতাপ সব হর
ভারতে রাখহ হর ভজনে॥

তাতে এর সাঙ্গীতিক উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না ঠিকই, কিন্তু গানটিতে অনুভূতির অপহ্নুতির দরুণ লিরিকরূপ স্পষ্ট হতে পারেনি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ লিরিক উপাদানের প্রাচুর্যে ভরা। যেমন *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ডে 'শিববিবাহের মন্ত্রণা' নামক কাহিনী-অংশের পূর্বে সংযুক্ত সঙ্গীত। এর ঠিক আগেই

'পীঠমালা'র বর্ণনা করা হয়েছে। তার পরেই 'শিববিবাহের মন্ত্রণা' অংশে এসেছে নিম্নলিখিত ধুয়াগানটি :

উমা দয়া করগো। বিষম শমন ভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি কাতর হয়েছি অতি
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন শুনিয়া না দেহ মন
গুহ গজাননে বুঝি ডর গো॥
তুমি গো তারিণী তারা অসার সংসার সারা
নানারূপে চরাচরে চর গো॥
রাধানাথ তব দাস পূরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্রে ঋণে তর গো॥

কাহিনীর প্রবাহের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। ভবযন্ত্রণাকাতর, শমনভীত, পাপসংশয়াচ্ছন্ন কবির ব্যাকুল চিত্ত এখন মাতৃচরণে আশ্রয়প্রার্থী। ভক্তিরসাপ্লুত এই সঙ্গীতে কবিমানসের বেদনাকাতর, প্রার্থনানির্ভর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ পাঠক প্রত্যক্ষ করছে।

অন্য আর একটি সঙ্গীতেও কাহিনী-নিরপেক্ষ গীতিরসের উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। শিবের আদেশে কাশীতে বেদব্যাসের ভিক্ষা নিষিদ্ধ হয়েছে। সমগ্র কাশীধাম ঘুরেও সশিষ্য ব্যাসদেব মুষ্টিভিক্ষাও সংগ্রহ করতে পারেননি। ক্রুদ্ধ ব্যাসদেব কাশীকে অভিশপ্ত করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় গান ধরলেন কবি :

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে।
তুমি দীনদযাময় আমি দীন অতিশয়
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে॥
পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে॥

আখ্যানকাব্য সৃষ্টির মধ্যে এই যে লিরিক সুরের মূর্চ্ছনা তা যেন প্রচলিত মঙ্গলকাব্যিক ঐতিহ্যর বহমান স্রোতমুখকে অন্যদিকে চালিত করল। অনেক সমালোচক অবশ্য *অন্নদামঙ্গল*-এর এই গীতিমূর্চ্ছনায় শ্যামাসঙ্গীতের ভক্তিপ্রভাবকে লক্ষ করেছেন।এ প্রসঙ্গে বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে :

"ভারতচন্দ্রের সমকালেই রামপ্রসাদের পদাবলী ভক্তিরসে, সঙ্গীতমাধুর্য্যে ও প্রার্থনা-ব্যাকুলতায় বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ব্যক্তি হৃদয়ের আবেগ ও ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা এই শ্রেণীর লিরিক কবিতার শক্তি ও উপযোগিতা যে অনেক বেশী ভারতচন্দ্রের মত প্রকৃত কবিশিল্পীর পক্ষে তাহা অনুধাবন করিতে বিলম্ব হয় নাই। সেই কারণে মহাকাব্য রচনার মধ্যে লিরিক উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে কবি নিজ হৃদয়ের আকৃতিকে মুক্তি ও ভাষারূপ দিয়াছেন।"

[ভারতচন্দ্র : কবি ও শিল্পী]

আখ্যানকাব্যের কাঠামো বিন্যাসের মধ্যে এই লিরিক্যাল আবেদন কবিমানসের অন্য দিককে প্রকাশ করে। বীণাধ্বনির সহজ সঙ্গীতে কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অনুপ্রবিষ্ট হয় আত্মমগ্ন কবির মন্ময় কবিতা। এ এক অপরূপ আধুনিকতা। আর এই আধুনিকতার বোধই *অন্নদামঙ্গল*-এ দেবীকে শুধুই অন্নপূর্ণা করে রাখেনি। যে দেবী ভারতের মুখে অমৃতান্ন তুলে দিয়েছিলেন তিনি এক নামে যেমন অন্নদা, ভিন্ন নামে তেমনি সরস্বতী। অভেদবাদী কবির এই হল জীবনমীমাংসা। তাই অন্নদামঙ্গলের যে দেবী অন্নদাত্রী যে দেবী মহামায়া, তিনিই ব্যাস-বাল্মীকি প্রমুখ আদি কবির সৃষ্টিমূলে বিরাজমান 'বাগীশ্বরী বাক্যবিনোদিনী'—নৃত্যগীতবাদ্যের ঈশ্বরী সরস্বতী—আর ভারতচন্দ্রের কাছে দেবী ভারতী। এই ভারতীর কৃপাপ্রার্থী যে কবি তাঁর কাব্যে লিরিক্যাল আবেদন তো থাকবেই। ঐ সঙ্গীতের দেবীর জন্যই তো তাঁর এই কাব্যের আরতি।

ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয়রাগ সদা খেলে
অনুরাগ সে সব রাগিণী।

কাব্যের আরতিতে দেবপূজার মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি ঘটে। গোটা কাব্য-শরীর জুড়ে বিনন্দিত হতে থাকে লিরিক্যাল মূর্চ্ছনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ জুড়ে যে কাব্যের বিচারণা সে যেন কোন অলৌকিক প্রেরণায় ইন্দ্রিয়কে তুচ্ছ করে ভাব-জগতের সামগ্রী হয়ে ওঠে। সুমিত আঙ্গিকের সাহায্যে রূপলোক রচনা কখন যেন কবি কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে ভাবলোকে উড়ে বেড়াতে থাকে। তবুও তার সঙ্গে মাটির যোগ আছেই। আছে জীবনের যোগ, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তীব্র কৌতূহল আর বিস্ময়, নিসর্গ আর বিশ্ব-চরাচর সম্পর্কে অপরিসীম কৌতূহল আর নিত্য-নব নিগূঢ় লীলার অংশীদার হবার আনন্দ অন্ত্যমধ্যযুগের এই কবিকে সর্বতোভা'বে গীতিকাব্যিক করে তোলে। অন্নদাত্রী অন্নদা একসময় বিশ্বচরাচরে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে কবি-কল্পনায় ধরা দেন। এ যেন—

সেথা সুগম্ভীরে বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা, গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।

।। নাট্য লক্ষণ।।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য পরিবেশনায় গায়েনের ভাবভঙ্গীর সঙ্গে দোহারদের উক্তি-প্রত্যুক্তি নাট্যরস সৃষ্টি করত। দীর্ঘ পালায় নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে গায়েনের রস নিষ্পত্তির দক্ষতার প্রকাশই হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের অভিনয়-অংশ। মঙ্গলকাব্যকে তাই কখনও কখনও নাটগীত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কখনও বলা হয়েছে গীতনাট। নাটগীত আর গীতনাটের আঙ্গিক ভিন্ন। নাটগীত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক, আর গীতনাট পালাভিত্তিক গায়েন-দোহারদের পরিবেশনা। মঙ্গলকাব্য মূলত আখ্যানধর্মী কাব্য। এর আঙ্গিকের নাটগীতধর্মী প্রচুর উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলেও তা গায়েন-দোহারদের উক্তি-প্রত্যুক্তির রীতিতেই উপস্থাপিত হত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অবশ্য পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমেও নাট্যলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

আসলে মঙ্গলকাব্যগুলি কাহিনী-কাব্য হলেও এদের মধ্যে নাট্য-উপাদানের অভাব ছিল না। এই নাট্য-উপাদানের জন্যেই গায়েনরা যখন গান করত তখন দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে পরবর্তী প্রসঙ্গের জন্যে অপেক্ষা করত, আর তাতেই জমে উঠত আসর। দর্শক-শ্রোতার মধ্যে এই উৎকণ্ঠা বজায় রাখার মধ্যেই নিহিত আছে মঙ্গলকাব্যের নাট্যলক্ষণ। আসলে

মঙ্গলকাব্যের কাব্য শরীরেই—ঘটনা, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, সংলাপ ইত্যাদির মধ্যে নাট্যলক্ষণ নিহিত ছিল, *অন্নদামঙ্গল*-ও এ ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নয়। সমগ্র কাব্যের মধ্যে কিছু নাট্যলক্ষণাক্রান্ত অংশ বেছে নিয়ে *অন্নদামঙ্গল*-এর নাট্যলক্ষণের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

প্রথমে আমরা 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ'—অংশটিতে কীভাবে নাট্যলক্ষণের প্রকাশ ঘটেছে তার আলোচনা করব। দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্যে সতী শিবের অনুমতি প্রার্থনা কবছেন—এই সময়ে শিব ও সতীর কথোপথন অংশে নাট্যলক্ষণ বেশ স্পষ্ট। সতী বলছেন

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন॥

শিব প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছেন :

নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥

শিব জানালেন সতীকে দক্ষযজ্ঞে যাবার অনুমতি না দেওয়ার কারণ। ব্যাপাবটা ওখানেই মিটে যেতে পারত (কারণ সাধারণত সে-কালে স্ত্রীরা পতির নিষেধ অমান্য করত না)। কিন্তু সতী যখন বলেন 'বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা'—তখনই পাঠকের মনে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হয়—সতীর পিতৃগৃহে যাওয়া হবে কিনা এ নিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য পাঠক জানবেন দশমহাবিদ্যা রূপ দেখিয়ে সতী শিবের কাছ থেকে জোর করে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি আদায় করেছেন। সমগ্র ঘটনাটি Narrative-ঢং-এ বলা হলেও নাট্যলক্ষণটি অপ্রকাশিত থাকে নি।

এরপরে সতীর উমা হয়ে জন্ম হিমালয়ের গৃহে। উমার বিবাহ হয় শিবের সঙ্গে—মধুচন্দ্রিমা কেটে গেলে হর-গৌবী বাস্তব জীবনের মুখোমুখি হল। অনিবার্য হয়ে উঠল উভয়েব মধ্যে কোন্দল। বস্তুত হর-গৌরীর সংসার জীবনের চিত্রটি পুরোপুরিই নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। উদাহরণ নেওয়া যাক। দরিদ্রের সংসার—অন্নের অভাব। শিব নিজে রোজগারপাতি কিছুই করেন না—এ ধরনের পুরুষেরা সমস্ত কিছুর জন্যে স্ত্রীকে দায়ী করে—এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়না। গৌরীকে উদ্দেশ্য করে শিব বলেন :

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥
কি বা শুভক্ষণে হইল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥
আর তার গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবা করে তারা॥

গৌরীর বিরুদ্ধে শিবের অভিযোগের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। স্বভাবতই 'শিবার হৈল ক্রোধ শিবের বচনে'—তিনিও ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নন। প্রত্যুত্তরে তিনিও বলতে থাকেন :

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥

....

তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥

শিব যেমন বলেছেন গৌরীর হাতে পড়ে তার দুরবস্থার অন্ত নেই, একই অভিযোগ গৌরীরও .

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিঁন্দুর পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

একটি দবিদ্র পরিবারের ক্ষোভ, আক্ষেপ, নিত্য কলহ নিয়ে পাঠককে একটি perfect নাট্যদৃশ্য প্রত্যক্ষ কবালেন কবি ভারতচন্দ্র।

শিব-ব্যাস কথোপকথন অংশটিও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। বস্তুত এই কথোপকথনের পরেই ব্যাসদেবকে কাশী ছেড়ে চলে যেতে হয়। উদ্ধৃত করলে এর নাট্যলক্ষণ স্পষ্ট হবে।

শিবেব উক্তি :

বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমি ত পণ্ডিত।
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহাবে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি কর্ম্ম করিলে পায় পরলোক পার॥

উত্তরে ব্যাসদেব বলেন :

শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহে বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ভেদ প্রধান সন্ন্যাস॥
সর্ব্বজীবে সমভাবে জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥

শিবের প্রশংসা না থাকায় উত্তেজিত শিব বলেন ·

শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম লইয়া॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নয় কয়েছ যখন॥

এই কথোপকথনে নাট্যৌৎকণ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে—যা ব্যাসের কাশী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে শেষ হয়েছে। উল্লিখিত অংশসমূহে সংলাপের পারম্পর্যে চরিত্রচিত্রণও বর্ণনাত্মক নাট্যকৌশলে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে হরগৌরী প্রসঙ্গে ভোজনান্তে তৃপ্ত শিবেব নৃত্যের সঙ্গে শিব-নৃত্যের প্রাচীন ধারার মিল লক্ষ করা যায়। কিছু পঙক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে .

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥

হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥

এর পরে শিবের 'তাণ্ডব নৃত্যে'র এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবরণ দেন কবি

লটপট জটা লপটে পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
....
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥
....
পঞ্চ মুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥

এসব দেখে দেবীর প্রতিক্রিয়াটি জানাতে ভোলেন নি কবি :

নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥

কবি নিজেই এই সমগ্র দৃশ্যটিকে 'নাটক'-ই বলেছেন।

তবে *অন্নদামঙ্গল*-এর এই সব দৃশ্যে নাট্যলক্ষণ থাকলেও গভীর কোন নাট্যরসের সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে না। কারণ জীবনদ্বন্দ্বের গভীরতম রূপ, যা নাটকের বিষয়বস্তু হয় তার প্রকাশ এ-সব চিত্রে অনুপস্থিত—ভারতচন্দ্রের সে ধরনের কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। এ ব্যাপারে আমরা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্যটি উদ্ধার করতে পারি। তিনি বলেছেন, "কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় ভারতচন্দ্রের নাটকীয়তা কোন এক বিশেষ পরিস্থিতির রঙ্গভঙ্গকে আশ্রয় করেছে। যার জন্য গতিশীল নাটক অপেক্ষা নাট্যাচিত্রই আমরা বেশি পাই।" বস্তুতই *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের নাট্যলক্ষণাক্রান্ত এইসব অংশগুলি নাট্যচিত্র হিসেবেই কাব্যে এসেছে—কোন গভীর নাট্যদ্বন্দ্ব (হরগৌরী কন্দল বা অন্যত্র) এইসব অংশে খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের রসবিচার

'যে হৌক সে হৌক ভাষা...' কিন্তু তা যেন হয় ... 'রস' লয়ে। অর্থাৎ, কাব্যের মুখ্য বস্তু 'রস'। কৃষ্ণনাগরিক রাজসভাকবি যে-যুগে কাব্যের ক্ষেত্রে এ হেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই যুগে 'রস' বলতে বোঝানো হত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নবরসের কোন একটিকে। রাজসভাকবি ভারতচন্দ্রও কি সেইটুকুই বুঝতেন? রাজার মনোরঞ্জনের পেশাদারিত্বে যুগের রুচি ও মানসিকতার ধাত্রীত্ব করেছেন যিনি তাঁর পক্ষে হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। তবু তাঁর সচেতন শিল্পীসত্তাকে উপেক্ষা করবেন কিভাবে? যুগসঞ্চিত ক্ষোভ, হতাশা, পুঞ্জীভূত অতৃপ্তি আর অপরিসীম জীবনাভিজ্ঞতাসঞ্জাত জীবনবোধ তো নিছক অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনো একটির দিকনির্দেশে চালিত হতে পারে না। ভারতচন্দ্র তাই আত্মপ্রতারণা করেননি। নির্মোহ তাঁর কবিমানস, তথাকথিত বাস্তব বা সত্য আসলে যে প্রহেলিকা, মিথ্যার আভরণে প্রদর্শিত কলঙ্কিত যুগজীবন—সে কথাই তাঁর কবিধর্মে প্রকাশিত। আর এ-কারণেই সে কবিকর্ম তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গভীরতম জীবনবোধ থেকে জাগ্রত সেই বিশ্লেষণভঙ্গি আদিরসাত্মক হাস্যরসময় এবং ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক। কাজেই *অন্নদামঙ্গল* কাব্য-কে নেহাৎ 'আদিরসধর্মী' বা 'হাস্যরসপ্রধান' কাব্যের নিঃসঙ্গ অভিধায় ফেলা হয়তো সঙ্গত হবে না।

প্রমথ চৌধুরী ভারত-কাব্যের • মূল্যায়ন করেছেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য অশ্লীল বলে যে প্রচার ও নিন্দা অর্জন করেছিল বীরবলী মূল্যায়নে তা অন্য মাত্রা পায়। 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি জানালেন—

> "ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসাধন থাকবে ও তা হবে রসাল। এই দুই বিষয়েই তাঁর মনোষ্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ রস, সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরিক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।"

কিন্তু এরপরেই তিনি বললেন—

> "ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদি রস নয়, হাস্যরস। এ-রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিক। জীবন নয়, মন। ..হাসি জিনিষটেই অশিষ্ট, তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক মূঢ়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মূঢ়তার প্রতি সত্যের বক্রোক্তি।"

—সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর বিশ্লেষণে দু'টি পৃথক রসপ্রসঙ্গ ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রসঙ্গে উঠে আসছে—আদিরস এবং হাস্যরস। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সম্ভোগচিত্র আছে—কিন্তু তা আদিরসাত্মক ভোগলিপ্সা নয়। এ-ভোগপ্রীতি সুস্থ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য।

—ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ।
যৌবনেতে কর যৌবনভোগ॥ [রসমঞ্জরী]

এ 'যৌবনভোগ'-এর আনন্দ অবসরে পক্ষান্তরে আর একটি সুপ্তকথন ভাস্বর হয়ে ওঠে। তা হল নারী-পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষ এবং নারীর প্রেমের এবং ভোগের সাম্রাজ্যে

পরিপূরকতা। তাই *রসমঞ্জরী*-র নায়ককে পূর্ণ দৃষ্টিতে সমাজ, সংসার আর ব্যক্তিজীবনে নারীর স্থান লক্ষ করে বলতে শোনা যায় :

প্রমদা বন্ধন সংসারেরি
প্রমদা আকার আহমা দেরি,
সতত রাখহ সযত্নে তায়—সুরত্ন প্রায়।।

অন্নদামঙ্গল-এর প্রথম খণ্ডে কবি তাই নারীর মুখ দিয়েই স্বাভাবিক ভোগজীবনের পক্ষে দাবি উপস্থিত করিয়েছেন। বসুন্ধর-পত্নী স্পষ্ট ভাষায় তার দাবি জানিয়েছে দেবীর কাছে। বসুন্ধর কুবেরের অনুচর। দেবীর অভিশাপে সে জন্মেছিল মর্ত্যে—এবং এখানে তিনটি বিবাহ করে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। স্বামী-বিচ্ছিন্না, বিরহিণী বসুন্ধর-পত্নী বসুন্ধরা স্পষ্ট ভাষায় এবং অকাট্য যুক্তিতে অন্নদার কাছে তাকে বিরহদশা থেকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়েছে। অন্নদার কাছে স্পষ্টকথনে ফুটে উঠেছে তার অকাট্য যুক্তি। স্বাভাবিকভাবেই মর্ত্যবাসী স্বামীর নবপত্নীসুখে সে ঈর্ষান্বিত। দেবী হলেও অন্নদা বুঝবেন স্বামীবিহনে তার দেহভোগের অতৃপ্তির বিষয়টি :

ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রী-পুরুষে কৈলা রতিসৃষ্টি।।

অনাবৃত সত্যভাষিতায় বিমূঢ় দেবী তার প্রার্থনা পূরণ কবলেন, মর্ত্যে বসুন্ধরের পত্নী হওয়ার জন্যে তার জন্ম হল। আসলে বসুন্ধরার এই অবস্থার জন্য দায়ী তো দেবীই। তাই দেবীকে মেনে নিতে হল বসুন্ধরার প্রার্থনাকে, কামের বাস্তব চাহিদাকে।

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর অন্নদাপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করতে গিয়ে ঋতুরঙ্গের চক্রান্তে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। অন্নদার জন্য তোলা ফুলে রচনা করেছিল পুষ্পশয্যা—যাপন করেছিল নববাসর। এই অপরাধের জন্য ডাকিনী-যোগিনীরা যথার্থ রসিকতার সঙ্গে বসুন্ধর ও বসুন্ধরাকে 'ফুল মালা সঙ্গে বুকে বুকে বাঁধি রঙ্গে' অন্নদাসমীপে হাজির করেছিল—রুষ্টা দেবী শাপ দিয়েছিলেন—মর্ত্যে গিয়ে মনুষ্যজন্ম নাও। সেখানে গর্ভবাসের যন্ত্রণা, জ্ঞানহীনতা, পরদুঃখকাতরতার অশান্তি প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করবে বসুন্ধরকে। মর্তলোক যে রৌরবকুম্ভীপাক নরকেরও অধম—এমনটা মনে করে কুবেরপুত্র নলকূবরও।

কুবেরের অনুচর বসুন্ধর-আর কুবেরের পুত্র নলকূবর। বসুন্ধরের মতোই নলকূবর পত্নীর সঙ্গে মধুমাসে রতিরঙ্গে মেতেছিল। এবং মর্তবাসের অভিশাপ পেয়েছিল দেবীর কাছে থেকে। বসুন্ধরের সঙ্গে নলকূবরের আচরণের তফাৎ এইটুকু—সামান্য অনুচর হিসেবে বসুন্ধর অন্যায়ভাবে ধরা পড়ার পরেই অপরাধসচেতন, অপরপক্ষে কুবের-পুত্র নলকূবর নিজ অন্যায়ের সমর্থনে রাজকীয় ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী অন্নদার কাছে। নলকূবর একইসঙ্গে ধনমত্ত ও কামোন্মত্ত। নারীবেশে স্বয়ং দেবীও তার কাছে যেতে সাহস পাননি—ধারণ করতে হয়েছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ। অন্নদাপূজার সময় যুবতীবিহারে লিপ্ত নলকূবরকে তিরস্কার করলে সে সদম্ভে জানিয়েছে :

এ সুখযামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক।।
জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।

অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী সে তো তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিনবার॥

—স্থূল ভোগের এ এক নির্লজ্জ দৃশ্য। রসিক জনের মনোহরণ করে যা তাই রস। 'রস' হল 'চিত্তমাসৃন্যব্যঞ্জক' অবস্থা বা চিত্তের আস্বাদজনক পরিস্থিতির নাম। আদিরস যদি *অন্নদামঙ্গল*-এর মূল অবলম্বন হয় তবে তা চিত্তকে আহ্লাদিত করল কিভাবে? বরং এই স্থূল আত্মভোগের বিরুদ্ধে কবির 'আত্মিক বিরাগ' তো পাঠককেও সেই পথে পরিচালিত করল।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে আদিরসাত্মক দ্বিতীয় প্রসঙ্গ 'রতিবিলাপ'। ভারতচন্দ্রের কাব্যপরিকল্পনায় ক্লাসিক ও লৌকিক—উভয় স্বভাবই ক্রিয়াশীল। ক্লাসিক বলতে সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদিকেই বোঝায়। আর লৌকিক বলতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য তথা সমকালীন লোকরুচিকে ধরা যায়। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে কালিদাসের অনুসরণ মূলত প্রথম খণ্ডে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে এসে পড়ে শিবের ধ্যানভঙ্গের পর 'কামভস্ম' ও 'রতিবিলাপ'—এই দু'টি অংশ। কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্যের 'মদনভস্ম' অধ্যায়টি মহত্তম কবিকল্পনার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রতিবিলাপের মধ্যেও কবির শিল্পনৈপুণ্য উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতচন্দ্র এই অংশে কি করলেন? দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'ভারতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিমসুরে পতিবিয়োগে বিলাপ করিতেছে।' শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেছেন। তিনি দীনেশচন্দ্রের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছেন—"দীনেশচন্দ্র একটি জিনিস খেয়াল করে দেখেননি—ভারতচন্দ্র ইচ্ছে করেই রতিকে দিয়ে গণিকার কান্না কাঁদিয়েছেন, কারণ রতিকে তিনি রতিই ভেবেছিলেন। —রাধিকা ভাবেন নি।" (*কবি ভারতচন্দ্র*/পৃ. ২০৬) ভারতচন্দ্র আদ্যন্ত অনুধাবন করেছিলেন কালিদাসকে। তবু 'শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম' অংশে ভারতচন্দ্র যেন শ্লীলতার সীমান্ত-সীমা লঙ্ঘন করে গেলেন। ধ্যানস্থ শিবকে বিবাহে আগ্রহী করতে রতিদেব তাঁর উদ্দেশে পুষ্পশর নিক্ষেপ করলেন। কামজর্জ্জর অবস্থায় ধ্যান ভেঙে সামনেই মহাদেব দেখেন মদনকে এবং তাঁর ত্রি-নয়ন থেকে ললাটাগ্নি নিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস করে কামদেবকে। কাহিনীর এই অংশটুকু বহুল প্রচলিত। ভারতচন্দ্রীয় চমক এর পরে :

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।

—এই মুগ্ধতার আবেশ যে কতখানি নির্লজ্জ হতে পারে পরবর্তী অংশেই তার নিদর্শন রেখেছেন কবি :

বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল॥

এরকম একটি চিত্র আঁকার কারণ হিসেবে বলতে হয় আদিরসাত্মক আবিলতাকে সমসাময়িক সমাজের সমান্তরাল অধোগামিতার অভিমুখে প্রবাহিত করে দেওয়া। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের আদিরসাত্মক চাহিদাকে উসকে দেওয়া। অনুগ্রহ-নির্ভর কবিদের সেই রুচিবিকৃতিকে পরিতৃপ্ত করতে নিম্নগামিতার পিচ্ছিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার নির্লজ্জতা। আর সর্বোপরি এক অসংবৃত চরিত্র, স্খলিতবেশ স্খলিতবাক্ দেবতাকে সম্পূর্ণ হীনপ্রভ করে যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা।

তাই *অন্নদামঙ্গল*-এর 'আদিরস' *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডের অবলম্বন নয়—সমাজপরিবর্তনজনিত একটি উন্মত্ত ব্যাধির প্রকাশমাত্র।

সুতবাং রসবিচারে দ্বারস্থ হতেই হয় বীরবলী সিদ্ধান্তের। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস আদিরস নয়, হাস্যরস। এর অবস্থান হৃদয় নয়—মস্তিষ্ক। সুতরাং এ হাসি নিছক হিউমার নয় বরং উইটমিশ্রিত স্যাটায়ার। আর এই স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরসের উৎসসন্ধানে তাঁর সিদ্ধান্ত . "সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।"

ভারতচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির চেষ্টা দু'ভাবে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। প্রথমত, চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়ত, সংলাপে শানিত বুদ্ধির দীপ্তি ছড়িয়ে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রথম খণ্ডে রঙ্গ-রস সৃষ্টির দ্বিবিধ প্রয়াসই ঘটেছে মূলত শিবচরিত্রকে কেন্দ্র করে। দেবতা এখানে ব্রাত্য। স্যাটায়ারের মাধ্যমে তাঁর চরম হেনস্থা করেছেন কবি। শিব বিবাহের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে নারদের সঙ্গে গৌরীর কথোপকথনে বৃদ্ধ বর ও তরুণী ভার্যার অসম মিলন সম্ভাবনার প্রসঙ্গ বিশুদ্ধ হাস্যরস সঞ্চার করেছে :

মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে।।
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী।।
নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে,
পাকা দাড়ি বুড়াবর ঘটাব তোমারে।।
আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।
ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাৎ।।

নারদকে ঘটক বানিয়ে পর্বত-দুহিতার সমীপে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন স্বয়ং দেবাদিদেবই। কারণ মদনাহত তিনি। তাই উমার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবের কথা শুনে :

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।
মুনি কহে দ্রুত সকলি প্রস্তুত
বর হয়ে কবে যাবা।।
কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।।

বলদে চড়ে, শিঙ্গা বাজিয়ে চললেন শিব বিবাহযাত্রায়,—ভূত প্রেত সহযোগে .

এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়

প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥

বরের চেহারা এবং আচরণ দেখে চমকে উঠলেন হিমগিরিরাজ। বিবাহসভায় 'বাঘছাল খুলি উলঙ্গ হৈল হর'। খেদোক্তি আর আপশোসে হায়-হায় করতে লাগলেন মা মেনকা এবং উপস্থিত এয়োরা :

আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥

....

আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে॥
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভুতুড়ের কপালে পড়িলে॥

আব তারপর বাঙালি জীবনের সেই পরিচিত দৃশ্য। অসমবিবাহের পরবর্তী পর্যায়ে দুঃখিনী কন্যাসন্তানটির জন্য মায়ের আজীবন কান্না :

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥

এ কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই নয়। এর জের চলল পরবর্তী দাম্পত্য দৃশ্যেও। হিমালয় ছেড়ে গৌরী কৈলাসে এসেছেন, স্বামীগৃহে। অভাবের নিত্য তাড়নায় মদনের কারসাজি অন্তর্হিত। কোন্দল, অনাহার আর ভিক্ষাযাত্রায় বিষময় হয়ে উঠেছে সংসার জীবন—'অন্নবিনা অন্নদার অস্থিচর্মসার'। আর সেই ভয়াবহ সংসারাভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে রুচিবিকারহীন নির্জলা হাসির উপকরণে। অনাহারে বুভুক্ষু শিব অলক্ষণা বলেছেন পার্বতীকে। ঝংকার দিয়ে উঠেছেন দেবী :

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥

....

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাডু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাডু॥
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কও কি কারণ॥...

পার্বতীর তিরস্কারে অনন্যোপায় শিব ভিক্ষায় বেরুলেন। গ্রাম্য বালকদের দৌরাত্ম্যে সে ভিক্ষাযাত্রাও পণ্ড হতে বসল :

দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় কত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥

কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

আপাদমস্তক অসংগতিতে ভরা এক শ্রীহীন দেব চরিত্রকে নিয়ে কৌতুকে মেতেছেন কবি—কৌতুকে মেতেছে গোটা সংসার। সেই অসংগতি, যাকে কৌতুকের জন্মদাতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : "যাহা সুসংগত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত, যাহা অসংগত তাহা ক্ষণকালে নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই। হঠাৎ না হইলে কিম্বা আর এক রূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।" (কৌতুকহাস্যের মাত্রা *পঞ্চভূত*) অ্যারিস্টটলও কমেডির আলোচনায় হাস্যকর বলতে যা 'অসুন্দর এবং বিকৃত কিন্তু বেদনাদায়ক নয়' এমন বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। এই কৌতুকের মাত্রা চড়তে চড়তে কখন যেন অশ্রুজলের রূপ নেয়। স্বর্গীয় দম্ভ আর লালিত্যহারা মহাদেবের নির্লজ্জ বুভুক্ষা, অন্নদার কাছে ভিক্ষালব্ধ সামান্য অন্নভক্ষণকালে তাঁর আগ্রাসী ক্ষুধা কোনো দৈবী সংযমের শাসন না মানা কোন এক বেসুরো ছরার টানে মনকে ভেজায়।—সর্বহারা যুগের তাগিদে তখন একটিমাত্র সঙ্গীতই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে :

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥

তাই কেবল মস্তিষ্ক নয়, শুধু বুদ্ধিকোধ নয়, হৃদয়ধর্মের সঙ্গেও জোড়া হয়ে যায় ভারতচন্দ্রে হাস্যচেতনা। স্টিফেন লিককের অভিমত তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে : "Humour may be defined as the kindly contemplation of life and the artistic expression there of." এই 'Artistic expression' নিঃসন্দেহে পরদুঃখকাতরতার সঙ্গে যুক্ত।

ভারতচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—বুদ্ধিদীপ্ত রচনার প্রবণতায় কৌতুকের অবতারণা। ব্যাস-প্রসঙ্গে কবির এহেন মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কারে এবং গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কারে যথার্থ রঙ্গব্যঙ্গের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। ব্যাসকাশী নির্মিতির তাগিদে একদা যে গঙ্গাকে তিনি আপ্লুত কণ্ঠে আরাধনা করেছিলেন :

তুমি নারায়ণী পতিতপাবনী
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর॥

সেই গঙ্গারই অপযশে মুখর হয়ে উঠলেন ব্যাস স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ার কারণে :

পুরাণে বর্ণিনু যেই পুণ্যতীর্থ হলে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥

****

বেশ্যাধর্ম লয়ে আছ জাতিকুল নাহি বাছ
রূপ গুণ যৌবন না চাও।

আঁতে ঘা লাগতেই গঙ্গাও অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন—ব্যাসকে নির্লজ্জ তিরস্কার করে বলেন :

তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই জন॥

কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগে রহিত হৈল শাপের লাগিয়া।।
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন।।

....

পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া।

বিশ্বকর্মার সঙ্গে বিবাদেও ব্যাসের একই মানসিকতা। সুতরাং ব্যাসদেবের প্রস্তরাঘন পৌরাণিক মূর্তিকে তছনছ করে ভারতচন্দ্র আবার দেখালেন অষ্টাদশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক রুচির বিকারগ্রস্ত রূপ। এতদিনের একপেশে ধর্মবিশ্বাসে তখন রীতিমত ফাটল ধরেছে। আর সেই ফাটলধরা ধর্মের কাঠামোর মুখোশ টেনে খুলে ফেলতে তিনি ব্যবহার করলেন তাঁর বিদ্রুপ কৌতুকে ভরা রচনাশৈলী। অনবদ্য এবং আকর্ষণীয় সে 'স্টাইল'—যে স্টাইলের গুণে তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ 'আর্টিস্ট'। এই স্টাইলের গুণে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের হাসি শুধু মুখের নয় মনেরও। "এ হাসি সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।" শব্দের খেয়ালী খেলায় রায়গুণাকর সেই বিশিষ্ট স্টাইলকে প্রবাদপ্রতিম করে তুললেন। "ধর্ম ও দেবতা, জগৎ ও জীবন সব কিছুর প্রতি ভারতচন্দ্র একটি ব্যঙ্গময় অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন বলে তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে দিয়েই ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের একটি ধারা বয়ে চলেছে।" [*বাংলা সাহিত্যে হাসাবস*, অজিত দত্ত]

ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, অবিশ্বাস—জীবনেব এইসব নেতির দিক তবু ভারতচন্দ্রের রসবোধের পরিণাম হয়ে ওঠেনি। অসাম্য-পীড়িত সমাজে শৈল্পিক প্রতিবাদের জন্ম দিতে গেলে শুধু নেতি-নেতি করলে চলেও না। এক ধরনের ইতিবাচক সূক্ষ্মতার ঔদার্যে অনাচারগ্রস্ত ধর্মাচার, অন্তঃসারশূন্য সমাজ ব্যবস্থা, প্রথাসর্বস্ব মঙ্গলকাব্যের ঘেরাটোপের মধ্যে বসেও তাই অনায়াসে তিনি রচনা করলেন 'নূতন মঙ্গল'। মহাশক্তি অন্নপূর্ণা কল্যাণময়ী মাতৃরূপে হয়ে উঠলেন পরমরসের আকর। ভিখারি শিবের দুই পুত্রের (দ্র. ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য) সঙ্গে মিলে তৃপ্তির আহার্য গ্রহণ সেই রসেরই পূর্ণতার দিক হয়ে রইল। লীলাসুখে মেতে দেবী পরিবেশন করছেন অন্ন, আর এরই মধ্যে ক্ষুধার্ত ব্যাসের আনন্দহীন লোভ তপস্যার আকারে পরিপূর্ণ আনন্দসংসারে গাঢ় কালি ঢেলে দিলেও একসময় গভীর বেদনারসেব গভীরতায় তার পরিসমাপ্তিও ঘটল।

প্রসাধন শিল্প : শব্দ ● ছন্দ ● অলঙ্কার

ভারতচন্দ্র বাক্-সিদ্ধ কবি। স্তোত্র রচনায়, সংলাপ সৃষ্টিতে, বিষয়বস্তু বর্ণনায়, অলঙ্কার প্রয়োগে, ছন্দোবৈচিত্র্য প্রদর্শনে—ভারতচন্দ্র তাঁর ভাষাসিদ্ধির কালাতিক্রান্তি সাক্ষ্য রেখেছেন। অলংকারশাস্ত্রমতে কাব্যের লক্ষ্য রস। আর তাব শরীর শব্দার্থ বা বাচ্যার্থ। বাচ্যকে আশ্রয় করেই ভাব রসে পরিণতি পায়। আর সে-কারণেই রসময় কাব্যজগৎকে অলৌকিক মায়ার জগতের হদিশ দিতে শব্দার্থময় বাণীবস্তুর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে' বলে কবি ভারতচন্দ্রও প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তকে মান্য করলেন, কিন্তু তার আগে স্মরণ করলেন ·

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

শুধু মিশ্র ভাষাই নয়—একটি অপূর্ব মণ্ডনকলা নিপুণ অলংকার নির্মাণ, একটি সুন্দর অবয়ব-সংস্থান—আর সবমিলিয়ে এক অপরূপ সুর-হিল্লোল *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে ভারতচন্দ্রের 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'র নজির হিসেবে চিরকালের রসিক সমাজে সমাদরযোগ্য করল। প্রসঙ্গত অতুলচন্দ্র গুপ্তর মন্তব্য স্মরণীয়। ভারতচন্দ্রেব কাব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "ভারতচন্দ্রের শিল্পীমনের প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল। ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য ও গদ্যলেখক এই স্টাইলের গুণে বা নবীনত্বে আর্টিস্ট বা কবি নাম পেয়েছেন।"

কবির সৃষ্টিক্ষমতা বিষয়ে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন—"চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন। ...অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" [উত্তরচরিত] আর সেই সৌন্দর্যসৃষ্টির লক্ষ্যেই ভারতচন্দ্র নির্মাণ করলেন 'কাব্য-কথার তাজমহল'। প্রমাণ করলেন 'সঙ্গীতের মতো সাহিত্যও একটা আর্ট'। আপন কবিপ্রতিভার সঙ্গে মেশালেন নির্মাণকুশলী শিল্পীসত্তাকে। শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কার-অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার সাহচর্যে যে শিল্পীসত্তা জন্ম দিল এক অনির্বচনীয় ভাষার। ভারতচন্দ্রের ভাষার লক্ষণ দ্বিবিধ—একদিকে বচনীয়কে বাচ্যে ধরা, অন্যদিকে অনির্বচনীয়কে প্রস্ফুট করা। বাচ্যের স্পষ্টতায় ধরা দিয়েছে জীবন,—ক্ষুধাভগ্নজীবন। 'কামক্ষুধার মতোই অন্নক্ষুধা ; রতিরণের মতোই অস্ত্ররণ', আছে ইতরতা, চতুরতা—মধুরতার সঙ্গে ; গাম্ভীর্য আমন্ত্রিত হয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে উপেক্ষার ফুৎকারে , প্রণামের নম্র মূর্তিকে আড়াল করেছে জিজ্ঞাসার বক্রদেহ ; বিশ্বাসের স্থির মুখের পাশে দেখা দিয়েছে অশ্রদ্ধার মুখভঙ্গি। তাই ভারতচন্দ্রের শব্দবিচিত্রকে, বিপরীতকে ফোটাবার বিপর্যয়কাণ্ডে খুশি।' (*কবি ভারতচন্দ্র*, শঙ্করীপ্রসাদ বসু) আর সেই কারণে শিবের নাচের সঙ্গে ভূতের নাচের চিত্রণে কবির শব্দের ভালবাসা কম নয়।

মহারুদ্ররূপী শিবের দক্ষালয় যাত্রার বর্ণনায় কিংবা শিববিবাহযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভূত-

প্রেত নৃত্যের বিবরণে অনুকার বিকার জাত ধ্বনির পুনরাবর্তনের সাহায্যে অনবদ্য চিত্ররূপ সৃজিত হয়েছে :

(১) মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥ [শিবের দক্ষালয় যাত্রা]

এখানে শব্দের সাহায্যে কবি অসাধারণ এক চিত্ররূপ রচনা করেছেন। সেই চিত্ররূপ কেন অসাধারণ তার বিশ্লেষণ দীনেশচন্দ্র সেন করেছেন। তাঁর মতে "মহাদেবের যে ভৈরবসুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যসাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য।... ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 'ছলছল টলট্টল, কলক্কল তরঙ্গা'—এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে : ছলছল—জলের প্রবাহব্যঞ্জক; টলট্টল—জলের নির্মলতাব্যঞ্জক; কলক্কল—জলের নিক্কণব্যব্যঞ্জক। গঙ্গাতরঙ্গের এমন সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধহয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।"

(২) প্রেত ভূতগণ ধায়ে অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়॥
ঝুপ ঝুপ ঝাপদুপ দুপ দাপ
লম্ফ, ঝম্ফ দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥ [শিবের বিবাহ যাত্রা]

(৩) জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক লক ফণী জটবিরাজ
তক তক তক রজনিরাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনীবোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনীরোল
প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া॥
ভভম ভবম ববম ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্র তালে তাল দেই বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গভঙ্গিয়া॥ [শিববিবাহ]

ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের ব্যবহারে অসামান্য ধ্বনিঝংকার সৃষ্ট হয়ে বর্ণনীয় বিষয়কে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে 'শিবে অন্নদান' কবিতাংশে :

সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিবে মাতা॥

পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাদের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্বত কচমচিয়া॥

আবার প্রয়োজনে মহাপ্রাণ শব্দবাহুল্য ঘোষধ্বনিময় শব্দবিন্যাসের সাহায্যে শিবের ঐশ্বর্যময় রুদ্ররূপের নিপুণ রূপকার হয়েছেন কবি। সে-সব ক্ষেত্রে অর্থময় শব্দ গুরুত্ব পায়নি, ধ্বনিময় শব্দধ্বনির তাৎপর্যে বিশিষ্ট অর্থদ্যোতনা করেছে :

মহারুদ্ররূপে মহাদেব নাচে।
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গাঘোর বাজে॥ [শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা]

'ভ'-ধ্বনি, ও 'ঘ' ধ্বনির ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়।

অন্নদার পরিচয় জ্ঞাপনে গাম্ভীর্যপূর্ণ তৎসম শব্দাবলীর ব্যবহার করেছেন কবি :

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা॥
অন্যদা অনন্তা অম্ব অম্বিকা অজয়া।

আদ্য 'অ' এবং অন্ত্য 'আ'-র পুনরাবৃত্তির সাহায্যে ধ্যানগম্ভীর এক রহস্যরূপ সঞ্চারিত হয়েছে এখানে।

আবার অন্নপূর্ণার পার্বতীরূপে শিবের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের চিত্রে পারস্পরিক কলহ আর ক্রোধ তিরস্কারকে একেবারে গ্রাম্যভাষায় ব্যক্ত করেছেন কবি। মাহাত্ম্য আর গাম্ভীর্য খুইয়ে এ-ভাষা অশিক্ষিতজনের মুখে মুখে ঘোরে। ক্ষুধার তাড়নায় শিব যখন বলেন :

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥

তখন রণচণ্ডীমূর্তি ধরেন দরিদ্রঘরের গৃহিণী :

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥

....

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই॥

আসলে কবির ভাষার জাদুতে স্পষ্টতর হচ্ছে চরিত্র। চরিত্রের অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গের রূপ। আর এই স্পষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষাই হদিশ দিচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষতম আপ্তবাক্যের, অখণ্ডনীয় অন্নসমস্যার। মানুষের পেটের ক্ষিদে গ্রাস করে সব কিছু এমনকি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকেও। প্রণামের নম্রমূর্তিকে সেখানে আড়াল করে জিজ্ঞাসার বক্রদেহ। বিশ্বাসের স্থিরমুখের পাশে মুখব্যাদান করতে থাকে অশ্রদ্ধা আর উপেক্ষার একরাশ চাহনি। স্বর্গধ্যানেও এই হতাশার অনুপ্রবেশকে কবি দেখিয়েছেন চমৎকার ভাবে :

হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া॥

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বিদ্রুপের বক্রদৃষ্টির পাশে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে বিশ্বাসের বীজমন্ত্র। শুচিসুন্দর, ভক্তিমনোহব শিবস্তোত্র. বিষ্ণুস্তোত্র। দীর্ঘ-ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদীর ছন্দ—ময়তায় আকর্ষণীয় সে সঙ্গীত

শিবনামাবলী

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশাননাটক বিষাণবাদক
হুতাশভালক মহত্তর॥
জয় সুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গ ভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোকপালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর॥
জয় রবীন্দুপাবক ত্রিনেত্রধারক
শলাঙ্ককান্তক হতস্মর।
জয় কৃতাস্তকেশব কুবের বান্ধব
ভবাব্জ ভৈবব পরাৎপর॥

হরিনামাবলী

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন॥
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণ মোহন।
জয় গোপ-বালক বৎসপালক
পূতনাবক-নাশন॥

এইসব শব্দ-চিত্র থেকে প্রমাণিত হয় ভারতচন্দ্র ছিলেন একজন শব্দকুশলী কবি—যিনি মানতেন শব্দেব যথাযথ প্রয়োগে সৃষ্টি হয় সাহিত্য। 'ভাষার তাজমহল' গড়ার এই কারিগরকে তাই যথেষ্ট সম্মান দিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন "ভাষা বিচার করিলে তাহাকে প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে।"

ছন্দ একটা বাইরে থেকে গড়া যন্ত্রবিশেষ নয়, যার ছাঁচে বাক্যকে ফেলে যে-কোন একটা বাজনা বাজালেই হল—একথা আধুনিক রসজ্ঞ ব্যক্তি বোঝেন। কিন্তু কাব্যের সেই অলঙ্কারপ্রিয়তার যুগে কেউ বুঝতেন না। তার ফলে তখন ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের পূর্ণ সাযুজ্য ঘটেনি। অর্থাৎ 'কাব্যছন্দের সঙ্গে উচ্চারণপদ্ধতির সম্পর্ক' বিশেষ ছিল না। একমাত্র ভাবতচন্দ্র বুঝেছিলেন 'ভাষার রস' রক্ষা করতেই হবে। তার ফল "ভারতচন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলাবুলির প্রাধান্য নয়, কথ্যভাষার বাচনভঙ্গিও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে , প্রত্যেক বাক্যে, ভাব ও অর্থের অন্বয়রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব

মর্যাদালাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে স্বাভাবিক স্বরভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।" আসলে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ছন্দে স্বাভাবিক জীবনছন্দকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়না। যে-সব ছন্দ তিনি এ-কাব্যে প্রয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক, দিগম্বরা, একাবলী ও মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক ছন্দেব প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সতীর অকালমৃত্যু দাম্পত্য প্রেমের অপমৃত্যু। সেই মৃত্যুর আঘাত শিবেব প্রশান্ত অন্তরে নটরাজের প্রলয়ঙ্করী চেতনা প্রবাহিত করে দিয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িযে রুদ্র-বিবহীব বিষাদক্ষুব্ধ মূর্তি কবি অসামান্য দক্ষতায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে প্রকাশ করলেন .

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীবে।।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।।

সতীর দেহত্যাগেব পবে শিব চলেছেন দক্ষালযে 'ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে' দক্ষালয়ে পৌঁছে তঁ ব (মহাদেবেব) হৃদয়-মথিত আর্তনাদ উল্লিখিত ঐ চাবটি চবণে মূর্ত হযে উঠেছে। ভুজঙ্গপ্রযাত ছন্দের এ-এক অসাধাবণ প্রযোগ। দক্ষালযে রুদ্রেব উপস্থিতিতে ভূতপ্রেতগণ দক্ষযজ্ঞনাশে উন্মত্ত হযে উঠেছে। তাদেব প্রমত্ত বেগ তূণক ছন্দেব সুষম ধ্বনিপাতে ফুটে উঠেছে .

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যজ্ঞ বক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
প্রেতভাগ সানুবাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোব রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে।।

আসলে ভাবতচন্দ্র সংস্কৃত ও দেশী নানা ছন্দেব যে প্রযোগ কবেছেন তাব পিছনে কাব্যবৈচিত্র্যসাধন ছাড়া গূঢ়তর অন্য এক উৎকণ্ঠাও ছিল। পুরাতন ধারার কবি তিনি কিন্তু অঙ্গীকার করেছেন 'নূতনমঙ্গল' রচনার। দূর বন্যাব জলকল্লোল তাঁর চেতনায এসে গেছে, কিন্তু বাঁধ ভাঙাব আঘাত এখনো এসে আছড়াযনি। ভাবতচন্দ্র তাঁব সেই দুবাগত, অস্পষ্ট কিন্তু অনস্বীকার্য চেতনাকে প্রকাশ করতে অস্থিব হয়েছেন। তিনি প্রকাশিত হতে চাইছেন কিন্তু প্রকাশেব নতুন ভাষা নেই, নতুন ছন্দ নেই। পুরাতন বাংলা ছন্দকেই তাই যতদূর নতুন ব্যবহার কবলেন, নতুন জীবনীশক্তি দিলেন। আর অবলম্বন করলেন সংস্কৃত ছন্দকে এ কাব্য আত্মবিস্তারের অন্তর্লীন তাড়নাতেই।

ছন্দের মতোই অলংকারের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্রের আদর্শ ছিল সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেব মাধুর্য। মণ্ডনকলার সিদ্ধি তাঁর ঈপ্সিত। অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগে তাঁব কাব্যে একটা ক্লাসিক্যাল স্টাইলেব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অলঙ্কাব কাব্যদেহে আরোপিত বস্তু হলেও তাব রূপসৌন্দর্যেব কারণ, তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের অলঙ্কাব নির্মাণে সেটাই প্রমাণ করলেন। তাই অলঙ্কার হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যভাসা। তাঁব জীবনপথের পাথেয় এই আলঙ্কারিক বচনের দ্বারা তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি কবলেন। তাঁব অনুবোধে রাজসভাকাব্যের ফরমায়েশি অংশসমূহ রচিত হয়েছে। পরিবর্তে ছিন্নমূলকবি ঐশ্বর্যেব আস্বাদ পেয়েছেন। আর অন্তরের অন্তস্তলে প্রণাম জানিয়েছেন কাব্যসরস্বতীকে. প্রশস্তিকাব্যেব চূড়ান্ত নমুনা রেখে গেছেন কাব্যসরস্বতীর চরণতলে।..

প্রতাপতপনে কীর্তিপদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারগুলি রয়েছে নতুন বাগ্‌রীতির মধ্যে, দেশীয় ভাব ও ভাষার ঢঙে রচিত তার অজস্র নমুনার মধ্যে, আর প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে। তাঁর ব্যবহৃত অলঙ্কারসমূহের মধ্যে সব থেকে বড় জায়গাটি জুড়ে আছে বিরোধমূলক অলংকার। কারণ, কবি জীবনের বিরোধী সত্যসমূহের স্বরূপকে আভাসে ফোটাতে চেয়েছেন। আর এক অনির্বচনীয় সমন্বয়-উপলব্ধিতে পূর্ণ করেছেন নিজের জীবনদর্শন। ভারতবর্ষে শিব এইজন্য সমন্বয়ের দেবতা, যাঁর মধ্যে সমস্ত বিচিত্র বিপরীত মিলিত হয়েছে এক অপরূপ সমন্বয়ের গৃহাঙ্গনে। বিশেষোক্তি, বিভাবনা, ব্যাজস্তুতির নিপুণ প্রয়োগে সেই বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিশেষোক্তি : গরল খাইল : তবু না মরিল : ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥

বিভাবনা : অচক্ষু সর্ব্বত্র চান : অকর্ণ শুনিতে পান :
অপস সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি : মুখ বিনা বেদ পড়ি :
সবে দেন কুমতি সুমতি॥

বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ভাবনা কবির অলঙ্কারভাবনার মূল কথা। সেই সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের মণ্ডনকলায় শ্লেষ-অলঙ্কারের স্থানও অতি-উচ্চে। সমগ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যটিই যেন সমসাময়িক জীবন ও ধর্মাচরণের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্লেষ। তাই তাঁর শিবনিন্দায় ব্যাজস্তুতি কিংবা ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে দেবী অন্নদার আত্মপরিচয় সব কিছুই শ্লেষে বঙ্কিম। জীবনের দ্ব্যর্থকতা এই শ্লেষ অলংকারের দ্বারা যেন নির্ভুলভাবে দ্যোতিত হয়েছে :

(ক) অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

(খ) স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥
শিবগোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।

—এরূপ কাব্যাংশ ভারতচন্দ্রের শ্লেষসিদ্ধির অনিন্দ্য নিদর্শন। এখানে কেবল দেবীমুখে কিংবা ব্রহ্মার মুখে শিবের ছদ্ম পরিচয় ও শুদ্ধপরিচয় একত্রে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, সেইসঙ্গে মূল শিবচরিত্রেই যে বহু বিপরীতের মিলন সেই ব্যঞ্জনাদানেও অসামান্য সিদ্ধি অর্জন করেছেন কবি স্বয়ং। দেবাদিদেব মহাদেব তাই যখন বলেন :

এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই॥

তখন 'সিদ্ধি' ও 'শুদ্ধি'র শ্লেষার্থ পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

অকৃত্রিম যমকও কবি সৃষ্টি করেছেন সংযতভাবে। 'উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার', 'লুকাইয়া দশমূর্তি সতী হৈলা সতী' কিংবা 'যাহে জীব ত্যজি জীব' ইত্যাদি।

মহাকবির কল্পনাবিহারের প্রশস্ততম আকাশ হল রূপোজ্জ্বল উপমার আকাশ। বিশ্বমণ্ডলে সর্বত্র তিনি চয়ন করেন তাঁর অভিপ্রেত উপমানসমূহ ; এই উপমা নির্মাণের মৌলিকতাই প্রমাণ করে কবিকল্পনার মৌলিকতাকে। এক্ষেত্রে তিনি প্রধানত সংস্কৃতানুসারী। অমর পূর্বসূরীদের অক্ষয় ভাণ্ডার থেকেই তিনি চয়ন করেছেন তাঁর উপমার রঙিন পুষ্পগুচ্ছগুলি।

'উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা' কিংবা 'তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী, পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি'—ইত্যাদি উপমায় গতানুগতিক সৌন্দর্য প্রকাশ পেলেও ভারতচন্দ্রের উপমাও মৌলিকতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'বাঘের বিক্রমসম মাঘের শিশির' উপমাসিদ্ধ সূক্তির এক অপূর্বোজ্জ্বল মুক্তাখণ্ড। 'প্রতাপ তপনে কীর্তিপদ্ম বিকাশিয়া' এরূপ রূপকেরও রূপোজ্জ্বলতা বিকীর্ণ হয়ে আছে কাব্যের সর্বাঙ্গে।

অসম্বন্ধে অপরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের অতিশয়োক্তিতে দেবী অন্নদার নিরুপম মোহিনীরূপ বর্ণনা করেছেন কবি—

অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশগুণ হয়ে॥

....

কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥

এবং সংস্কৃত কবিদেরই মতো নিপুণ হাতে ব্যতিরেক অলংকারে সাজিয়েছেন অপরূপা অন্নপূর্ণাকে—

অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা

....

মুকুতা যতনে তনু সিন্দুরে মজিয়া।
হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥

এই বর্ণনায় ব্যতিরেক কখনও বা অতিশয়োক্তির তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, কখনও বা আরো তির্যক ছটায় মুখ ঘুরিয়েছে প্রতীকের দিকে।

(ক) ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥

(খ) কে.বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

ভারতচন্দ্রের অলংকার প্রয়োগের মধ্যে ছিল যথেষ্ট রুচিবোধ। কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ তখনই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যখন তার প্রয়োগে অভিপ্রেত সাফল্যের অধিকারী হতে পারেন কবি। ভারতচন্দ্রের অলংকার প্রয়োগে আমরা সেই সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

প্রসাধনকলার একটি অংশ হিসেবে প্রবাদ-প্রবচনের প্রসঙ্গটিও এসে যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রবাদ এবং লেখকের নিজস্ব সৃষ্ট প্রবাদ-প্রবচন দিয়ে কবি কাব্যকে সাজান—এইভাবে প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়টিও প্রসাধনকলার অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ভারতচন্দ্র প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কাব্যের প্রসাধনকলাকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রবাদগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

ক. ঐতিহ্যের সঙ্গে কাব্যের যোগসূত্র স্থাপন :

১. যারে কালে ধরে সেই নিলে বরে

২. শক্তিযোগে শিব সংজ্ঞা শক্তিলোপ শব

খ. সমকালের ইতিহাসের অন্তর্লক্ষণ কাব্যে প্রতিফলিত :

১. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়

২. যেখানে কুলীন জাতি যেখানে কন্দল

গ. প্রবাদ প্রয়োগে চরিত্রের অন্তর্লোক উন্মোচন .

১. আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে

ঘ. প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত সমাজ-মনস্কতা :

১. মার কাছে পুত্র যায় বাপে দেলে তাড়া

২. ঘরে অন্ন নেই যার মরণ মঙ্গল তার

৩ সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর

ঙ. কাব্যভাষাকে প্রসাদগুণসম্পন্ন করার জন্য প্রবাদের ব্যবহার—এসব ক্ষেত্রে কবি প্রবাদের মাধ্যমে অলঙ্কার সৃষ্টি করেছেন :

১. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির [উপমা]

২ বড়র পিরিত বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ [অপ্রস্তুত প্রশংসা]

৩. মাটি মটা ধর যদি সোনামুটা হবে [অপ্রস্তুত প্রশংসা]

৪. লোহা যেন হেম হয় পরশ পরশে [উৎপ্রেক্ষা]

এইভাবে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলি কাব্যশরীরের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে সমগ্র কাব্যকে দ্যুতিময় করে তুলেছে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা : মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং রামপ্রসাদ রায়

ক. কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র

সৃষ্টির ঐশ্বর্যে স্রষ্টার অবিসংবাদিতা। অবিসংবাদিতার সূত্রে যুগের প্রতিনিধি হয়ে ওঠা মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের এমন দু'জন পথিকৃৎ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র রায়। একজন ষোড়শ শতাব্দীর অপরজন অষ্টাদশের। একজন ঐশ্বর্যযুগের অপরজন অন্ধকারের। একজনের কাব্যে আরাধ্যা চণ্ডিকা তো অন্যজনের অন্নদা। তবু প্রশ্ন জাগে, মুকুন্দের *অভয়ামঙ্গল*-এ ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে যে চণ্ডিকা ভক্তকে ঘড়া ঘড়া মোহর দান করলেন—তিনিই আবার দু'শ বছরের ব্যবধানে যুগবাহিত প্রপৌত্রদের দুধে-ভাতে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা হয়ে কেন দেখা দিলেন। সংস্কার, পরিবেশ আর যুগবাহিতার বদলই কি অভিন্নধর্মী দুই কবিপ্রতিভার শিল্পপ্রবণতায় বৈষম্য ঘটালো, নাকি জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনদৃষ্টিগত ভিন্নতাতেই উভয়ের প্রকৃতিগত প্রভেদ প্রকট হয়ে দেখা দিল। অর্থাৎ মূল সংশয় এখানেই—ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাকি কবিধর্মে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্ব।

এই প্রশ্নকে ঘিরে পরবর্তীকালে ঘনিয়ে উঠেছিল বিতর্ক। উভয়পক্ষীয় অনুগামীরা স্ব স্ব যুক্তিতে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের গুরু দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। কেউ মুকুন্দ-পক্ষে কেউ ভারত-পক্ষে।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন "গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী। কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বাক্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য : গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত। কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেক স্থানে অপাঠ্য। ...মুকুন্দরাম সংসারের কথা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কুৎসিত সমাজ-বিশেষের কুৎসিত রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।" অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের আত্মভাবময় ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত নিজস্বতা কিংবা সাহিত্যে চৌর্য বা অনুকারী বৃত্তির চতুরতা কোনটাই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। এখানে কবিকঙ্কণই 'বাঙ্গলা ভাষার সর্বপ্রধান কবি' বলে চিহ্নিত হয়েছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের মতো ভারতচন্দ্রের অনুরাগীদেরও কখনও কখনও এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে, হয়তো বা প্রভাবিত হয়েই। ..."কবিত্ব-বিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে এত শ্রদ্ধা আছে, চণ্ডীপাঠের পর *অন্নদামঙ্গল* পাঠ করিলে সে গৌরব ও শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়া যায়।" [*বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব*]

ভারতচন্দ্রকে আক্রমণ করে বিচারকের আসনে বসেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেনও। অভিযোগ, কবিকঙ্কণের প্রতিভাকে বাহ্যিক পালিশের চাকচিক্য দিয়ে চাপা দিয়েছিলেন রায়গুণাকর। কিন্তু

হীন প্রতিভা নিয়ে অচিরেই তিনি ধরা পড়ে গেছেন কারণ 'কবিকঙ্কণের কবিতা স্বাদ করিবার অধিকার' তাঁর নেই।

রায়গুণাকরের পক্ষেও আলোচনা কম হয়নি। স্বয়ং প্রমথনাথ বিশী যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং আধুনিক ভাষার বাঁধুনি দিয়ে 'বাঙালি সমালোচকগণের মুকুন্দরাম খ্যাপামির চিকিৎসাচেষ্টা' করেছেন। এবং জানিয়েছেন "...মুকুন্দরামকে যাঁরা ভারতচন্দ্রের তুলনায় বড় করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সকলে খুব পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক, তাই 'তাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে গোল করিয়া ফেলিয়াছেন।" তার মতে কবির ব্যাখ্যা করতে হবে রসিকের চোখ দিয়ে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে নয়। প্রমথনাথ বিশী তাই বিষয়টাকে দেখলেন কবিকৃতির বিচারে :

> "আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় মুকুন্দরাম ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ কবি (Realistic)। কিন্তু বাংলা সাহিত্য মূলতঃ রোমাণ্টিক। কবির সাহিত্যধর্ম ও দেশের সাহিত্যধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার দশা হইয়াছিল দুই নৌকায় পা দিবার মতো। এই দুর্দশার জন্য তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আদিতে যে উপাদান লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, অন্তেও তাহা উপাদানরূপেই রহিয়া গিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের ভোজ এই অসার্থক উপাদানের প্রাচুর্যে।"

কবিকঙ্কণ অদিতে যে উপাদান নিয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন অন্তিমে তাকে স্থায়ী রসরূপ দিতে পারেননি—এমন অভিযোগ হয়তো ঠিক। এর কারণ, তাঁর ঘটনাবহুল জীবন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে ভাগ্যের সন্ধানে তাঁকে গৃহহারা করেছে। দামুন্যা ত্যাগ থেকে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়-প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়পর্ব তাঁর জীবনে যে বিপন্নতা ডেকে এনেছিল 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশের ছত্রে ছত্রে, পংক্তিতে পংক্তিতে তারই ছায়াপাত পাঠক লক্ষ করেন। কাব্য ঘটনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় তাড়িত কবি-মনের অসহায় কান্না সেখানে শোনা যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাব্যের পরবর্তী অংশে সেই দুঃখজর্জর অভিজ্ঞতা স্মৃতিভারে মেদুর হয়ে কোথাও ছড়িয়ে পড়েনি। পরবর্তীকালে সামন্ত-নৃপতি বাকুড়া রায়ের অনুগ্রহের নিশ্চিন্ততায়, প্রাত্যহিক চিন্তা-মুক্ততার উল্লাসে কবি জীবনকে ভালোবেসেছেন অনেক বেশি। ফলে *অভয়ামঙ্গল*-এর স্থানে স্থানে ছড়িয়ে থাকা দারিদ্র্য ও দুঃখ বর্ণনা তাকে দুঃখবাদী করেনি কখনও। এসব যেন নেহাতই তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা। প্রসন্ন-কৌতুকপ্রিয় জীবনানুরাগই তাঁর কাছে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনবোধ। ভক্তির উপাচারে সাজিয়ে নিজেকে অভয়ার কৃপাপ্রার্থী করেই কবির সুখ। আর সে-কারণেই ভাবে ও রসে কবিকঙ্কণ সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকবি। দৈবী মহিমা এবং দেবতা ও ভক্তের সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তার প্রশ্ন ছিল না তাঁর কাছে, কাব্যেও তা ছায়াপাত করেনি। কলিঙ্গরাজের প্রতি দেবী চণ্ডীর অহেতুক নিগ্রহ এবং ব্যাধ কালকেতুর প্রতি স্বেচ্ছা-প্রসারিত করুণাসিক্ত আশীর্বাদ—এইসব নিয়ে পাঠকের মনে ক্ষীণতম সংশয়ের কোনো অবকাশই রাখেননি কবি তাঁর কাব্যে। সংশয় নেই ঠিকই তবু কবিকঙ্কণ বস্তুনিষ্ঠ স্বভাববর্ণনার কুশলী কবি। গভীর সহানুভূতি দিয়ে মোড়া তাঁর সব চরিত্র পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছে তাদের নিজস্ব সমাজ পটভূমিকায়। যে সমাজকে কবি প্রত্যক্ষভাবে চিনতেন।

কালকেতু গুজরাট নগরকে তার নতুন রাজধানী হিসেবে স্থাপন করলেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল রাজা কালকেতুর ঘোষণায়। কিন্তু তবু যেন মনে হয় সর্বধর্ম

সমন্বয়ের বিষয়টি দেবী চণ্ডীর অঙ্গুলি নির্দেশেরই ফল। এই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বিষয়টি আসলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে চণ্ডিকাশক্তির মাহাত্ম্য প্রচারের অছিলা হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। তাই কবিকঙ্কণের কাব্য পড়ে ভক্তির ব্যাপ্ত ঔদার্যের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার কিছুটা স্পর্শ পাওয়া যায়। অস্তিত্বের মর্মসূত্র থেকে এ-ভক্তি উৎসারিত ঠিকই, কিন্তু তার সবটাই সমর্পিত দেবী চণ্ডিকা-র চরণে। *অন্নদামঙ্গল*-কার এ হেন ভক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত। দেবী অন্নপূর্ণা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যাসদেবকে তাই জানাতে পেরেছিলেন :

হরিহর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর॥

আসলে ভারতচন্দ্র কবি মুকুন্দের মতো ভক্তি-রসের কবি নন, ধর্মতত্ত্বের কবি। জীবনতত্ত্বের রসললিত ব্যাখ্যাতা। তাই কবিকঙ্কণের মতো জীবনাভিজ্ঞতাজাত বাস্তব জীবন সঞ্চয় তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত।

রাজনৈতিব রোষ ও পারিবারিক অসহযোগিতা ভারতচন্দ্রের জীবনকেও মুকুন্দের মতোই বিচিত্র করে তুলেছিল। বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিঘাতে জীবন তাঁর কাছে আস্বাদিত হয়েছিল বহু ভাবে। প্রাত্যহিকতার বন্ধন নয় বরং ঘটনর তরঙ্গ-বিস্তারের মধ্যে সাঁতরে চলার আগ্রহ-ই ছিল তাঁর বেশি। বাংলাদেশ যখন ভাগ্যবিপর্যয়ের আঘাতে বিপর্যস্ত তখন ভাঙনের প্রবল আঘাত রেহাই দেয় নি কবিকেও। রাজসভার কবি হয়েও কোনোদিনই তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি পাননি। উপরন্তু রাজদরবারে আত্মবিক্রয়ের জ্বালা কবি-প্রাণকে কুরে কুরে খেয়েছে। ভাগ্যের পরিহাসকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি কবি। বিপর্যস্ত ব্যাধি-জীর্ণ সামাজিক জীবনের অসম ছন্দের মাঝে মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো নির্বিকার জীবনানুরাগের সাধনা ভারতচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার জীবনপাত্র বেদনায় পূর্ণ বলেই যে দুঃখর সাধক হতে হবে তাও নয়। এই পরিস্থিতিতে কবির মধ্যে জন্ম নিল এক অদ্ভুত জীবন-দর্শন। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, কৌতুক আর পরিহাসে ভরা সেই জীবনদর্শন। নৈরাশ্য আর বিশ্বাসহীনতার কুঞ্চন লাগল কপালে। তবু বিলাসীর ভোগ-সম্পৃক্ত অলস হাসিটুকু ওষ্ঠ ছুঁয়ে রইল। যুগ সচেতন কবি জীবনরসের রসিকতা ছেড়ে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন বহু রসের কবিতে।

রঙ্গরসের যোগানদার কবি দেবতাকে নিয়েও মাতলেন পরিহাসে। আসলে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের কবি ভক্তি ও দৈবী মহিমা রূপায়ণের ক্ষেত্রে মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায় সংশ্লিষ্ট দার্শনিক জিজ্ঞাসার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। নিজের উপলব্ধিতে যেমন তিনি দেবতার সীমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, "নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভালো নহে তাহা"—তেমনি অভিশপ্ত, নিষ্ফল ব্যাসদেবের মুখে বসিয়েছেন দেবতার উদ্দেশে বেদনার্ত কঠিন প্রশ্ন : "শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া। কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া।" মুকুন্দের কাব্যে এ-ধরনের জীবনদর্শনের কোন অবকাশ ছিল না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও কবিকঙ্কণ নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিবর্তিত প্রেক্ষিতের শরিক হতে পারেন নি। স্বভাবতই তাঁর *অভয়ামঙ্গল* হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের প্রথানুবর্তী ভক্তির কাব্য। অন্যদিকে দেবী অন্নদাই কাব্য-নির্মাণে ভারতচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন নয়। বহিরঙ্গের বাস্তবতা *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে তৎকালীন ধর্ম ও সমাজ-জিজ্ঞাসার নেপথ্য সারাৎসার হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম এবং সমাজ-প্রগতির অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে কীভাবে কাজ করছিল তারই গভীর অনুভবের ছবি

ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায়—কাব্যের ব্যাসকাহিনী হল সেই অর্জিত জীবনদর্শনের আখ্যান। ধর্মসাধনার অহংকারে দুষ্ট সহযোগের এক বেদনাঘন ট্র্যাজিক কাহিনী।

নাগরিকতার প্রধান লক্ষণ হল জ্ঞানানুশীলিত মন এবং পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল বুদ্ধি। নাগরিক মনের কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় কবি তাই শুধু সমাজচিত্রের নিখুঁত প্রতিফলন ঘটিয়েই স্বস্তি পান না। তাঁর তীক্ষ্ম বোধশক্তি অগ্রসর হয় জীবন-সমালোচনায়। জীবনানুরাগের অভাব সেখানে থাকে না, আবার জীবন-অসংগতির প্রতি কঠিন বিদ্রুপকেও সইতে হয়। তাই কবিকঙ্কণ যেখানে জীবনের হাজারো অসঙ্গতির উপরেও সহানুভূতির বারি সিঞ্চন করতে পেরেছিলেন সেরকম কোনো সহানুভূতির স্থান নেই রায়গুণাকরের মেধানিষ্ঠ কবি-প্রকৃতিতে। তাঁর ভেতরে কাজ করে চলে এক অনির্বাণ দ্রোহ-বুদ্ধি। মধ্যযুগের গতানুগতিক গ্রামীণ ঐতিহ্যের নাগপাশ ছিন্ন করবার প্রয়াস। বাস্তব সমাজ-সংসারের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টি। সে দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে সেখানে, যেখানে কবি নির্মাণ করেছেন সংসারে দরিদ্রের স্বপ্ন-ছবি। সেই স্বপ্নের অন্নপূর্ণা পুরীতে অন্নহারা পায় পরমান্নের স্বাদ। মননরিক্ত পায় চিদানন্দের আশীর্বাদ। অবসিত যৌবন পায় নব-যৌবনের আনন্দ-সঙ্গ, আর এভাবেই খুলে যায় ভারতচন্দ্রের স্বভাবত রোমাণ্টিক কবিমনের দরজা, আর তার পাশে রিয়ালিস্টিক অনুভবকে সম্বল করে এগিয়ে চলা কবিকঙ্কণকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামীণ মনে হয়।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখালাম দুই-কবির সামগ্রিক কবি-ব্যক্তিত্ব এবং কাব্য-প্রকৃতি। এবারে উভয়ের কিছু নির্দিষ্ট কাব্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে একই বিষয়কে উভয় কবি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমে সতীর দক্ষযজ্ঞে অংশ নিতে যাওয়ার প্রসঙ্গটির আলোচনা করা যাক। মুকুন্দে দেখা যাচ্ছে শিব দক্ষযজ্ঞে অংশ নিতে সতীকে অনুমতি না দেওয়ায় সতী ক্রুদ্ধা হয়ে একাকিনী দক্ষালয়ে গমন করেন। ভারতচন্দ্রে সতী দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ করে নিজের স্বরূপ বুঝিয়ে শিবের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করেছেন। মধ্যযুগে কোন নারীর পক্ষে পিতৃগৃহে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার পরিস্থিতি ছিল কী? মুকুন্দ কিন্তু সে কাজটাই করেছেন। ভারতচন্দ্র কিন্তু মুকুন্দের মতো সরাসরি সতীকে পিতৃগৃহে পাঠান নি। সতী যে পরমা-প্রকৃতি এটা ভোলানাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তবেই সতী পিতৃগৃহে যাত্রা করেছেন। দুই কবির treatment-এর আলোচনা করলে ভারতচন্দ্রের উদ্ভাবনকে অধিকতর বাস্তব মনে হতেই পারে।

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতীর তনুত্যাগ সংবাদ দুই কবি দুভাবে শিবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মুকুন্দর শিব সতীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভূতলে গড়াগড়ি দিয়ে হাহাকার করেছেন—সেখানে আমরা ক্রোধিত শিবকে দেখি না। প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকের যে স্বাভাবিক প্রকাশ তাকেই মুকুন্দ কাব্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতচন্দ্রের শিব সতীর মৃত্যু সংবাদ শুনে—'শুনিয়া শঙ্কর শোকেতে কাতর। বিস্তর কৈলা রোদন'—কিন্তু তারপরেই আমরা ক্রোধিত শিবকে দেখলাম—সতীর মৃত্যুর কারণরূপে যিনি দক্ষ-কে চিহ্নিত করে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আসলে দক্ষ শিবকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি, কিন্তু তার ফল সতীকে জীবন দিয়ে চোকাতে হবে এটা বোধহয় রুদ্রশিব মানতে পারেন নি। সুতরাং শিবের এই ক্ষোভ, এই ক্রোধিত মূর্তি বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেনি বলেই মনে হয়। আমাদের বিচারে দুই কবিই সতীহারা শিবকে বাস্তবই করে তুলেছেন।

শিব-পার্বতীর বিবাহ-পরবর্তী জীবনের চিত্রের বর্ণনায় উভয় কবির বেশ খানিকটা পার্থক্য আছে। মুকুন্দের রচনায় বিবাহের পরেও গৌরী স্বামীসহ বাপের বাড়ি থেকে যান—সেখানেই জন্ম হয় পুত্রের। বাপের বাড়িতে থাকার সময় গৌরীর কর্মবিমুখতা ('দুগ্ধ উথালিতে গৌরী নাহি দেহ পানি'), সংসারের কাজে হাত না লাগিয়ে সখীদের সঙ্গে পাশা খেলা ('সখী সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী')—এসব নিয়ে মেনকা স্বাভাবিক ভাবেই কন্যার ওপর বিরক্ত হন এবং তা প্রকাশ করলে গৌরী অভিমানে স্বামীপুত্রসহ পিত্রালয় ছেড়ে চলে যান (অবশ্য যাওয়ার আগে গৌরী যে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন সেটা জানাতে মুকুন্দ ভোলেন না) এই চিত্রে একটি নিটোল পারিবারিক জীবনের ছবি আমরা দেখতে পাই। উপার্জন নেই এমন স্বামীর বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীপুত্রসহ থেকে যাওয়ার ঘটনা এবং যে-কারণে সংসারে অশান্তি—এটা মধ্যযুগে খুব একটা বিরল ছবি নয়। এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি কবি ইঙ্গিত করেছেন—গৌরী পিত্রালয় ছেড়ে যাবার সময় বলেছেন : 'মৈনাক শুনয়ে তনয়ে লয়্যা সুখে কর ঘর।' গৌরীর এই উক্তির মধ্যে যে-তথ্যটি প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তা হল আজকের মতো সে-যুগেও পরিবারে পুত্রসন্তানেরা কন্যাসন্তানদের চেয়ে বেশি আদরণীয় ও আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এ-সবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মুকন্দর সমাজ-অভিজ্ঞতার range এবং বাস্তববোধ। ভারতচন্দ্র অবশ্য বিয়ের পর গৌরীর পিতৃগৃহে থাকার প্রসঙ্গ কাব্যে আনেন নি। সোজাসুজি শিব-গৌরী কৈলাসে চলে গেছেন--যেখানে সিদ্ধি ঘোটন, সিদ্ধিভক্ষণ প্রভৃতির আয়োজন কাব্যে বেশ বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তারপর নববিবাহিত দম্পতির মতো শিব-পার্বতীর প্রেমালাপের ছবি ভারতচন্দ্র আমাদের দেখিয়েছেন—শিবের প্রেম প্রকাশের গদগদ ভাষণের উত্তরে পার্বতী অবশ্য শিবের প্রেমের নিষ্ঠা নিয়ে কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি—এ ছবি খুবই বাস্তব--যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই। মধুচন্দ্রিমা শেষ হতেই শুরু হয় উভয়ের মধ্যে কোন্দল। এই কোন্দলের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পথ বেছে নেওয়াই কোন্দল আরও তিক্ত হয়ে প্রকাশ পায়। মুকুন্দ কিন্তু তিক্ততার মধ্যে দিয়ে নয়, কৌতুকরসের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে প্রকাশ করেছেন। সকালে দুই-পাশে দুই পুত্রকে বসিয়ে গৌরীকে ডেকে (শিবকে তখন বেশ বাঙালি গৃহকর্তার মতোই মনে হয়) বলেন গতকাল যেহেতু অনেক ঘুরে ভিক্ষা করে রসদ সংগ্রহ করেছেন তাই আজ আর ভিক্ষায় বেরোবেন না—খাওয়ার পর বিশ্রাম নেবেন। খাদ্যদ্রব্যের তালিকাটি অবশ্য বেশ দীর্ঘই ছিল। কিন্তু গৌরী জানালেন কাল ভিক্ষা করে যা এনেছিলেন তার অধিকাংশই আগের নেওয়া ধার শুধতে চলে গিয়েছে, আর তারপরে যে-টুকু ছিল তা তিনি কালই রান্না করেছেন—অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। এখন অবশ্য ত্রিশূল বাঁধা দিয়ে চাল আনতে পারেন। গৌরীর এই কথা শুনে শিব গৌরীকে সুখে ঘর করার কথা বলে নন্দীর সঙ্গে 'পাপ ঘর' পরিত্যাগ করলেন। সমস্ত বিবরণের মধ্যে—শিবের পুত্রদের পাশে নিয়ে গৌরীকে ডেকে রান্নার ফরমাস করা, গৌরীর ধার শোধ করার প্রসঙ্গ, শিবের গৃহত্যাগ—সব কিছুর মধ্যেই একটা কৌতুকের সুর বজায় রেখেছেন মুকুন্দ—যা ভারতচন্দ্রে মিলবে না। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি দারিদ্র্য নিয়ে কৌতুক করার মতো কিছু খুঁজে পান নি—তাই তাঁর হর-গৌরীর কোন্দলে থাকে ব্যঙ্গ -বিদ্রুপ ও তিক্ততার ছোঁয়া।

উভয় কবির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে। মুকুন্দ ও

ভারতচন্দ্রের মধ্যে কালের ব্যবধান যাই হোক চলিষ্ণুতার দিক থেকে ভারতচন্দ্রের কাল অনেক বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন ও ঘটনাবহুল হওয়ার কারণে জীবনযাত্রার গতিও দ্রুততর হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী সংশয়ের যুগ—সব কিছুতেই প্রশ্ন তোলার প্রবণতা এ যুগের বৈশিষ্ট্য যা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হলে প্রসূতি কিন্তু শিবের কাছে দক্ষযজ্ঞ নাশের কারণ জানতে চেয়েছেন, এমন কি বেদের অভ্রান্ততা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন—ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের কোন কবিই যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি।

জীবনকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই উভয়ের সৃষ্ট চরিত্রদের রূপও পৃথক হয়ে যায়। মুকুন্দর চরিত্র চিত্রণে সঙ্গতিবোধের যে-পরিচয় পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রে তা পাওয়া যায় না। মুকুন্দর সৃষ্ট ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত এমন কি কালকেতুকেও পূর্ণায়ত চরিত্রের মর্যাদা আমরা দিতে পারি। দেব-দেবীদের যে-ভাবে বাস্তব জীবনের মানব-মানবী (দ্রষ্টব্য : গৌরীর সহিত মেনকার কলহ, হরগৌরীর কলহারম্ভ, গৌরীর খেদ প্রভৃতি কাব্যাংশ) করে তুলেছেন মুকুন্দ ভারতচন্দ্রে তা দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রও দেব-দেবীর নির্মোক খসিয়ে দিয়ে তাদের মানব-মানবীর চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে ব্যঙ্গ-ভাবনা প্রধান হয়ে ওঠায় চরিত্রগুলি পূর্ণায়ত চরিত্র হয়ে ওঠেনি। ব্যাসদেবের চরিত্র ভারতচন্দ্রের এক অভিনব সৃষ্টি নিঃসন্দেহে। এই চরিত্র সৃষ্টির মূলে ছিল দেবতাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর স্পৃহা—যা অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন জিজ্ঞাসার বাস্তব ছবি। কিন্তু ব্যাসদেব বার বার আনুগত্য বদলানোয় এ-চরিত্রটিও সম্পূর্ণতা পায় নি। তাই ভারতচন্দ্রের চরিত্রদের সম্বন্ধে সমালোচকদের মন্তব্য : ভারতচন্দ্র "কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মূডের স্থির বা গতিশীল চিত্র এঁকেছেন, ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি ; আদ্যন্ত সঙ্গ তিবিধানে দৃষ্টি দেন নি। চরিত্র সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের এই প্রবণতার কারণ—প্রথমত অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো অস্থির সময়ে একটা গোটা চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব ছিল না, আর দ্বিতীয়ত, ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি—পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশ এবং রাজসভার দায় মেনে তাঁকে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে—যেখানে দোষগুণে সমন্বিত একটি নিটোল চরিত্র অঙ্কন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মুকুন্দের কাব্যে তাই আমরা পূর্ণায়ত চরিত্র পাই, আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই খণ্ডচিত্রের অজস্র সমারোহ।

দুই কবির আর একটি মৌলিক পার্থক্য কাব্যের প্রকাশগত ভঙ্গিমায়। দুই কবির জীবন দৃষ্টিগত পার্থক্য ছাড়াও দুই কবির পরিবেশ-পটভূমিও এর জন্যে দায়ী। মুকুন্দ কাব্য লিখেছিলেন গ্রাম্য পরিবেশে—তাঁর অভয়াবন্দনা স্নিগ্ধ সজল গ্রাম্য পরিবেশের ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ। কবিকঙ্কণের ভাষা তাই সহজ সরল অনাড়ম্বর—ভাষাকে কারুকার্যখচিত করার কোন প্রয়াস সেখানে নেই। দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও একই কথা—পয়ার ত্রিপদীর প্রথাগত ছন্দ রূপের বাইরে মুকুন্দ পা রাখেন নি। অন্য দিকে ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি—রাজসভার ঐশ্বর্যের চিহ্ন তাঁর কাব্যে প্রভাব ফেলেছে। ভারতচন্দ্রের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই অলংকৃত। ছন্দের ব্যবহারেও নানা বৈচিত্র্য—তূণক, তোটক, ভুজঙ্গ-প্রয়াত প্রভৃতি নানা ছন্দের ব্যবহারে কবি তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন।

কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র উভয়েই মঙ্গলকাব্য লিখেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র সর্বত্র কবিকঙ্কণকে অনুসরণ করেন নি—কবিকঙ্কণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন, অনেক নতুন প্রসঙ্গ তিনি উদ্ভাবন করেছেন (বস্তুত *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ড লেখার পর তিনি আরও দুটি খণ্ড লেখেন)।

তাই যে-প্রসঙ্গগুলি উভয় কবির কাব্যে আছে সেগুলির মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে আলোচনার সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকেও এটা স্পষ্ট যে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আবেদন মূলত ইহলোক-চেতন ও বুদ্ধিমনস্ক মানুষের কাছে, আর কবিকঙ্কণের কাব্য মানুষের হৃদয়বৃত্তির কাছে।

খ. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-প্রতিনিধি কবি হলেন ভারতচন্দ্র। তিনি যুগ-প্রতিনিধি—কারণ তমসাচ্ছন্ন একটি কাল, তার সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় মুখোশকে উপড়ে স্ব-রূপে ধরা দিয়েছে তাঁর কাব্য *অন্নদামঙ্গল*-এ। তিনি রাজসভার কবি। সামন্ত দরবার আর অন্তঃপুরের বাহির আর ভিতর, ঐশ্বর্য আর দীপ্তির পাশে আত্মম্ভরিতা আর লালসা, একনিষ্ঠ ভক্তি আর দৈবী বিশ্বাসের আপাত-প্রলেপের গহ্বরে আস্থাহীনতার নিভৃত বিবর্ধন তাঁর কাছে বড় স্পষ্ট। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই সহজবোধ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে এমনই বিকৃত এক কালের প্রেক্ষাপটে এই রকম অনুধ্যানে লক্ষ করেছিলেন কবি রামপ্রসাদ সেন। দুজনের লেখনীতেই যুগ-শৈথিল্যের প্রকৃত প্রস্তাবনা ঘটেছিল, কিন্তু দু'রকমভাবে। ভারতচন্দ্র যেখানে সামাজিক চৈতন্যের অবক্ষয়ের স্মৃতিকে অক্ষয় করেন অস্থির দার্শনিকের ভূয়োদর্শনে :

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥

সেখানে রামপ্রসাদ সামাজিক দুর্নীতি আর বৈষম্যের মধ্যেও আবিষ্কার করতে পারেন পরম কল্যাণময়ী জগজ্জননীর লীলা বৈচিত্র্য :

জানি গো জানি গো তারা তোমার কেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পালকি চড়ে কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায়ে দেয় শালদোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥

তবু জীবনের সব অবস্থাকেই ভালোবেসে মানুষের প্রতি পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধায় রামপ্রসাদ এর প্রতিকার খুঁজেছেন মায়ের চরণে। দুঃখানুভূতির তীব্রতায় তাঁর ব্যক্তিসুর বেজেছে। এবং কবির সত্যদৃষ্টি গভীর আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হয়ে গেছে :

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোনোখানেতে যাই।
....
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই।

আসলে রামপ্রসাদ আমাদের শুনিয়েছেন বাংলার মাঠ-ঘাট-আকাশের অন্তরঙ্গ সঙ্গীত। সেখানে আকুল বেদনায় নিজেকে প্রথম ব্যক্ত করেছে বাংলার লোকায়ত জীবন—যে জীবন দারিদ্র্যে লাঞ্ছিত, সামাজিক প্রথার অবিচারে ক্ষত-বিক্ষত, রাজনৈতিক পতন-অভ্যুত্থানের

জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত।—তবু এক অপরূপ আধ্যাত্মিক আবেগে আপ্লুত। হৃদয়ের সহজ প্রেমধর্মে মহিমান্বিত। সুতরাং ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে বাংলার জনজীবনের দু'টি স্বতন্ত্র ধারা আঠারো শতকীয় ক্রান্তিলগ্নের ঘূর্ণাবর্তে দু'টি পৃথক রূপ লাভ করেছে। তবু আশ্চর্যের ব্যাপার অভ্যন্তরীণ শক্তির টানে এই পৃথক দুই আবর্তের মধ্যে কোথায় যেন অনিবার্য সংযোগ রচিত হয়ে গেছে। আপাত বিষম দু'জন কবি সমাজের বুকে পরস্পরের পরিপূরকতা করেছে।

ভারতচন্দ্র আত্মকেন্দ্রিক কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি দার্শনিক-স্বভাব নাগরিক কবি। শিল্পীর নির্লিপ্ততা এবং অস্মিতার সাধনা তাঁর নাগরিক শিল্প ঘরানার বৈশিষ্ট্য। সমাজ তাঁর কাছে মুখ্য হলেও শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাও তাঁর কাছে গৌণ নয়, বরং সেটাই তার কাছে অগ্রাধিকার পায়। জীবনের রসমূর্তি রচনার অভিপ্রায়ে কবি তাই বলেন—'যে হউক সে হউক ভাষা কাব্যরসলয়ে।' জীবনের রূপ রস রং আস্বাদনে ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি অংশকে তিনি সজাগ রেখেছেন। বুদ্ধি, ছলা-কলা, পাণ্ডিত্য বা প্রসাধন-প্রিয়তা সমস্ত কিছুই তাঁর কাব্যে শ্রেয়বোধের মূল্যে স্বীকৃত। কাব্যকে তিনি ভালোবাসেন, সাহিত্য-সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ, জীবনের গ্রন্থিতে আনন্দের আবীর মাখিয়ে তিনি সাহিত্য সাধনার পথ খনন করেন। কিন্তু রামপ্রসাদ সাধক কবি, তাঁর ব্যক্তিত্বে আত্মকেন্দ্রিকতা নেই, আছে সমাজের বহুজন-সমন্বিত জীবন সঙ্কটের ঘনীভূত রূপ। তাঁর বেদনা-ভাবনা-জীবনানুরাগ এবং ধ্যানধারণা সমস্তই তাঁর সামাজিক অস্তিত্বের অঙ্গ। সমাজ-সমালোচক তিনি নন। বিচারকের দায়িত্বও তাঁর নেই, শুধু দুঃখের দায়ভাগ বহন করে চলাতেই তাঁর আনন্দ। যারা পীড়িত, যারা সমাজ বৈষম্যের নিষ্ঠুর শিকার, যাঁরা নিরুপায় জীবন বহনের ক্লান্তিতে অবসন্ন—রামপ্রসাদের আকুল জীবনার্তি তাদের জীবন ব্যাকুলতার প্রতিনিধিত্ব করেছে। গ্রামীণ জীবনের পরম্পরা রামপ্রসাদের কবি-স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে বলে তিনি লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাসের সংকীর্ণতা কিংবা অসঙ্গতিকে কখনও বিদ্রূপ করতে পারেন নি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাংলা লিরিকের পুরোনো ধারার ক্ষীণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি আত্মসমাহিত কবি। লিরিকের ব্যক্তি-প্রাধান্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি তাঁর কাব্যে তেমন ব্যতিক্রমী ইমেজ তৈরি করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রামপ্রসাদের গীতিধর্মিতা ব্যক্তি-প্রাণের বিস্তারে, উপলব্ধির তীব্রতায়, বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতায় অনেকটাই অভিনব। তবু ভাবলে অবাক লাগে রামপ্রসাদের মতো ভক্তি-বিনত সাধনমার্গী কবি কি করে রুচি আর বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্য লিখতে পারলেন। শুধুই রাজ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনের জন্য ঐতিহ্যের অক্ষম প্রেরণাহীন অনুসরণ! কিন্তু ভারতচন্দ্র তো তা নন। রাজসভার রুচি ও রস-সৃষ্টির তাগিদে বিদ্যাসুন্দর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সার্থক সংযোজন হল। রামপ্রসাদে যা ছিল শুধুই অভব্য বর্বরতা, ভারতচন্দ্রের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে তা হয়ে দাঁড়ালো আর্টের সামগ্রী। কাজেই একই যুগ-প্রেক্ষিত থেকে জন্ম নেওয়া দু'জন কবি জীবনবোধের গভীরতায় পরস্পরের পরিপূরক হয়েও রাজবিলাসী সমসাময়িক পটভূমিতে স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিবাস রচনা করলেন। ভারতচন্দ্র হয়ে রইলেন নাগরিক সুরস্রষ্টা, রাজসভার কবি আর রামপ্রসাদ হয়ে উঠলেন লোকজীবনের গীতিকার। কাব্য-সৃষ্টিতে তাঁর ভারতচন্দ্রের মতো তীব্রতা নেই—'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।' নিরাসক্ত সাধক তিনি। তাঁর সাধনা মানবজীবনের সুখকল্পে

ভক্তির অর্ঘ্যে মায়ের সাধনা। জীবন ধর্মের বৈপরীত্যে ভারতচন্দ্রের সেই সাধনায় সেখানে আমিত্বের সাধনা, শিল্পের সাধনা। পুরাতন ভক্তি বিশ্বাস আর ঐতিহ্যের কাঠামোয় তাঁর কাব্য তাই 'নূতন মঙ্গল'। জীবনের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়েও মানুষের ব্যর্থতার আশা-আকাঙক্ষার অভিব্যক্তির আবেগঘন প্রকাশ অনুপস্থিত তাঁর কাব্যে। তবে ভক্তির পথে পা বাড়িয়েও কিন্তু রামপ্রসাদ হৃতশ্রী বাঙালির আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়িয়েছেন। সর্বহারার বেদনা তাঁর দুঃখের তাপে সোনা হয়ে ফলেছে—

মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত্ সোনা।

ভারতচন্দ্র এই বোধে নিজেকে অন্বিত করতে পারেন নি।

অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র : আধুনিকতা ও উত্তরাধিকার

আধুনিকতা সময় নিয়ে ততটা নয় যতটা মর্জি নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ এমনটাই মনে করতেন। যুগের আধুনিকতা থেকে সাহিত্যের আধুনিকতা সব ক্ষেত্রেই এটা সত্য। ভারতচন্দ্র যখন লিখতে বসলেন—মধ্যযুগের বদ্ধ আবহাওয়া যখন ক্রান্তিকারী আঠার শতকের নৈরাজ্যে থরথর করে কাঁপছে তখন সেই 'কবিমর্জি'-ই তাঁকে ব্যতিক্রমী করল। 'সময়'-কে অবলম্বন করেও তিনি হলেন সময়াতিক্রমী। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যগুলোকে তিনি ছাপিয়ে গেলেন তাঁর দেশকালচেতনাযুক্ত অন্তরঙ্গ সাহিত্যবোধ দিয়ে। গতানুগতিক মঙ্গলকাব্য তাঁর লেখনীর গুণে হয়ে উঠল 'সাহিত্য'পদবাচ্য। প্রখ্যাত ভারত-সমালোচক জানাচ্ছেন, সাহিত্যের হিসেবে ভারতচন্দ্রই একমাত্র মঙ্গল কবি। চণ্ডীদাসের আগে অনেকে বৈষ্ণবপদ লিখলেও যেহেতু চণ্ডীদাস 'প্রথমবারের জন্য বৈষ্ণবপদের একটা স্থায়ী ঠাট' গড়ে দিতে পেরেছিলেন, সেইজন্য তিনি পদসাহিত্যের 'আদি কবি' তেমনি—"ভারতচন্দ্রের পূর্বে বহু সংখ্যক কবি মঙ্গলকাব্য বচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই মুকুন্দরামের মতো ভুল করিয়াছেন। বাংলার সাহিত্যধর্ম না বুঝিয়া কবি যশঃপ্রার্থীরা বস্তুনিষ্ঠ কাব্যরচনা করিতে চেষ্টা করিযাছেন, সাহিত্যধর্মবিরোধী কাব্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভারতচন্দ্রই প্রথম মঙ্গলকাব্যপ্রণেতা যিনি সাহিত্যধর্মের সহিত নিজস্ব কবিপ্রতিভার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। (ভারতচন্দ্র : বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য—প্রমথনাথ বিশী) এই সমন্বয়গুণই তাঁকে আধুনিক করেছিল। এই গুণপনার জন্যই ভারতচন্দ্র কাব্যের মধ্যে অনায়াসেই মেশাতে পেরেছিলেন যুগতথ্য এবং যুগ-জীবনের সংবাদ। ব্যক্তিহৃদয়কে প্রকাশ করবার এবং অধিকার আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ইতিহাসকে প্রায় চলচ্চিত্রতুল্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি। কবিই পারেন দেবতার কাছে ব্যক্তির অধিকারের দাবিকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা কবতে :

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য
ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে।

মধ্যযুগের আর কোন্ কবি এইভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছেন ব্যক্তির অধিকারের দাবিকে, কোন্ কবি ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছেন নিজের অবস্থান থেকে। এ-অর্থে তিনি অবশ্যই আধুনিক। ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা কীভাবে সম্ভব হল—মঙ্গলকাব্যের প্রথাগত কাঠামোকে মেনে নিয়েও কাব্যে কীভাবে আধুনিক ভাবনাকে অনুপ্রবিষ্ট করতে সক্ষম হলেন তিনি সে-বিষয়টি সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভারতচন্দ্রের পূর্বে—সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যাঁরা মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন তাঁরা সবাই গোষ্ঠী জীবনকে কাব্যে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, ফলে তাঁদের কাব্যে ব্যক্তি জীবনের ছায়া পড়েছে কদাচিৎ। চরিত্ররাও কদাচিৎ গোষ্ঠীহীন ভাবনার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাপারটাই পালটে গেল। রাজনৈতিক আবর্ত, সামাজিক অস্থিরতা মানুষের জীবনকে অনিকেত করে তুলল। গোষ্ঠীজীবনে যে বিশ্বাস তা আর বজায় থাকল না। গোষ্ঠী

ভেঙে ব্যক্তিই নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করল। ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এই অস্থির সময়কে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। তাই তাঁর কাব্যে ব্যক্তিপ্রাধান্য বড় হয়ে দেখা দিল। ব্যক্তি প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে দেব-দ্বিজে মানুষের ভক্তি কমতে লাগল—কারণ নিজের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে মানুষ কাউকেই খুঁজে পেল না। *অন্নদামঙ্গল*-এ শিবের দেব মহিমার আব কণাটুকুও রইল না। ব্যাসদেব অনায়াসে দেবতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে দেখা দিলেন, বসুন্ধর ও নলকুবর অন্নপূর্ণা পুজোয় কোন আগ্রহ না দেখিয়ে রতিসুখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আধুনিক যুগ যে আগতপ্রায় তার নানা চিহ্ন অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা দিতে লাগল—ভারতচন্দ্র তাদের চিনতে ভুল করেননি—এই অর্থে তিনি আধুনিক।

মধ্যযুগে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য ছিল আপামর বাঙালির—হিন্দু-মুসলমান, ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের অবলম্বন ছিল ঐ ধর্মবিশ্বাস-ধর্মশাস্ত্র-ধর্মাচার। শাস্ত্রধর্মের দোহাই দিয়ে দুর্বলের ওপর চলত সবলের অত্যাচার। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষ হয় নি। কারণ বাঙালি মন তখনো আধুনিক হয়ে ওঠেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালির মনের যেন পর্বান্তর ঘটল। মনের আধুনিকতার লক্ষণই হল প্রচলিত বিধানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা। যে বিধান মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা করে তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন এবং যে-কোনো অনুশাসনের মূলগত যুক্তির সন্ধান করা। ভারতচন্দ্র অন্নদার মাহাত্ম্য রচনা করতে বসে সমাজ সংগঠনের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। হরগৌরীর দাম্পত্যজীবন, নলকুবেরের স্বর্গীয় মাহাত্ম্যকে ব্যঙ্গ, ব্যাসদেবের প্রজ্ঞাঘন মূর্তির ভাঙচুর ঘটিয়ে তাঁকে সংশয়াচ্ছন্ন কালের দূত হিসেবে চিত্রণ—সব কিছুতেই যেন কবির পরিহাসপূর্ণ দৃষ্টিপাত। বিনীত অথচ দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের ভাষায় এতদিনকার সুললিত দৈবী বিশ্বাস আর আচারের মূলে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া।

কবিতা লেখা অথবা কাব্যচর্চা যে প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বে নিখাদ কলাবিদ্যা হয়ে উঠতে পারে তাও দেখালেন ভারতচন্দ্র। মধ্যযুগের সাহিত্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই মূলত রচিত হত। তাই স্বাধীনভাবে কাব্যরচনার ব্যাপারটি সে-যুগে কোনভাবেই আমল পেত না। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলো তো শক্তির লীলাখেলার পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শৈব মহিমাও হার মেনেছে শক্তির কাছে। আরও মজার ব্যাপার, কবিদের দেবতা নির্বাচনও হত সামাজিক স্ট্যাটাসকে খেয়াল রেখে। দলিত বা নিম্নবর্গের হাড়ি, ডোম প্রভৃতির আরাধ্য দেবতা ধর্ম ঠাকুরের মহিমা রচনা করতে সন্ত্রস্ত হতেন ব্রাহ্মণ কবি। এমনকি বর্ণশ্রেষ্ঠর পক্ষে ধর্মের গান রচনা কিংবা আসরে সে গান গাওয়া চূড়ান্ত অপরাধ বলেও বিবেচিত হত। সেই অপরাধে জাতিচ্যুতিও ঘটত। যেমন ঘটেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরাম চক্রবর্তীর। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী স্বয়ং ধর্মদেবতার নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁর মহিমা সঙ্গীত রচনা করতে দ্বিধা করেছেন :

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে॥

স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সাহিত্য তাতে নন্দনতাত্ত্বিক প্রেরণা কোথা থেকে আসবে? স্বভাবতই এই ধরনের সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারেও একটা দায়সারা ছাপ পড়েছিল। লৌকিক ভাষায় মাধুর্যহীন ভঙ্গিতে এসব কাব্যচর্চা চলত একটানা। ভাষার লোকগ্রাহ্যতা নিঃসন্দেহে

প্রশংসনীয়—কিন্তু সাহিত্যের নিরিখে নয়। মুখের ভাষা কাব্যের ভাষার উপাদানমাত্র। তা আদর্শায়িত হয়ে উঠে কাব্যভাষায় পরিণত হয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকবিদের ভাষায় এই আদর্শীকরণ নেই। কিন্তু ভারতচন্দ্রে আছে। কবিতা বা কাব্য যখন মণ্ডনশিল্পকে আশ্রয় করে কবিত্বশক্তির প্রকাশক হয়ে ওঠে তখনই ভাষার সাহিত্যিকরণ হয়। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিল। অপরূপ বাক্-সিদ্ধির জাদুতে মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক বিষয় ছেড়ে, ভাষার চর্বিতচর্বণ ছেড়ে মোহময় পোশাকটি পরেছিল এই কাব্য। কি স্তোত্র রচনায়, কি সংলাপ সৃষ্টিতে, কি বিষয়বস্তু বর্ণনায়, কি অলঙ্কার প্রয়োগে, ছন্দৈবৈচিত্র্যে ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই ভাষাসিদ্ধি। তাঁর আধুনিকতার অন্যতম সার্থকতা এখানেও। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর *কবি ভারতচন্দ্র* বইতে লিখছেন, "নাটকের জন্য চাই ঠিক শব্দটি আর রোমান্টিক কাব্যের জন্য—অপূর্ব শব্দটি। ঠিক শব্দটি প্রয়োজন পূরণের সার্থকতার আনন্দ আমাদের দেয় আর অপূর্ব শব্দটি আমাদের বাড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়।" *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এই দুটি গুণই—নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ বর্তমান। গোটা আখ্যান জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই নাট্যগুণ আর রোমান্টিক গানগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে কাব্যগুণ। অপূর্ব শব্দ—অনবদ্য ধ্বনিমাধুর্যে সমৃদ্ধ হয়ে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে সংযোজিত সঙ্গীতগুলি কাব্যে অন্যতর মাত্রা যোজনা করেছে। আর এই দুই জাতীয় প্রয়াসের জন্য একদিকে তিনি ফরাসী নাট্যধর্মিতার বাহক অন্যদিকে বাঙালি রোমান্টিসিজমের প্রতিনিধি। আর ঐ দুয়ের সংমিশ্রণে তাঁর কাব্যের ভাষা, জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়কে বহন করার শক্তি ধরল। তিনি হলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যভাষার জন্মদাতা। একদিকে জ্ঞানবস্তুর প্রকাশ, অন্যদিকে সজীব জীবনের চঞ্চলতাকে ধারণ, একদিকে সাধারণের মুখের কথাকে সাহিত্যকর্মে লাগিয়ে ভাষার দেহরক্তে স্বাস্থ্যের উন্মাদন সঞ্চার অন্যদিকে অলঙ্কার ছন্দে তার প্রসাধন সম্পাদন—মেঠো গ্রাম্য লৌকিক গতিহীন বাংলা ভাষা ক্রমে আভিজাত্যের জড়োয়ায় নতুন করে সজ্জিত হল—মার্জিত হল, আধুনিক হল। দেবীর পাদস্পর্শে একদিন ঈশ্বরীর কাঠের সেউতী সোনায় পরিণত হয়েছিল—ধ্যান ভেঙে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল পাটুনি ; আপনমনে বলেছিল ; 'এতো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।' অতঃপর :

তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিলা পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥

তপজপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥

পাটুনীর নির্বন্ধাতিশয্যে দেবী তাঁকে আত্মপরিচয় দান করলেন এবং চতুর্বর্গ যাঁর করতলে সেই অন্নদার কাছ থেকে এই সরল গ্রাম্য মানুষটি আশ্বাস পেল নব আশ্বাসে ভরা নিরুদ্বিগ্ন জীবনের। আর এই অপরূপ চিত্রের কথকতা করছিলেন যিনি, মধ্যযুগের সেই মঙ্গলকবি অর্জন করলেন আধুনিক কবির মান ও মাত্রা—এক অজানা অনাগত যুগ সম্ভাবনার সার্থক পূর্বসূরিত্ব॥

ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার :

কবির উত্তরাধিকার মানে উত্তরপুরুষের মধ্যে সে কবিব বেঁচে থাকা। অন্য অনেক কবির মতো ভারতচন্দ্র জানতেন প্রতিভাগুণে যদি তাঁব কাব্য বাঁচে তাহলে তাঁর নাম বাঁচবে। যদি নাম বাঁচে তবে প্রতিভাটুকু স্বীকরণের জন্য, বরণের জন্য, আত্মস্বীকরণের জন্য উত্তরাধিকাবীর দলও তৈরি হবে। তাঁর কালে কবিদের জীবনী লেখার চল হয়নি—তাই নিজের বরণডালা তাঁকে সাজাতে হয়েছিল নিজেকেই। খুব সন্তর্পণে খুব সাবধানে নিজেকে বসভোক্তা সমাজে তুলে ধরেছিলেন তিনি। আসলে উত্তরাধিকার সৃজনের এই তো রীতি । আবার কবিরূপে তিনি আত্মভিমানী, কিন্তু কালচার্ড মানুষ হিসেবে আত্ম-অহংকে মনোরম শীতলপাটিতে মুড়ে বিনয়ী থাকতে পারেন। তবু নিজের অস্তিত্বটুকু জানান দেবার কৌশলটুকু তাঁর অজানা ছিল না। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে কবি স্বয়ং অন্নদাকে দিয়ে নিজের জীবনী বলিযে নিয়েছেন। বাড়তি কিছু প্রতিশ্রুতি আদায়ও করেছেন। দেবী বললেন :

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানেব আরশী॥
জ্ঞানবাস হবে সেই আত্মার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥

দীর্ঘ জ্ঞানসাধনা ; বিপুল পাণ্ডিত্য—তবু ভারতচন্দ্রের পণ্ডিত হতে না চেয়ে কবি হতে চাওয়া। সে কবিও নিছক মধ্যযুগের প্রথা মেনে মঙ্গলকবি নয়—রিয়ালিজমেব মধ্যে রোমান্সেব মিশেলে 'অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'র প্রকাশ ঘটানো। আশা তাঁব বিপুল, প্রয়াসও কম নয়। তবু মঙ্গলকাব্যের ছাঁদকেই অবলম্বন কবতে হল। নয়তো রাজপৃষ্ঠপোষকতা মিলবে না। আর তা না মিললে বুধসমাজে প্রতিপত্তিই বা ছড়াবে কি করে? তাই অন্নদাকেন্দ্রিক দেব-মঙ্গলকে কেন্দ্রে রেখে তিনি আসলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলেন কামমঙ্গল— কাঞ্চনমঙ্গল। পরখ করে দেখতে লাগলেন সমাজের নিম্নাভিমুখী প্রবাহ কোন্ তলানিতে ঠেকতে চলেছে। আর তার পাদপীঠে দাঁড়িয়েই তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তিনি বিশ্বাসের কবি হবেন না অবিশ্বাসের। বস্তুনিষ্ঠ কাব্য লিখবেন নাকি রোমাণ্টিক কাব্য। আসলে এই আত্মজিজ্ঞাসার মূলে ছিল তাঁর বৈদগ্ধ্য—শুধু শিক্ষার পরিমাপকে নয়—জীবন-অনুসন্ধিৎসার গভীরতায় যার মান নির্ণয় করতে হয়।

এ হেন ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের কবি হলেও এমনকি সাহিত্যের ইতিহাসগত সংজ্ঞায় অন্ত্য-মধ্যযুগের শেষ প্রতিভাবান কবি হলেও তিনি কি *অন্নদামঙ্গল*-এর মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেলেন! একথা ঠিকই সত্যনারায়ণ পাঁচালি, নাগাষ্টকম ইত্যাদির মধ্যে *অন্নদামঙ্গল*-এই তাঁর কবি ভাবনার পরিণতি ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন, সেই নন্দিত অথবা বিতর্কিত কাব্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোনো স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যেতে পারল কি?

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় দুটো প্রসঙ্গ আসতে পারে :

এক ভারতচন্দ্রের চিন্তাপ্রবাহ পরবর্তী শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিভার সৃষ্টিতে কিভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা।

দুই. উত্তরযুগ তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে কতটা বাঁচিয়ে রেখেছে সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে তা সন্ধান করা।

প্রথম প্রসঙ্গের আলোচনায় আসা যাক। *অন্নদামঙ্গল*-এর প্রথম খণ্ডে 'শিববিবাহ যাত্রা' উপলক্ষে ভারতচন্দ্র বলছেন :

শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ
সবে হৈলা যত্নবান।
পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান॥
....
এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়।
ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ
লম্ফ ঝম্প দিয়া চলে।
মহা ধুমধাম হাঁকে হুম হাম
জয় মহাদেব বলে॥
সহজে সবার বিকট আকার
সহিতে না পারে আলো।

হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ॥

অন্নদামঙ্গল-এর এই বিশেষ বিষয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথের একটি অতি বিখ্যাত কবিতা আছে এখানেও বিষয়বস্তু শিবের বিবাহ-যাত্রা। এখানেও বর্ণনীয় বিষয় গৌরীর মিলনোৎসুক পুলক। কিন্তু আলেখ্য রচনায়, রূপকল্পনায় পরিবেশ-সৃষ্টিতে শব্দঝংকারে ও ভাব-গভীরতায় প্রভেদ ঘটে গেছে দুই কালের দুই শিল্পীর। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

যবে বিবাহ চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপাট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্‌বম বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ ;
তাঁর বিষাণ ফুকরি উঠে তান,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

ভারতচন্দ্রে এ রস হিন্দোলের পূর্ণতা নেই। কিন্তু ভূমিকা আছে। উত্তরপুরুষের মনীষাকে অবারিত করবার যথাসাধ্য উপকরণের সঞ্চয় আছে।

'বিদ্যাসুন্দর' *অন্নদামঙ্গল*-এর গর্ভকাব্য। এ গ্রন্থের আলোচ্য অংশে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়ে না। তবু ভারতচন্দ্রের 'উত্তরাধিকার' আলোচনায় 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের প্রসঙ্গ আসবেই। উত্তরাধিকার সৃজনে এ-কাব্যের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি। যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায়, 'বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ' অংশে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলনকে সার্থক করতে সুমধুর সঙ্গীতের প্রয়োগে নিষ্পাপ পরিবেশ রচনা করলেন কবি :

সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা।।
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন।।

আর রবীন্দ্রনাথের *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের 'চৌরপঞ্চাশিকা' কবিতায় ভাবতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দর অপরূপ প্রতীকী রূপকল্পে বাঁধা হয়ে গেল। বিদ্যাসুন্দরের রাবীন্দ্রিক প্রেমোপাখ্যানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল নিখিল বিশ্বেব চিরন্তন প্রেমাকুলতার পরম সিদ্ধি।

—ওগো সুন্দর চোর
তোমারি রচিত শোনার ছন্দ—
পিঞ্জরে তারা ভোর।
দেখিতে পায় না কিছু চারিধারে
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চির শয়ন দুয়ারে—
ওগো সুন্দর চোর
আজি তোমাদের দুজনের চোখ
অনন্ত ঘুমঘোর।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে গীতিকাব্যিক লক্ষণ পাঠককে আকৃষ্ট করবেই। আর পাঠক যদি মহৎ স্রষ্টা হন তবে তো কথাই নেই। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ধুয়াগানগুলোয় সেই বিশুদ্ধ লিরিক্যাল কবিমর্জি লক্ষিত হয়। এ যেন কাব্যভুলে কবির আপনমনে গান গেয়ে চলা। আর আপনমনের সেই গানে কখন যেন শাক্ত কবি হয়ে যান বৈষ্ণব। দেবী অন্নদা বা কালিকার মহিমা কীর্তন কখন রাধা-কৃষ্ণপ্রেম মুগ্ধতায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিশেষ করে বিদ্যাসুন্দরে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রতি পর্যায়ের আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকা তেমনি বিদ্যাসুন্দরের প্রতি অধ্যায়ের উপরে স্থাপিত রাধা-কৃষ্ণ গানগুলি যেন কৃষ্ণচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণলীলা আর বিদ্যাসুন্দরকেলিতে প্রভেদ অনেক। তবু উভয়ে কোথায় যেন প্রেমের মন্ত্রে সর্বস্বসমর্পণ। তীব্র সুখের উষ্ণতার মধ্যেও বাসনার্ত প্রাণ যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখনই যেন বাসনার পরম বিগ্রহ বাঁশি বাজান প্রাণমূলে টান দিয়ে—হৃদয়ামন্থনে রক্তপদ্মের মতো ফুটে ওঠে সঙ্গীত।

প্রাণ কেমন রে করে না দেখে তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে।।

ভারতচন্দ্রের সব সঙ্গীতের মর্মকথা এই। এই পরাণবধুর খোঁজ আর একটি গানে সেই অন্বেষণের অবসান। এই গানটি সাহিত্যের একটি সেরা গান বলে স্বীকৃত :

ওহে বিনোদ রায়, ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।।
নব জলধর তনু শিখিপুঞ্জ শক্রধনু
পীতধড়া বিজলীতে ময়ুরে নাচাও হে।।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে।।

ভারতচন্দ্রের প্রভাবে মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা* কাব্য বৈষ্ণব পদাবলী ছত্রছায়ায় থেকেও ভারতচন্দ্রীয় হয়ে গেছে। মাইকেল কেবল ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই আত্মসাৎ করেননি—সুরটিকেও আত্মস্থ করেছিলেন। *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যের 'বংশীধ্বনি' কবিতায় পরম বংশীবাদকের অপরূপ নিশাদন বিদ্যাসুন্দরের 'বিনোদরায়'-কেই মনে করায় :

কে ও বাজাইছে বাঁশী স্বজনি
মৃদু মৃদুস্বরে নিকুঞ্জ বনে?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে,
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

ভারতচন্দ্রের অনুসরণে রঙ্গলাল ভুজঙ্গপ্রয়াত ও মালঝাঁপ পয়ারে অধিকতর মনঃসংযোগ করেছিলেন—তার *কাঞ্চীকাবেরী* কাব্যের মণিকা গোয়ালিনী হীরামালিনীর-ই অনুরূপ। পৃথ্বীচন্দ্রের *গৌরীমঙ্গল*, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের *গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী*, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *বাসবদত্তা*, অক্ষয়কুমার দত্তের *অনঙ্গমোহন* প্রভৃতি কাব্যেও ভারতচন্দ্রের স্পষ্ট প্রভাব। আবার নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত খেঁড়ু বা খেউড় সংগীত ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাগরিক আভিজাত্য লাভ করে চুঁচুড়া ঘুরে কলকাতার নিধুবাবুর গানে পরিশোধিত রূপ লাভ করেছিল।

ভারতচন্দ্রের কাব্য একদিকে যেমন গীতিকাব্যিক অন্যদিকে তেমনি গভীর নাট্যগুণসম্পন্ন। বিদ্যাসুন্দর অংশের নাট্যলক্ষণ অবলম্বনে উনিশ শতকে বেশ কিছু নাটক রচিত ও অভিনীত হতে দেখা যায়। যেমন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত *বিদ্যাসুন্দর* নাটক কিংবা তারই অনুসরণে হিন্দি কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের রচনা *বিদ্যাসুন্দর* নাটক বাংলাদেশে বহুবার পেশাদার এবং সখের দল কর্তৃক অভিনীত হতে দেখা গেছে। এছাড়া গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফের উদ্যোগে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম অভিনীত (১৭৯৫-৯৬) হওয়া *দি ডিসগাইজ*-এ ভারতচন্দ্র প্রণীত সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। আবার ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে এবং রবীন্দ্রনাথ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ছাপাখানা চালু হবার পরে ইংরেজি ভাষাতেও যে-সব বাংলাভাষা সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সে সবের ভূমিকায় অথবা দৃষ্টান্তবাক্যে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* বিশেষ করে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অজস্র অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। হ্যালহেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮), ফস্টারের অভিধান (১৭৯৯-১৮০২), লেবেডফের ব্যাকরণ (১৪০১) প্রভৃতি গ্রন্থে এর প্রমাণ মিলবে।

এ তো গেল ভারতচন্দ্র স্বীকরণের একদিক। অন্য একটি দিকও আছে। সেটি ভারতচন্দ্র-সমালোচনার ধারা। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য চর্চার একটা বড় অংশ অধিকার করেছিল

ভারতচন্দ্র-চর্চা। একদিকে কাব্য-নাটক-ব্যাকরণ-সঙ্গীতে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার অন্যদিকে মধুসূদন-পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠকবির শিরোপায় সম্মানিত করে এক ধারাবাহিক সমালোচনায় ও ভারতচন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রেরণায় তাঁকে স্মরণ ও বরণ।

ভারতচন্দ্রের প্রথম সমালোচক বলে কথিত রাধামোহন সেন ১৮৩৩-এ *অন্নদামঙ্গল* প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের গোড়ায় স্বয়ং রামমোহন রায় ভারতচন্দ্রের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে জানান'', 'বাঙ্গালা' ভাষায় একখানি কাব্যরচনার আমার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভারতচন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারিব না বলিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইয়াছি।'' (ড. যোগীন্দ্রনাথ বসু : *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*) মিশনের পাদরি ওয়েঙ্গার ১৮৫০-এ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় (ত্রয়োদশ খণ্ড) Popular Literature of Bengal নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যাতে ভারতচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা ছিল। এমনকি পাদরি ভারতচন্দ্রের দুটি দেববন্দনার ইংরেজি গদ্যানুবাদও করেন এবং সবিনয়ে জানান, ইংরেজি গদ্যে তিনি মূলের রস ফোটাতে পারেননি। ১৮৫৫ সালে ভারতচন্দ্র চর্চার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে যখন ঈশ্বরগুপ্ত প্রকাশ করেন *কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত*। বাঙালি কবির এটাই সর্বপ্রথম জীবনী। ভারতচন্দ্রের প্রতি ভাবীকালের এ এক যুগান্তকারী শ্রদ্ধা নিবেদন। এই সময় বাংলার সাহিত্যজগতে সামগ্রিকভাবে ভারতরসের স্রোত বইছিল। ঐতিহাসিক রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর *বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭২) গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের স্তুতি করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেছেন *অন্নদামঙ্গল*-এর সংস্করণ। অনুরাগ আর বিরাগ—দুয়ে মিলেই স্রষ্টার জনপ্রিয়তা। ভারতরসের স্রোতে অবগাহন করছে যখন বাঙালি পাঠক তখন বিরুদ্ধ ঢেউয়ের ধাক্কাও দু একটা আছড়ে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী লিটারেচর' (১৮৭১) প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রকে বরখাস্ত করেছেন। তাঁর মতে, ''ভারতচন্দ্রের কাব্যে উচ্চতর মানবিক গুণ নেই, চরিত্রসৃষ্টি নেই, সৃষ্টি বলতে এক হীরা মালিনী—সত্যিই সজীব। তাঁর ছন্দ অবশ্য প্রশংসাযোগ্য। আধুনিক কবিদের দ্বারা অনুকৃত এবং তিনি আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা।'' নিন্দার মধ্যেও প্রশংসা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (১৮৯৬ খ্রি.) গ্রন্থে ভারতচন্দ্রকে আক্রমণ করলেন—তবু রচনাশক্তিকে বাহবা না দিয়ে তিনিও পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন সমালোচক বা দীনেশচন্দ্র সেন—প্রমুখেরা ভারতচন্দ্র বিরোধিতায় নেমেছিলেন প্রধানত 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অশালীন বা রুচি বিগর্হিত অংশের জন্য। সাংস্কৃতিক অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা রায়গুণাকরকে। কিন্তু সে অভিযোগের উৎসে কোনও গভীরতর ব্যাখ্যা ছিল না—যা ছিল রবীন্দ্রনাথে। 'মানবপ্রকাশ' বা 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে তিনি সেই গভীরতর কারণ অনুসন্ধান করলেন। ভারতচন্দ্র নতুন করে আবিষ্কৃত হলেন এক বিশেষ যুগের উত্তেজক প্রেক্ষাপটে। রবীন্দ্রনাথ জানালেন : ''একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। ...তখনকার দিনের নাগরিক সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়েছিল, তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসাকাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয় তার আগুনের শিখাটাই আসল।''

প্রমথ চৌধুরী—ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। শ্রেষ্ঠ সমালোচক এই কারণে, ভারতচন্দ্রের নবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি এমন কিছু বলেছেন যা পূর্বে বলা হয় নি। ভারতচন্দ্রের ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দোভঙ্গির অপরূপতা কিংবা ভাবের দিক থেকে বাংলাসাহিত্যে তাঁর

সেকুলারভাবের প্রবর্তনা, কিংবা কবির নিজস্ব রোমাণ্টিকতা—এসব তো নতুন কিছু নয়। বরং প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনার অভিনবত্বের মূলে আছে ভারতচন্দ্রকে 'সাহিত্যে অমরতা'র কেন্দ্রে স্থাপন। ..."গত একশ আশি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরেজের রাজ্য ; আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরেজ-রাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরই নাম সাহিত্যে অমরতা।"

প্রমথ বিশী তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *অমাবস্যার গান* উপন্যাসে আধুনিককালেও ভারতচন্দ্র চর্চার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। ব্যক্তি আর ঘটনা হারিয়ে যায়। যুগ পরিবেশ সরে যায় দূরে। থেকে যায় সৃষ্টির অমরাবতী। মহৎ স্রষ্টার উত্তরাধিকার। পরবর্তী-সার্থক প্রজন্ম সেই ইতিহাসকে ধারণ করে মিলিয়ে দেয় নবীন যুগের বহতাস্রোতে; ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গেও এই একই কথা। ভারতচন্দ্র বিশ্বাসী—তিমিরবিলাসী নন। বরং তিমিরান্ধ প্রতিবেশে বসে তাঁর তিমিরহননের সঙ্গীতসাধনা। মানুষকে মুক্তিস্বপ্ন দেখান তিনি—সে মুক্তি শুধু, দেশকালের তামসিক আবহ থেকে নয়, মানুষের অজ্ঞাত, অন্ধকারতম অবচেতনের কর্তৃত্ব থেকেও। যদি কখনও সেই মুক্তির দিন আসে তখনই বাঞ্ছাফলসুখ লাভ করবে আমাদের পূর্বপুরুষ, ঈশ্বরী পাটুনি। সন্তানকে দুধে-ভাতে রাখার প্রাগৈতিহাসিক কামনা আমাদের বিশ্লেষণী চেতনার আলোয় সেদিন শাশ্বতরূপ পাবে। আমরা হয়তো বুঝব, এ দুধ ভাতের চাহিদা আসলে নিছক পেটভরার দায় থেকে আসেনি, এসেছে উত্তরাধিকার ও পরম্পরাসৃজনের তাগিদে। সে পরম্পরা 'প্রণষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে' 'শোচনীয় কালের বিপাকে' নিজেদের সান্দ্র বিশ্বাসকে হারিয়েও সুচেতনার বোধে পূর্ণ হয়ে স্বীকৃতি জানাবে—তাদের অগ্রজকে।

পরিশিষ্ট

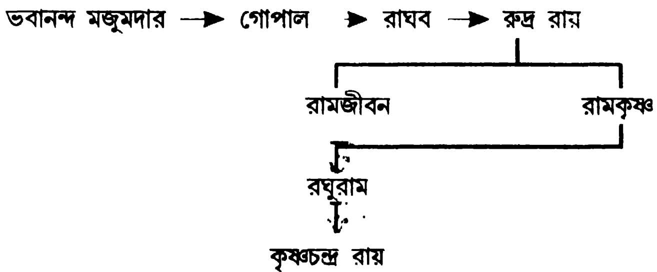
পরিশিষ্ট—১

ক. কৃষ্ণচন্দ্র রায় : বংশ ও ব্যক্তি পরিচয়

ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। বিখ্যাত তিনি নানা কারণে—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হল তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। 'রায়গুণাকর' অভিধাটি কৃষ্ণচন্দ্রেরই দেওয়া। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তি পরিচয়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র বাদশাহর ফরমানে মনসবদার বা রাজা হয়েছিলেন—কোন নবাবের দাক্ষিণ্যে তিনি রাজা হননি। এক্ষেত্রে তাই অন্যান্য জমিদারদের চেয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মান ছিল অনেক বেশি। বাদশাহর অনুগ্রহে যে-সব অধিকার ও সম্মান তিনি লাভ করেন সেগুলি হল : (ক) কৃষ্ণচন্দ্র নিজগৃহে সানাই বাজানোর এবং ঘরোয়া জমির জরিপের অধিকার। (খ) কৃষ্ণচন্দ্র প্রাসাদচূড়ায় ঘড়ি নিশান ও নহবৎ বসানোর অধিকার পেয়েছিলেন। (গ) নবাব আলিবর্দি তাঁকে 'ধর্মচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র উল্লেখ করেছেন : 'দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।' সমাজপতি হিসেবেও তিনি সম্মান পেতেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তি পরিচয় ছাড়াও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রসঙ্গ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী—তিনি দুবার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁর দুই স্ত্রী-ই ছিলেন পরমাসুন্দরী। কৃষ্ণচন্দ্রের ছয় পুত্র—শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র এবং তিন কন্যা ছিল। সেকালের রীতি অনুযায়ী জামাতাদের নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া বহু আত্মীয় এবং আশ্রিত তাঁর গৃহে থাকার সুযোগ পেত।

কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ পরিচয়



কৃষ্ণনগরের রাজসভা :

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তি ও বংশ পরিচয় ছাড়াও কৃষ্ণনগর রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তার এক অনুপুঙ্খ বিববণ ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দিয়েছেন। এই দরবারি সভার পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাহিত্য ও শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে নবীন সৃষ্টির বা মহোত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার কোন আয়োজন ছিল না। অবসর বিনোদনের জন্য একধরনের চটুল ভঙ্গির চর্চা এই দরবারে চর্চিত হত। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজদরবারে একদিকে যেমন ছিল চৌষট্টি কলা-নৃত্যগীত-শিল্পাদির স্থূল চটক—এষণা ও মননের দৃপ্ত উল্লাস,

অন্যদিকে তেমনি ব্যঙ্গবিদ্রুপ ছলাকলাময় সুদক্ষ ভাঁড়ের কুরুচিময় অশ্লীল দরবারি-রসিকতার প্রকাশ। গোপাল ভাঁড়, হাস্যার্ণব ভাদুড়ী এবং কেনারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রসিকপ্রবরেরা রাজসভার জীবনচর্যাকে কলুষিত ও বিমোহিত করে রেখেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সমকালের জীবন-পরিবেশে, ভাষা-সাহিত্যে, মর্মে-কর্মে রাজসভার স্থূল রুচি প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমগ্র দেশের অবক্ষয়ী জীবনযাত্রার প্রতীক হিসেবেই যেন এই রাজসভার অস্তিত্ব। সর্বত্রই শৈথিল্য, সাধারণ মানুষ জীবনের নিঃসাড়তা ও আত্মপ্রতারণায় মোহাচ্ছন্ন ছিল। ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ-যুগের চরিত্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে পড়া যায় : "যে চারিত্রিক দুর্বলতা ও প্রাণের দীনতা কায়িক ঐশ্বর্য-বিলাসের তলে চাপা পড়িতেছিল, যে মেকী ও নকল জীবন খাঁটি ও আসলের নামে বিকাইতে ছিল, তাহার সম্বন্ধে কাহারও কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। জীবনের এই দৃষ্টি-হীনতা, জীবনের ধ্যান-কল্পনা ও ভাবাদর্শের এই আচ্ছন্নতা, কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; অনেকদিন ধরিয়া ক্ষয়িষ্ণু নবাবী শাসনতন্ত্রের সমগ্র শেষ পর্যায় ধরিয়া, সেই নবাবী জীবনধারায় জীর্ণ ও ম্লানোন্মুখ ঐশ্বর্য, বিলাস-ব্যসন এই বাংলার সামন্ত নৃপতিগণের জীবনে একটু একটু করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে।...অষ্টাদশ শতকের এই দরবারী ও নাগর জীবনও তাই অনেকদিন ধরিয়া অন্ধকারময় পরিবেশে ছিল আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত।" নাগরিক ও দরবারী জীবনের এই পরিবেশে লালিত ও পুষ্ট ভারতচন্দ্র অবশ্য এই সভায় জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন।

খ. কৃষ্ণনগরের রাজসভা : সভাসদদের পরিচিতি

কৃষ্ণনগর শহরটি নানা কারণে বিখ্যাত ছিল। বস্তুত শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য-লালিত নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের সঙ্গেই কৃষ্ণনগরও আপন ঐতিহ্যে ধনী ছিল। এই শহরের সবচেয়ে গৌরবময় কাল হিসেবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলকে চিহ্নিত করতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র রায় রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে আঁতাত করে সিরাজের পতনকে অনিবার্য করে তোলেন এবং পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলে এই রাজবংশের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে যে-কারণে বাঙালি কৃষ্ণচন্দ্রকে মনে রাখবে তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন এবং সভাকবি থাকাকালীন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য *অন্নদামঙ্গল* রচনা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রে রাজসভা অলংকৃত করতেন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি—বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা কৃতী ছিলেন। এঁদের কথাও ভারতচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার পারিষদবর্গের পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হল :

১. গদাধর তর্কালঙ্কার — মুখ্য পুরাণ-কথক।
২. কালিদাস সিদ্ধান্ত — সংস্কৃত পণ্ডিত।
৩. কন্দর্প সিদ্ধান্ত — সংস্কৃত পণ্ডিত।
৪. অনুকূল বাচস্পতি — জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত। ইনি ছাড়া রাজসভায় আরও জ্যোতিষী ছিলেন।
৫ গোবিন্দ রায় প্রধান — ইনি আয়ুর্বেদ (প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র) চিকিৎসক ছিলেন। তাছাড়া এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ এবং আরও চিকিৎসক রাজসভায় ছিলেন।

৬. শঙ্কর ও তরঙ্গ — মহারাজার অন্তরঙ্গ দুই পরিচারক।

৭. হরহিত ও রামবোলা — মহারাজের ব্যক্তিগত অঙ্গরক্ষক।

৮. গোপাল চক্রবর্তী — দেওয়ান 'সহবতী'—রাজসভার বিশেষ অনুষ্ঠান হলে ইনি সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন।

৯. মদন গোপাল রায় — এঁকে বক্সী বা রায়বক্সী বলা হত। ইনি রাজস্ব ধনের রক্ষক ছিলেন এবং বেতন দিতেন।

১০. কিঙ্কর লাহিড়ী — ইনি ছিলেন পারসি ভাষার প্রধান লেখক ও সম্পাদক। এঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

১১. বিশ্রাম খাঁ — দক্ষ কালোয়াত। ইনি ছিলেন তানসেন ঘরানার অন্তর্ভুক্ত গোয়ালিয়রের সাঙ্গিতকী সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরিত মুসলমান হিন্দু বংশোদ্ভূত গায়ক। এই সময়ে (সতেরো-আঠারো শতক) বাংলা দেশের প্রায় সব রাজা-জমিদারেরা উত্তর ভারতের বিভিন্ন সংগীত ধারার অনুরাগী ছিলেন। এরই ফলস্বরূপ বিষ্ণুপুরে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা শুরু হয়, যা বিষ্ণুপুর ঘরানা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজসভায় সংগীত চর্চা হবে এবং সঙ্গীতজ্ঞ থাকবেন এ তো স্বাভাবিক।

১২. সমাজ খেল — ইনি ছিলেন মৃদঙ্গ-বাদক। সম্ভবত উত্তর ভারতীয় মুসলমান। ভারতচন্দ্র তাঁকে কিন্নর-আকৃতি বলেছেন। কিন্নরেরা ছিলেন দেবতাদের সঙ্গীতকার—তবে মনুষ্য মস্তকের পরিবর্তে তাঁদের থাকত অশ্বমস্তিষ্ক।

১৩. শের মামুদ — ইনি ছিলেন উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্যে পারদর্শী। শের মামুদ উত্তর ভারতীয় রীতিতে কথক নৃত্যের শিক্ষা দিতেন। মোহন ও খোষালচন্দ্র নামে আরও দুজন নর্তকের উল্লেখ করেছেন ভারতচন্দ্র। মনে হয় এঁরা ছিলেন শের মামুদের সহকারী।

১৪. কার্তিক — ভারতচন্দ্রের লেখায় পাচ্ছি 'ঘড়ীয়াল কার্ত্তিক'। প্রাসাদের সব ঘড়ির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল এঁর ওপর। (মনে পড়তে পারে বিমল মিত্রর *সাহেব বিবি গোলাম* উপন্যাসে ঘড়িবাবুর কথা—ঘড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন বলে তিনি ঘড়িবাবু বলেই পরিচিত ছিলেন) ভারতচন্দ্র কার্ত্তিকের আগে 'ঘড়ীয়াল' শব্দটি যে অর্থে (ঘড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করেন যিনি) ব্যবহার করেছিলেন সেই অর্থে শব্দটি আর এখন ব্যবহৃত হয় না। এখন ঘড়িয়াল বলতে 'ঘোড়েল' বা অতি ধূর্ত ব্যক্তিকে বোঝায়।

১৫. খানজাদ চেল	—	এরা ভৃত্যের দল—এদের জন্ম রাজবাড়িতেই। এদের কর্মব্যস্ততায় রাজবাড়ির পরিবেশ থাকত মুখর।
১৬. মামুদ জাফর	--	রাজার সেনাদলে ইনি ছিলেন একজন মুসলিম জমাদার। ভারতচন্দ্র জানাচ্ছেন আলিবর্দির ওড়িশা আক্রমণের সময় জগন্নাথ তাঁর শৌর্যে খুশি হয়ে তাকে সম্মানিত করেন : 'জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর।'
১৭. মুজঃফর হোসেন	—	ইনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ—রাজার তীরন্দাজ সেনাদলের নেতা ছিলেন সম্ভবত। ভারতচন্দ্র এঁকে কর্ণের মতো তীরন্দাজ অভিধায় ভূষিত করেছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দাজ। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের সৈন্যবাহিনীতে যে একজন দক্ষ তীরন্দাজ থাকবেন এ তো স্বাভাবিক।
১৮. পঞ্চম সিংহহাজারী ভগবন্ত সিংহ হাজারী ও যোগরাজ হাজারী	—	এঁরা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের ভোজপুরী সেনাবাহিনীর অংশ। মোগল রাজত্বের সময় থেকেই নদীয়া রাজ্যের সেনাবাহিনীতে একদল ভোজপুরী ও বুন্দেলি সৈন্য ছিল। পদাতিক সৈন্য হিসেবে ভোজপুরীরা এবং অশ্বারোহী সেনা হিসেবে বুন্দেলখণ্ডের রাজপুতরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিত। ইন্দ্রসেনের পুত্র পঞ্চম সিংহ হাজারী এবং যোগরাজ হাজারী এই ধরনের 'হাজার' (হাজারি যিনি হাজার সৈন্যের অধিকর্তা) সৈন্যের অধিকর্তা ছিলেন বলে মনে হয়। 'অতি যুদ্ধে মজবুত' ভগবন্ত সিংহ ছিলেন সম্ভবত একজন অশ্বারোহী সৈনিক। আজকের দিনেও
বড় দ্বাররক্ষক		বড় জমিদার বা ভূস্বামীদের বাড়িতে যে ভোজপুরী রাখার ঐতিহ্য দেখা যায় তা সম্ভবত পূর্ব ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখেই।
১৯. রঘুনন্দন মিত্র	—	ইনি ছিলেন দেওয়ান। অর্থাৎ রাজার সমস্ত সম্পত্তির রক্ষক। এঁর দুই ভাই রামচন্দ্র ও রাঘব তাঁকে এই কাজে সহায়তা করতেন।
২০. নীলকণ্ঠ রায়	—	ইনি ছিলেন সম্পত্তির রেকর্ড ও সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা আমিন। এঁর পদবি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি ছিল রায়। তাঁর দুই পুত্র—রামলোচন ও রামকৃষ্ণ তাঁকে কাজে সহায়তা করতেন।
২১. বিশ্বনাথ বসু ও কৃষ্ণ সেন	—	দেওয়ান রঘুনন্দন রায়ের পেশকার (বা সহকারী) ছিলেন বিশ্বনাথ বসু এবং কৃষ্ণ সেন ছিলেন আমিন নীলকণ্ঠ রায়ের সহকারী।

২২. ইমাম বক্স — হাতি, ঘোড়া, উট প্রভৃতিতে সুসজ্জিত রাজার আস্তাবলের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য কর্মচারী ছিলেন হাবশি ইমাম বক্স।

উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় এমন অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যাঁদের নাম ভারতচন্দ্র উল্লেখ করেন নি। এমন হতে পারে যে, এঁরা হয়তো ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৭৬০) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভারতচন্দ্র যাঁদের নাম উল্লেখ করেন নি অথচ যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত নাম 'গোপাল নাই' বা 'গোপাল নাপিত'—যিনি গোপাল ভাঁড় হিসেবেই সমধিক পরিচিত। এছাড়া মাতৃভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেনের উল্লেখও ভারতচন্দ্র করেন নি—তিনি অবশ্য নিয়মিত ভাবে রাজসভায় যোগ দিতেন না। অন্যত্র উল্লিখিত হলেও 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন' অংশে নীলমণি সমাদ্দার নামে এক প্রখ্যাত গায়কের, যিনি রাজসভায় সমগ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্য গান করে শুনিয়েছিলেন, কোন উল্লেখ নেই।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার এবং সভাসদদের যে পরিচয় ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া গেল তা রাজসভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই সমুজ্জ্বল। অবশ্য সবটাই যে রাজসভার গতানুগতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ তেমন নয়, কৃষ্ণনগরের রাজসভার কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল যা তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে। সুনীতিকুমার জানাচ্ছেন : ' all the outward appurtenances and paraphernalia remaining Rajput and Mogul, as borrowings, frequently well assimilated, from north India, the inner spirit of this old culture of Krishnagar was fundamentally of Bengal and of the village culture that characterised the province. Krishnagar, in fact, became urban and pan-Indians without ceasing to be Bengali, and it remained broad-based on the life and ways of the Bengali Village " [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সূত্র : 'The Court of Raja Krishna Chandra of Krishnagar : 'A centre of culture in the 18th cendury Bengal'—নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১৯৪৮ সালে Krishnagar College Centenary Commemoration Volume-এ প্রকাশিত হয়েছিল।]

গ. অন্নদামঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচিতি

ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের 'গ্রন্থসূচনা' অংশে সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করেছেন, যারা রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সময়-কালে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেওয়া হল।

মুর্শিদকুলি খাঁ : আওরঙ্গজেবের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ সালের আগে পর্যন্ত পুরোপুরি বাংলার সুবেদার হতে পারেননি। তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের খুব বিশ্বস্ত কর্মচারী। আওরঙ্গজেবের পৌত্র মুহম্মদ আজিমুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল না। তাই যুবরাজের কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য তিনি তাঁর বাসস্থান ঢাকা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন মুখসুদাবাদে। তার নামেই এই স্থানটির পরে নামকরণ হয়েছিল মুর্শিদাবাদ।

সুবেদার হয়ে তিনি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। হিন্দুরা তাঁদের নিজস্ব যোগ্যতায় উঁচুপদ পেতে লাগলেন। তিনি চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান সু-শাসক ছিলেন; কিন্তু কর আদায়ের ক্ষেত্রে তার নির্দয়তার কাহিনী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য টোডরমল্লের জমিজরিপ ও কর নির্ধারণের ব্যবস্থাকে স্থানীয় অবস্থার অনুকূলে পরিবর্তিত করে দেশের মধ্যে কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজা খাঁ বা সুজাউদ্দিন : অপুত্রক সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হলে সুবেদার হলেন তার জামাতা সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খাঁ। জন্মসূত্রে তুর্কি, মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা জিনাত-উন্-নিসা-র সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম সরফরাজ খাঁ। মুর্শিদকুলি যখন বাংলার দেওয়ান তখনই জামাতা সুজা খাঁ উড়িষ্যার সহকারী রাজ্যপাল। কিন্তু শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক বিশেষ ভাল ছিল না। উপরন্তু তিনি ছিলেন শিথিল চরিত্র। তাই মুর্শিদকুলির ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ উত্তরাধিকারী হবেন। ব্যাপারটি সুজা খাঁ-র ইপ্সিত ছিল না। তাই শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দিল্লীর সুলতানের কাছে তদ্বির করে রাজকীয় ফরমান আনিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তাঁর রাজত্বকালেই আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের প্রভাব বাড়তে থাকে। তিনি নিজে রাজ্যশাসনে বিশেষ অংশগ্রহণ করতেন না—রাজকর্মচারীরাই তাকে পরিচালিত করত। বারো বছর রাজত্ব করার পর ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সরফরাজ খাঁ : সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ নবাবি মসনদে বসেন। পিতার কোন ভাল গুণ তিনি পাননি। কুৎসিত চরিত্রের এই নিষ্কর্মা নবাব অসংখ্য নারী নিয়ে অন্তঃপুরবাসী হয়ে থাকতেন। ফলে রাজকার্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আলিবর্দি খাঁ মসনদ দখল করেন।

আলিবর্দি খাঁ : ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে নাগিনাবাগে সরফরাজ খাঁকে সমাধিস্থ করা হ'ল এবং মীর্জা মুহম্মদ আলি ওরফে আলিবর্দি খাঁ বাংলার মসনদে বসলেন। সুজাউদ্দিনের শাসনকালেই তিনি রাজ্যপ্রশাসনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সরফরাজ হত্যায় তিনি ছিলেন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। তবে তাঁর বিচক্ষণতা ও সদয় ব্যবহার দেশবাসীকে তাঁর কৃতঘ্ন চরিত্রের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তিনি অবশ্য সুখে রাজ্যভোগ করতে পারেননি। রাজ্যে বিদ্রোহ দমন ও মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতেই তাকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছিল। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজ্যের কোষাগারে টান পড়েছিল। অর্থের জন্য মরিয়া হয়ে তিনি দেশের বিত্তবান জমিদার, ইংরেজ এবং ফরাসি বণিকদের উপর জুলুম করতে শুরু করেন।

এই ধর্মপ্রাণ শুদ্ধ চরিত্রের মুসলমান নবাব রাজ্যশাসনে কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেননি। তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা ও সেনাপতি। তবে হিন্দু ভূ-স্বামী ও ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে চিরকালই নবাবি শাসনের বিরোধিতা করে এসেছেন। যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ আলিবর্দি খাঁ সরফরাজ হত্যার মধ্য দিয়ে রোপণ করেছিলেন, তা পূর্ণতা লাভ করেছিল পলাশীর-প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নিষ্ক্রিয়তায়। আশী বছর বয়সে আলিবর্দি মারা গেলেন। সময়টা ছিল ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ, পলাশী যুদ্ধের আগের বছর।

সৌলদজঙ্গ : আসলে এর নাম সৌকৎজঙ। ইনি ছিলেন আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। আলিবর্দির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন দৌহিত্র সিরাজ এবং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসবেন সিরাজ-উদ্-দৌলা। কিন্তু আলিবর্দির মৃত্যুর

পর সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল তিনজনকে কেন্দ্র করে—সিরাজ, উড়িষ্যার শাসনকর্তা সৌকৎজঙ এবং আলিবর্দি-কন্যা ঘসেটি বেগম। ঘসেটি বেগম চেয়েছিলেন সিরাজের ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসাতে। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুতে ঘসেটি বেগম অনন্যোপায় হয়ে সিরাজের হাত থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার জন্য সৌকৎজঙকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

মুরাদবাখর : সুজাউদ্দিনের মতো ইনিও ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা। মুর্শিদের রাজত্বকালেই মুরাদ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্র সৌকৎজঙকে তাড়িয়ে দিয়ে মুরাদ উড়িষ্যার শাসনকর্তা হন। পরে অবশ্য আলিবর্দির কাছে তাঁর পরাজয় ঘটেছিল।

আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ : সুজাউদ্দিন বাংলার শাসক হয়ে যে সমস্ত হিন্দু কর্মচারীদের পরামর্শকে বিশেষ মূল্য দিতেন দেওয়ান আলমচন্দ্র তাদের অন্যতম। রাজস্ব সম্পর্কিত সমস্ত ব্যবস্থায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজস্ব ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে তাকে রায়-ই-রায়ান উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রঘুরাজ : মারাঠা শক্তির স্তম্ভবিশেষ এই রঘুজী ভোঁসলে। মারাঠা সম্রাট বালাজী বাজী রাও-এর সঙ্গে রঘুজীর সম্পর্ক ভাল ছিল না। তবে রঘুজীর আক্রমণে যখন আলিবর্দি খাঁ জর্জরিত সেই সময় বালাজী তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে বালাজীর সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হলে আলিবর্দির বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচার করবার অনুমতি পেয়েছিলেন রঘুজী। বাংলাদেশে চৌথ আদায়ের জন্য রঘুজী তার অন্যতম সহকারী ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠিয়েছিলেন।

ভাস্কর পণ্ডিত : উড়িষ্যায় মুরাদবাখরকে দমন করবার জন্য আলিবর্দি খাঁ যখন বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যার দিকে রওনা হয়েছিলেন, সেই সুবর্ণ সুযোগে অরক্ষিত বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন এই ভাস্কর পণ্ডিত। বাংলা দেশের বেশ কিছুটা অংশে নিজের আধিপত্য ও কায়েম করেছিলেন। আলিবর্দি একবার তাঁকে তাড়িয়েও দিয়েছিলেন এবং পবে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে পুনর্বার বাংলাদেশ আক্রমণের সময় আলিবর্দির হাতে তিনি নিহত হন।

সুজন : আলিবর্দির আমলের একজন হিন্দু কর্মচারী। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইনি ছিলেন অত্যন্ত নির্মম। যে-কোন প্রকারে কর আদায় কবে মুসলমান শাসকের মনস্তুষ্টি সাধনকে তাঁর প্রিয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতেন। তাই লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'সাজোয়াল'। বর্গির অত্যাচারের চেয়ে এই সাজোয়ালের নির্মমভাবে কর-আদায় কম বেদনাদায়ক ছিল না। নবাব আলিবর্দিকে বারো লক্ষ টাকা নজরানা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সাজোয়ালের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁকেও কয়েকদিনের জন্য মুর্শিদাবাদে কারাবাস করতে হয়েছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র : কবি ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদীয়া কৃষ্ণনগরের সামন্ত নরপতি। নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে যে সমস্ত হিন্দু নরপতিরা ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁর বাজসভায় জ্ঞানী-গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল। সমসাময়িক জীবনে অবক্ষয়ের সূচনায় যে রুচি-বিকৃতি ঘটেছিল, ইনি ছিলেন তার অন্যতম ধারক ও পোষক। তাঁর সভায় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কেনারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তিয়াত্তর বছর বয়সে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ঘ. ভারতচন্দ্র উল্লিখিত সতীর পীঠমালার পরিচয়

দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনতে অপারগ হয়ে অপমানিত সতী দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যুর খবর পেয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করে সতীর দেহ নিজের স্কন্ধে ধারণ করে উন্মত্ত শিব নটরাজ নৃত্যের বিধ্বংসী ভঙ্গিমায় পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করলেন। শিবের এই মত্ততায় সৃষ্টি লোপ পাওয়ার উপক্রম হলে সতীদেহকে শিবের স্কন্ধচ্যুত করবার জন্য বিষ্ণু ব্রহ্মার সঙ্গে মন্ত্রণা করে তাঁর সুদর্শন চক্রের আঘাতে সতীদেহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন। খণ্ডিত সতীর দেহ যেখানে যেখানে পড়েছিল, সেখানে তীর্থস্থানরূপে গড়ে উঠেছে একান্নটি পীঠ ও ছাব্বিশটি উপপীঠ। এগুলি পরবর্তীকালে তীর্থস্থানের মর্যাদা পেয়েছে। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে মন্ত্রচুড়ামণিতন্ত্রের অনুসরণে পীঠমালার বর্ণনা করেছেন। তবে আটটি (পীঠের) কক্ষ, কনুই (ডান), জঠর, জানু (বাম ও ডান), নেত্রাংশতারা, পৃষ্ঠ, দক্ষিণ বাহু, মর্ম—এগুলির উল্লেখ তাঁর কাব্যে নেই; পরিবর্তে তাঁর বর্ণিত 'পীঠমালা'য় কয়েকটি উপপীঠ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পীঠমালার বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মূলত *তন্ত্রচূড়ামণি* গ্রন্থের তালিকা-ই (কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও) মেনে নিয়েছেন। ভারতচন্দ্র-বর্ণিত পীঠমালার বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁর সঙ্গী ভৈরবের পরিচয় নিচে উল্লিখিত হ'ল :

পীঠ সংখ্যা	পীঠ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী ভৈরবী	ভৈরব
১	ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গুলায় (বেলুচিস্থান)	কোট্টরী	ভীমলোচন
২	ত্রিনয়ন (কববীরপুর)	শর্করা বা শর্করে	মহিষমর্দিনী	ক্রোধীশ
৩	নাসিকা শিকারপুর গ্রাম)	সুগন্ধায় (বরিশাল,	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৪	জিহ্বা জলন্ধর)	জ্বালামুখ (পাঞ্জাব,	অম্বিকা	ভৈরব, বটুকেশ্বর
৫	ওষ্ঠ (অবন্তীদেশে) উজ্জয়িনীর কাছে)	ভৈরব পর্বতে (মহাদেবী)	অবন্তী	নম্রকর্ণ (লম্বকর্ণ)
৬	অধর	প্রভাস (মথুরায়)	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
৭	চিবুক	জনস্থানে (মধ্যপ্রদেশ)	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
৮	বাম গণ্ড (উপপীঠ)	গোদাবরী তীরে	বিশ্বমাতৃকা	বিশ্বেশ (দণ্ডপাণি)
৯	ডান গণ্ড (উপপীঠ)	গণ্ডকীতে (নদীতীরে)	গণ্ডকী চণ্ডী	চক্রপাণি
১০	উর্ধ্বদন্ত পাঁতি	অনলে (মতান্তরে) শুচিদেশ)	নারায়ণী	সংক্রুর (সংহার)

পীঠ সংখ্যা	পীঠ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী	ভৈরব
১১	অধোদন্তসার	পঞ্চসাগর	বারাহী	মহারুদ্র
১২	বাম কর্ণ	করতোয়াতট	অপর্ণা	বামেশ
১৩	দক্ষিণ কর্ণ	শ্রীপর্বত (কাশ্মীর, মতান্তরে কর্ণাট)	সুন্দরী (সুনন্দা)	সুন্দরানন্দ (অভীরুক)
১৪	কেশ (উপপীঠ)	কেশজাল বৃন্দাবন	উমা	ভূতেশ
১৫	কিরীট (উপপীঠ)	কিরীটকোণো (বটনগর গঙ্গাতীর)	ভুবনেশ্বরী (বিমলা)	সিদ্ধরূপ
১৬	গ্রীবা	শ্রীহট্ট, মতান্তরে জৈনপুর	মহালক্ষ্মী	সর্বানন্দ
১৭	কণ্ঠ	কাশ্মীর (অমরনাথ)	মহামায়া (ভগবতী)	ত্রিসন্ধ্য
১৮	ডানস্কন্ধ	রত্নাবলী (মাদ্রাজ)	শিবা	কুমাব বা শিব
১৯	বামস্কন্ধ	মিথিলা (জনকপুব) স্টেশনের কাছে)	মহাদেবী	মহোদব
২০	ডান হস্ত (হস্তার্দ্ধ)	চট্টগ্রাম	ভবানী	চন্দ্রশেখব
২১	বাম হস্ত (মতান্তরে দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ)	মানসসরোবর (তিব্বত)	দাক্ষায়ণী	হর
২২	(কফোণি) বাম কনুই	উজানিতে (কোগ্রাম)	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
২৩	মণিবন্ধ (ডান)	মণিবন্ধে	সাবিত্রী	স্থাণু
২৪	দুহাতের আঙ্গুল	প্রয়াগ	দশমহাবিদ্যা	দশভৈরব
২৫	বাম বাহু	বাহুলা (কাটোয়ার কেতুগ্রাম)	বাহুলা	ভীরুক
২৬	বাম মণিবন্ধ	মণিবন্ধ (আজমীর)	গায়ত্রী	সর্বানন্দ
২৭	বাম স্তন	জলন্ধর (পাঞ্জাব, জ্বালামুখী)	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
২৮	ডান স্তন	রামগিরি (চিত্রকূট পর্বতে)	শিবানী	চণ্ড
২৯	হৃদয়	বৈদ্যনাথ	জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৩০	নাভি	উৎকল (পুরী)	বিজয়া	জয়
৩১	কাঁকালি (কঙ্কাল)	কাঞ্চীদেশ (কোপাই নদীতীরে)	বেদগর্ভা	রুরু
৩২	বাম নিতম্ব	কালমাধব (শোণনদে)	কালী	অসিতাঙ্গ
৩৩	দক্ষিণ নিতম্ব	নর্মদা	শোণাক্ষী	ভদ্রসেন
৩৪	মহামুদ্রা (যোনি)	কামরূপ (আসাম)	কামাখ্যা	রাবানন্দ
৩৫	দক্ষিণ জঙ্ঘা	নেপাল (মতান্তরে মগধ)	মহামায়া	কপালী

পীঠ সংখ্যা	পীঠ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রী	ভৈরব
৩৬	বাম জঙ্ঘা	আসামের খাসিয়া পর্বতমালার দক্ষিণে জয়ন্তিয়া পরগণার বাউরভাগ গ্রাম	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
৩৭	দক্ষিণ চরণ	ত্রিপুরা	ত্রিপুরা	নল
৩৮	দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রাম (বর্ধমান স্টেশনের উত্তরে)	যোগাদ্যা/যুগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ডক
৩৯	চারটি আঙ্গুল (দক্ষিণ চরণ)	কালীঘাট	কালিকা	নকুলেশ
৪০	দক্ষিণ গুল্‌ফ	কুরুক্ষেত্র	বিমলা	সম্বর্ত
৪১	বাম গুল্‌ফ	বিভাস (বা তমলুকে)	ভীমরূপা	কপালী (সর্বানন্দ)
৪২	বাম পদ	ত্রিস্রোতা	অমরী	অমর

পরিশিষ্ট—২

পৌরাণিক নাম প্রসঙ্গ

।।অ।।

অগস্ত্য : বৈদিক ঋষি। আদিত্য-যজ্ঞে সূর্য বরুণ উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুণ্ডে বীর্যপাত করেন। এই কুণ্ড থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম। ভাগবতে এঁকে পুলস্তের পুত্র বলা হয়েছে। মহাভারতে আছে পিতৃপুরুষের কাছে তিনি বংশরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু যোগ্য পত্নী খুঁজে না পেয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে একটি শিশু-কন্যা তৈরি করে সন্তানার্থী বিদর্ভরাজকে পালন করতে দেন। অপরূপ সুন্দরী এই শিশুকন্যাটির নাম হয় লোপামুদ্রা। পরবর্তীতে অগস্ত্য এঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

কালেয় (কালকেয়) অসুররা দিনের বেলায় সমুদ্রে লুকিয়ে থাকত। দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করে কালেয় অসুরদের হত্যা করার সুযোগ করে দেন।

দেবী ভাগবতে আছে অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্য পর্বতের গুরু' বিন্ধ্য একবার মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং বলে সূর্য যেমন মেরু-পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন তেমনি তাঁকেও প্রদক্ষিণ করতে দিতে হবে। সূর্য বিন্ধ্যের ইচ্ছা পূরণ না করায় বিন্ধ্য সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলের পথ আটকে দিলে দেবতারা অগস্ত্যর শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য তখন সস্ত্রীক বিন্ধ্যের কাছে গিয়ে বিন্ধ্যকে দক্ষিণে যাবার পথ চান এবং বলেন যে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত বিন্ধ্য যেন মাথা নিচু করেই অবস্থান করে। দক্ষিণ থেকে অগস্ত্য আর ফেরেন নি, ফলে সূর্য ইত্যাদিরাও পথ পেয়ে যান। অগস্ত্যের বিন্ধ্য দমনের কাহিনীকে অনেকে মনে করেন দাক্ষিণাত্যে আর্য-উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনীর রূপক।

অন্নপূর্ণা : শক্তির অন্যতম রূপ। শিবের ঘরনি হিসেবে পরিচিত। তাঁর দু-হাত, হাতে অন্নপাত্র ও দর্বী। কৃষ্ণচন্দ্রের তন্ত্রসারে এঁর পূজা-পদ্ধতি বর্ণিত। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে এঁর পুজো হয়। কাশীতে অন্নপূর্ণার অন্নকূট উৎসব প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশে অন্নপূর্ণা পূজিত হন অন্নদাতারূপে।

অঙ্গিরা : ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত দশটি পুত্রের একজন। রামায়ণে বলা হয়েছে ব্রহ্মা-সৃষ্ট ১৬ জন প্রজাপতির মধ্যে অঙ্গিরা বা অঙ্গিরস একজন। সপ্তর্ষিকুলের একজন খ্যাতিমান ঋষি। নিরুক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্নিতে নিজের বীর্য নিক্ষেপ করলে অগ্নির জ্বালা থেকে ভৃগু ও জ্বালাহীন অঙ্গার থেকে অঙ্গিরা উৎপন্ন হন। ইনি কর্দম মুনির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। অন্য মতে তাঁর আরও অনেক স্ত্রী ছিলেন যাঁদের মধ্যে অন্যতমারা হলেন—শুভা, দেবসেনা, বসুধা ও স্মৃতি। অঙ্গিরার পুত্রদের মধ্যে অন্যতম : উতথ্য, বৃহস্পতি ও সংবর্ত। অঙ্গিরা সম্ভবত অথর্ববেদের মন্ত্র সংকলন করেছিলেন।

অত্রি : ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির একজন। স্ত্রী অনুসূয়া। পুত্রলাভার্থে অনসূয়াকে সঙ্গে নিয়ে তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট ত্রিমূর্তি বর দিলে বিষ্ণু অংশে দত্তাত্রেয়, শিব অংশে দুর্বাসা ও ব্রহ্মার অংশে সোমচন্দ্রের জন্ম হয়। মনুসংহিতার মতে, মনু-সৃষ্ট দশজন প্রজাপতির

অন্যতম। অত্রি মন্ত্রকার ও গোত্র প্রবর্তক। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলটি এঁর দ্বারা সৃষ্ট। অথর্ববেদের কিছু সূক্তেরও ইনি রচয়িতা। অত্রি-লিখিত স্মৃতিগ্রন্থের নাম অত্রিসংহিতা। এই বংশের সন্তানরা আত্রেয় নামে পরিচিত। অসুররা একবার অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্রের মধ্যে ফেলে মারতে চাইলে অশ্বিনীকুমারদের স্তব করে রক্ষা পান। রাম বনবাস কালে অত্রি মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন।

অসিত : (১) হিমালয়বাসী একজন ঋষি ; (২) সূর্যবংশের রাজা ভরতের ছেলে ; (৩) জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী একজন ঋত্বিক—ব্যাসের শিষ্য, শিবের বরে দেবল নামে পুত্র জন্মায়।

॥ ই ॥

ইন্দ্র : ঋক্‌বেদে ইন্দ্র আর্যদের প্রধান দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। ইনি অবশ্য স্বয়ম্ভু নন—এর পিতা দৌ বা ত্বষ্টা। বেদের বর্ণনায় ইন্দ্র পিঙ্গলবর্ণ, সহস্রাক্ষ সোমরসপায়ী দেবতা। ইনি দেবতাদের রাজা হিসেবে গণ্য হন—তাই দেবরাজ। বায়ু, বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রের দেবতা এই ইন্দ্র। বেদে ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী। মহাভারত অনুসারে ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান হিসেবে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের জন্ম। কর্ণের বিরুদ্ধে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য অনৈতিকভাবে কর্ণের কবচ কুণ্ডল সংগ্রহ করে আনেন। পরিবর্তে কর্ণকে একাঘ্নী বাণ দিয়ে আসেন। অর্জুন স্বর্গে এলে ইন্দ্র অর্জুনকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, রথচালক মাতলী, অস্ত্র বজ্র, বাসস্থান বৈজয়ন্ত।

ইন্দ্রাণী : ইন্দ্রের স্ত্রী। ঋকবেদে বলা হয়েছে যে ইনি ভাগ্যবতী এবং এঁর স্বামী অমর। ইনি অবশ্য দেবী হিসেবে সেভাবে পূজিত নন।

॥ উ ॥

উত্তঙ্ক : বিখ্যাত মুনি। অয়োদ ধৌম্যের বেদ নামে শিষ্যের শিষ্য এই উত্তঙ্ক। ইনি গুরুর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মহাভারতে এঁকে অহল্যার স্বামী গৌতমের ভৃগুবংশীয় শিষ্য বলা হয়েছে। গৌতম তার এই প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন।

উমা : কেনোপনিষদে উমার প্রথম উল্লেখ মেলে। সেখানে তাঁকেই বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্রের অগাধ ভক্তিতে ইনি সুশোভনা অলঙ্কার-ভূষিতা হয়ে উমা হৈমবতী রূপে প্রকাশিত হন। পরে বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে হিমালয় ও মেনকার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কালিকাপুরাণ মতে এঁর নাম পার্বতী, পূর্বজন্মে ইনি দক্ষের কন্যা সতী ও শিবগৃহিণী ছিলেন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করার পর শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করলে সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এইভাবে ৫১ পীঠ নির্মিত হল। পরজন্মে সতী জন্মালেন উমা হয়ে। তারকাসুরের উপদ্রবের কারণে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিয়ে জানতে পারেন উমা ও শিবের সন্তান কার্তিকেয় তারকাসুর নিধনে সমর্থ। তখন তপস্যামগ্ন শিবের মনে কাম সঞ্চার করতে পাঠানো হয় বসন্তসখা মদনকে। শিবের ক্রোধে মদন ভস্মীভূত হল। পরে উমার তপস্যায় মুগ্ধ শিব তাঁকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের গণেশ ও কার্তিক নামে পুত্রদ্বয় জন্মলাভ করেন। পার্বতীর কঠোর তপস্যা দেখে মা মেনকা এত তপস্যা করতে বারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম উ (= না); উমা 'অম্বিকা' নামেও পরিচিতা। তিনি হিমালয়-কন্যা, তাই 'হৈমবতী' তাঁর অন্য নাম।

॥ ঋ ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ : বিভাণ্ডক মুনির পুত্র, মা ভগ নামক আদিত্যের শাপভ্রষ্টা কন্যা স্বর্ণমুখী এক হরিণী। একদিন তপস্যা শেষে বিভাণ্ডক স্নান করতে গিয়ে উর্বশীকে দেখে কামার্ত হলে নদীর জলে বীর্য স্খলিত হয়। সেই জল পান করে এই হরিণীটি গর্ভিণী হয়। হরিণীর সন্তান বলে ঋষ্যশৃঙ্গ শিং বিশিষ্ট ছিলেন। পিতার কাছে ব্রহ্মচর্য ও বেদ অধ্যয়ন করতেন বলে কোনদিন কোনও রমণীকে দেখেননি। রাজা লোমপাদের রাজ্যে একদা দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সকলের পরামর্শে রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনতে সুন্দরী বারাঙ্গনাদের তপোবনে প্রেরণ করেন। কারণ তিনি বৃষ্টি হওয়ার জন্য যজ্ঞ করতে সমর্থ। পিতা বিভাণ্ডকের অগোচরে ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজপ্রাসাদে আনতে বারবনিতারা সক্ষম হয়েছিল। রামায়ণে আছে ঋষ্যশৃঙ্গ এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হয়। লোমপাদ নিজ কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলে বিভাণ্ডক ক্রুদ্ধ হন। অন্যমতে, শান্তা দশরথের কন্যা। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন প্রধান পুরোহিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী তরঙ্গিণী* নামক কাব্যনাটকটি পুরাণের এই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত।

ঔর্ব : একজন ভৃগুবংশীয় ঋষি ; পিতা চ্যবন, মা আরুষি , জমদগ্নির পিতামহ। পুত্রের নাম ঋচীক। হেহয়রা ক্ষত্রিয়, ভৃগুবংশীয়রা এদের কুলপুরোহিত। হেহয় ক্ষত্রিয়রা কুলপুরোহিতদের প্রচুর ধনরত্ন দেওয়ার ফলে নিজেরা দ্ররিদ্র হয়ে পড়ে। অর্থাভাবের কারণে একবার হেহয়রা ভৃগুদের কাছে ঋণ চান, কিন্তু ভৃগুরা কিছু দিতে না চাওয়ায় হেহয়রা ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। ভার্গবরা তখন সামান্য কিছু দিয়ে বাকি ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে ফেলেন। মহাভারতে আছে কৃতবীর্যের বংশধরেরা ব্রাহ্মণদের শরবর্ষণে হত্যা করতে থাকেন, গর্ভস্থ শিশুদেরও বাদ দেন না। এই অবস্থায় ভৃগু-পত্নীরা হিমালয়ে পালিয়ে যান। একজন ভৃগু-পত্নী তাঁর গর্ভটিকে নিজের উরুতে ধারণ করেন। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণীকে দেখতে পেয়ে তাকেও হত্যা করতে যায়, তখন শিশুটি উরু ভেদ করে বেরিয়ে এসে নিজের তেজে ক্ষত্রিয়দের অন্ধ করে দেন। উরু ভেদ করে জন্ম বলে নাম হয় ঔর্ব। ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করে দৃষ্টি ফিরে পান। কিন্তু ওই সকল লোকের বিনাশ সংকল্প করে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তখন পিতৃপুরুষেরা তাকে নিবৃত্ত করতে এসে বলেন সমস্ত জীবন জলে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই তিনি তাঁর ক্রোধ বিসর্জন দিন। ঔর্ব তাই করেন, এই ক্রোধ তখন থেকে সমুদ্রে বড়বামুখ হয়ে বাস করে।

অন্যমতে চ্যবনের স্ত্রী আরতী নিজের উরুতে ১২ বছর গর্ভ গোপন রেখেছিলেন। শিশুর দীপ্তিতে ক্ষত্রিয়রা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পিতা ও পিতৃব্যগণের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন ঔর্ব। পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেবতারাও ঔর্বকে শান্ত করতে এসেছিলেন। আজও এই বড়বাগ্নি সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

॥ ক ॥

কংস : ভোজবংশীয় নৃপতি কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তি কংসের স্ত্রী। জরাসন্ধের সাহায্যে উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে কংস রাজা হন। কংস নিজের বোন দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে দেন। দেবকী-

বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ অত্যাচারী কংসকে হত্যা করেন। এর পূর্বে কংস কৃষ্ণকে নানাভাবে হত্যা করতে চেয়ে অসফল হন।

কর্দম : ব্রহ্মার ছেলে, একজন প্রজাপতি, ব্রহ্মা তাঁকে সৃষ্টি করতে বললে সরস্বতী নদীর (অন্য মতে বিন্দু সরোবর) তীরে দশ হাজার বছর হরির তপস্যা করার পর হরি দেখা দিলে বর চান উপযুক্ত স্ত্রীকে পাওয়ার জন্যে। হরি জানান মনু আসবেন এবং কর্দমের নয় মেয়ে ও বিষ্ণুর অংশযুক্ত একটি পুত্র হবে। মনু এসে জানান দেবাহুতি কর্দমকে বরণ করেছেন। কর্দম দেবাহুতিকে বিয়ে করেন এবং কলা, অরুন্ধতী প্রমুখ নয়টি কন্যা জন্মানোর পর যোগাভ্যাসের জন্য কর্দম বনে গমন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্ত্রী দেবাহুতি বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন কর্দম স্ত্রীকে আশ্বাস দেন হরির মতো একটি পুত্র সন্তান হবে। এই পুত্র কপিল মুনি নামে বিখ্যাত।

কার্ত্তিকেয় : ইনি বৈদিক যুগের দেবতা নন। বিভিন্ন পুরাণে এঁর জন্ম-কাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্য পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয় কীর্তিত স্কন্দ, বিশাখ, মহাসেন, ব্রহ্মাণ্য, সনৎকুমার গুহ, জয়ন্ত, ষড়ানন প্রভৃতি ১০৮ নামে পরিচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি সনৎকুমার ও স্কন্দ অভিন্ন। বেদোত্তর সাহিত্যে এই দেবতার জন্মের সঙ্গে রুদ্র, শিব, অগ্নি, গঙ্গা ও ছ'জন কৃত্তিকাকে জড়িয়ে নানা কাহিনী গড়ে উঠেছে। পদ্মপুরাণে আছে, তারকাসুর নিধনের জন্য সেনাপতির প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মা বলেন, হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে জন্মাবেন সেই সেনাপতি। তপস্যামগ্ন শিবের ধ্যান ভাঙানো হল বসন্তসখা মদনের সাহায্যে। শিবের রোষাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্ভব হল। শিব ও পার্বতী পুত্রলাভার্থে মিলিত হলে হাজার বছর কেটে গেল। অগ্নিকে পাঠানো হল শিবকে নিরস্ত করার জন্য। শিবের শাপের ফলে অগ্নির জঠর স্ফীত হয়ে উঠল এবং দেবতাদের কৌশলে মহাদেবের বীর্য পড়ল মাটিতে। সেইখানে সৃষ্টি হল এক সরোবর। ছয় জন কৃত্তিকা এই সরোবরে স্নান করে ফেরার পথে যে জল আনছিলেন পদ্মপাতায়, তাই পান করলে পার্বতীর গর্ভবেদনা শুরু হয় এবং তাঁর দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে জন্মলাভ করেন ষড়ানন আর বাম কুক্ষি থেকে নির্গত হন স্কন্দ। অগ্নির মুখ থেকে জন্মান বিশাখ। ইন্দ্র তারপর কার্ত্তিকেয়র সঙ্গে বিবাহ দেন দেবসেনার। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে, পার্বতীর সঙ্গে বিহারকালে মহাদেবের বীর্য পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী সেই তেজ ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অগ্নি ভয়ে এই তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। শরবনে জন্মগ্রহণ করে এক সুন্দর বালক। কৃত্তিকারা এই বালককে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করেন বলে এঁর নাম কার্ত্তিকেয়। মহাভারতের গল্পটি একটু ভিন্ন ধরনের। একদিন মানপর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে ইন্দ্র দেখেন যে, কেশী দানব প্রজাপতি-কন্যা দেবসেনাকে হরণ করতে চেষ্টা করছে। কন্যাটিকে রক্ষা করে ইন্দ্র তাকে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, যে মহাবিক্রমশালী পুরুষ এই কন্যার পতি হবেন, তিনিই হবেন দেবসেনাপতি।

কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিকের পুজো প্রচলিত আছে। বিশেষভাবে সন্তানহীনা নারী ও গণিকালয়ে কার্তিক পুজোর প্রচলন আছে। এর কোন ঐতিহ্য আছে কিনা জানা যায় না।

কিন্নর : কুৎসিত পুরুষ। এদের দেহের দুটি ভাগ : একভাগের মুখ ঘোড়ার মতো, দেহ মানুষের; অন্যভাগে মুখ মানুষের, দেহ ঘোড়ার। এরা নৃত্যগীতে পারঙ্গম—বাদ্য এদের

অত্যন্ত প্রিয়। এরা কশ্যপ ও অরিষ্টার সন্তান, অন্যমতে ব্রহ্মার ছায়া থেকে জন্ম, বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে এদের রাজা কুবের এবং শাসনকর্তা চিত্ররথ। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় এদের বিশেষ স্থান রয়েছে।

কালভৈরব : শিবের একজন অনুচর—মহাদেব নিজের অংশে একে সৃষ্টি করে কাশীধাম রক্ষার ভার দেন। ব্রহ্মা শিবতত্ত্ব জ্ঞান নিতে কাশীতে এলে মহাদেবের আদেশে কালভৈরব ব্রহ্মার একটি মাথা কেটে নেয়। কাশীতে যে স্থানে এই মুণ্ড পড়েছিল সেই স্থানের নাম হয় কপালমোচন।

কেতু : কশ্যপের ছেলে। অন্যমতে বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে জন্ম এক দানব। কেতুর হাতে থাকে একটি তরবারি ও প্রদীপ। পুরাণে কেতুর বর্ণনায় বলা হয়েছে—ধূম্রবর্ণ, বিশালাক্ষ, পুচ্ছরূপ, চারহাত শরাসন।

কপিল : একজন মুনি। পুরাণ ও সাহিত্যে একাধিক কপিলের উল্লেখ আছে। কপিল মুনির প্রসঙ্গে যে-কাহিনীটি সর্বাধিক প্রচলিত তা মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উদ্যোগী হলে ইন্দ্র সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করে পাতালে ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির আশ্রমের কাছে বেঁধে রাখেন। এদিকে সগর রাজার ৬০,০০০ হাজার ছেলে ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে পাতালে এসে কপিল মুনিকে ঘোড়া চোর হিসেবে আক্রমণ করলে মুনির শাপে সগর-পুত্ররা ভস্ম হয়ে যায়। পরে অংশুমান এসে কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করে ঘোড়া নিয়ে যান—তখনই কপিল মুনি বলে দিয়েছিলেন অংশুমানের পৌত্র মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করে সগর রাজার ছেলেদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। কপিল মুনির অন্যান্য পরিচয় হল : (ক) ব্রহ্মার মানসপুত্র, (খ) কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহুতির ছেলে, (গ) বৈবস্বত মুনির পুত্র ইত্যাদি।

কাত্যায়ন : মহর্ষি কাত্যের পুত্র কাত্যায়ন একজন মুনি। মহিষাসুর এঁর শিষ্য। রৌদ্রাশ্বের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য কাত্যায়ন মহিষাসুরকে শাপ দেন যে নারীর হাতে তার মৃত্যু হবে।

কাশ্যপ : পুরাণে নানাভাবে এঁর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে : (১) দশরথের একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী; (২) জনৈক মুনি—এঁর পুত্র বিভাণ্ডক ও নাতি ঋষ্যশৃঙ্গ; (৩) কশ্যপের পুত্র মহর্ষি কাশ্যপ এবং (৪) একজন বিষ-চিকিৎসক।

কালীয়দমন : কালীয় এক হাজার মাথাবিশিষ্ট বিষধর সাপ। গরুড়ের সঙ্গে বিবাদের ফলে সমুদ্র ছেড়ে প্রথমে হ্রদে এবং তারপর যমুনায় এসে আশ্রয় নেয়, কারণ সৌভরী মুনির অভিশাপ ছিল যমুনায় এলে গরুড় মারা পড়বে। এদিকে কালীয়র অবস্থিতির কারণে যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে যায়। কালীয়র মুখ থেকে ক্রমাগত আগুন ও ধুম বার হতে থাকায় তীরবর্তী স্থানও জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কয়েকজন রাখাল ও তাদের গরুগুলি যমুনার জল খেয়ে মারা গেলে কৃষ্ণ কালীয় দমন মানসে যমুনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কালীয় তার হাজার ফণায় কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলে কৃষ্ণ নিজেকে মুক্ত করে কালীয়র ফণার ওপরে উঠে নাচতে থাকেন। কালীয়র মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকলে কালীয়র পুত্র বারবার প্রাণভিক্ষা চাইলে কৃষ্ণ কালীয়কে রম্যক দ্বীপে যেতে বলেন এবং আশ্বাস দেন তাঁর পায়ের চিহ্ন কালীয়র মাথায় থাকবে—তা দেখে গরুড় আর শত্রুতা করবে না।

কুন্তী : প্রকৃত নাম পৃথা। যদুবংশের রাজা শূরসেনের প্রথম সন্তান—কৃষ্ণের পিসী এবং বাসুদেবের বোন। কুন্তীভোজের কাছে পালিত হয়েছিলেন বলে নাম হয় কুন্তী। বালিকা

বয়সেই কুন্তীর ওপর মুনি-ঋষিদের পরিচর্যার ভার ছিল। কুন্তীর পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা মুনি কুন্তীকে মন্ত্র দিয়ে যান, যে মন্ত্রের বলে কুন্তী যে-দেবতাকেই ডাকবেন তাঁর প্রসাদে কুন্তীর সন্তান হবে। কৌতূহলবশে কুমারী অবস্থায় কুন্তী সূর্যকে ডাকেন এবং সূর্য এসে কুন্তীর গর্ভসঞ্চার করে যান। কুন্তীর গর্ভজাত এই সন্তানের নাম কর্ণ।

এরপর স্বয়ংবরে কুন্তী পাণ্ডুর গলায় মালা দেন। পরে মাদ্রী সপত্নী হিসেবে আসেন। এই তিনজনে বেশ সুখীই ছিলেন। পরে পাণ্ডুর নির্দেশে কুন্তীর তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মায়—ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন। এরপর পাণ্ডুর মৃত্যু হলে কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই সহমৃতা হতে চাইলে মুনিরা বাধা দেন। মুনিদের পরামর্শে কুন্তী নিজের তিন পুত্র ও মাদ্রীর দুই পুত্র—নকুল ও সহদেবকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন।

কুবের : রামায়ণ, মহাভাবত ও পুরাণে কুবেব যক্ষ ও কিন্নরদের রাজা বলে পরিচিত। এঁর পিতা হলেন পুলস্তের পুত্র পৌলস্ত্য বা বিশ্রবা। মায়ের নাম দেববর্ণিনী, যিনি ভরদ্বাজের কন্যা। ব্রহ্মার বরে বৈশ্রবণ কুবেরেব জন্ম। 'কু' শব্দের অর্থ কুৎসিত ও 'বের' শব্দের অর্থ শরীর। তিনটি পা, আটটি দাঁত ও অসুরের মতো শক্তি নিয়ে কুবের কুৎসিৎ-গঠন। তাঁর স্ত্রীর নাম আহুতি (মতান্তরে ভদ্রা), দুই পুত্র নলকুবর ও মনিগ্রীব এবং একটি কন্যা মীনাক্ষী। অলকাপুরীতে তাঁর বাস, উদ্যান চিত্ররথ ও রথ পুষ্পক। কুবেরের রথ মানুষ টানে বলে তাঁর অপর নাম নরবাহন। বিশ্রবা লঙ্কাপুরীতে কুবেরের বাসস্থান স্থির করেন; কিন্তু তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবণ তা অধিকার করতে চাইলে কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করে কৈলাসে প্রস্থান করেন। হিমালয়ে তপস্যাকালে তিনি একদা রুদ্রাণীকে দর্শন করার অপরাধে তাঁর দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ ও বামচক্ষু ধূলিকলুষিত হয়। এজন্য তিনি একপিঙ্গল নামেও খ্যাত। রাবণের সঙ্গে একবার যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। কুবের ধনের প্রদাতা ও অধ্যক্ষ। তিনি দিকপালও বটেন। মহানির্বাণতন্ত্রে তাঁর সুন্দব রূপের বর্ণনা আছে। জৈনবাও কুবেরকে দিকপতি হিসেবে পূজা করেন।

কুরুক্ষেত্র : প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পূর্ব পাঞ্জাবের কর্নাল জেলায় অবস্থিত। বৈদিক যুগ থেকেই কুরুক্ষেত্র পুণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত। মহাভারতের মতে এখানে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু মৈত্রায়ণী সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, জৈমিনী ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি বৈদিক গ্রন্থে পুণ্যভূমি হিসেবে কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ থাকলেও এখানে যুদ্ধ হয়েছিল এমন কথা বলা নেই।

কৃষ্ণ : বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার হিসেবে স্বীকৃত। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে যদুবংশে কৃষ্ণের জন্ম। মথুরার রাজা উগ্রসেনের কন্যা দেবকীর সঙ্গে বৃষ্ণিবংশীয় রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেবের বিবাহ হয। তাদের বিবাহের সময়েই দৈববাণী হয় দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবেন। কংস দৈববাণী শুনে দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তাঁদের ছয়টি সন্তানকে হত্যা করেন। দেবকীর সপ্তম সন্তানটিকে যোগমায়াকে দিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করা হয়। এদিকে বসুদেবের ওপর দৈবাদেশ হয় যে অষ্টম সন্তান (কৃষ্ণ) জন্মালেই তাকে নন্দের স্ত্রী যশোদার কাছে রেখে আসতে হবে এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে আসতে হবে। সেইমত কাজ হল—কংস কন্যাসন্তান জন্মানোর খবর পেয়ে তাকে পাষাণে আছড়ে মারার

সময় দৈববাণী হয়—কংসকে মারবার জন্য যে জন্মেছে সে গোকুলে বড় হচ্ছে। এরপর কংস নানাভাবে কৃষ্ণকে হত্যার প্রয়াস করেন কিন্তু সমস্ত প্রয়াস বিফলে যায়—শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের হাতে কংস নিধন হয়। কৃষ্ণের আটজন স্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন রুক্মিণী, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রাবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, সত্যভামা। বৈষ্ণব মতে বৃন্দাবনের ১৬ জন প্রধান গোপীর থেকে উদ্ভূত ১৬ হাজার গোপিনী কৃষ্ণের সহচরী ছিলেন, অবশ্য দার্শনিক দৃষ্টিতে এঁরা কৃষ্ণের স্ত্রী নন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্য ঈশ্বর কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হলেন শ্রীরাধিকা। মহাভারত অনুযায়ী কৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুল-পুত্র। কৃষ্ণ নিজে শিশুপালকে হত্যা করেন এবং তাঁরই পরামর্শে ভীম জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে বধ করেন। মহাভারতে আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথী হন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন সামনে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে বিষণ্ণ হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করলে কৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিয়ে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান এবং নানা উপদেশ দানে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। কৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি এই উপদেশ-অংশ 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদেব পরাজয়ের মূলে কৃষ্ণের ভূমিকায় গান্ধারী ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দেন যে, ৩৬ বছর পরে কৌরব বংশের মতো যদুবংশও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যদুবংশ অনাচার ইত্যাদি কারণে নিজেদেব মধ্যে লড়াই করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। কৃষ্ণ উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা অবস্থায় এক ব্যাধ কর্তৃক বাণবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ কবে বৈকুণ্ঠে চলে যান।

ক্রতু : ব্রহ্মার একজন মানসপুত্র ও প্রজাপতি। ইনি সপ্তর্ষিদের অন্যতম। দক্ষ-কন্যা শান্তিব সঙ্গে ক্রতুর বিবাহ হয়। মহাভারতের তথ্য অনুযায়ী শান্তির গর্ভে এই মুনির বালখিল্য নামে ষাট হাজাব পুত্র জন্মায়। অন্যমতে, শিবের বরে ক্রতু এক হাজার পুত্রের জনক হন। যজ্ঞে কোনও রকম বিঘ্ন ঘটলে এঁর দেখা পাওয়া যেত। ভীষ্মের শরশয্যায় ইনি একবার এসেছিলেন।

কৌশিকী : মার্কণ্ডেয়পুরাণ অনুসারে কাত্যায়নীর দেহকোষজাত এক দেবী—সেই কারণে নাম কৌশিকী। এই দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয়কে হত্যা করে দেবসমাজকে নিশ্চিন্ত করেন। এঁর বাহন সিংহ। ইন্দ্র এঁকে বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী রূপে স্থাপন করে অসুর নিধনের কাজ দেন। ইনিই কংসের ঘাতক জন্মেছে বলে দৈববাণী করেন।

॥ গ ॥

গঙ্গা : গঙ্গা সম্পর্কে মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত। তবে গঙ্গা নদীব সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। সেখানে তিনি মকরবাহিনী, শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে গঙ্গাপূজায় দশ ধরনের পাপ নষ্ট হয় বলে এই তিথির নাম দেওয়া হয়েছে দশহরা। হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাসে গঙ্গা পুণ্যতোয়া, গঙ্গায় স্নান, পান ও স্পর্শ পুণ্য এনে দেয়। মৃতের সৎকারেব সময় গঙ্গার জল আবশ্যিক। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মোটামুটি একই কাহিনী বলা হয়েছে। মহাদেব রাসের সময় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে থাকলে রাধা ও কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গলে যান, যার ফলে গঙ্গার সৃষ্টি হয়। গঙ্গার আর এক নাম 'বিষ্ণুপদী', কারণ গঙ্গা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলে রাধা রাগে ও ঈর্ষায় গঙ্গাকে খেয়ে ফেলতে গেলে গঙ্গা বিষ্ণুর চরণে আশ্রয় নেন। অন্য একটি মতে, নারদ রাগরাগিণীতে

সুদক্ষ ছিলেন বলে আত্মাভিমানী ছিলেন। তাঁর গর্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে রাগরাগিণীরা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে। কেমনভাবে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে একথা নারদ জিজ্ঞাসা করায় তারা মহাদেবের গান শোনোনোর কথা বলে। শ্রোতা হলেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। ব্রহ্মা গানের কিছু না বুঝলেও বিষ্ণু গান শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে দ্রবীভূত হলেন। ব্রহ্মা গলিত-বিষ্ণুর রূপধারী গঙ্গাকে বন্দি করে ফেললেন কমণ্ডলুতে। রামায়ণে মেরু-দুহিতা মেনার বড় মেয়ে গঙ্গা, ছোট উমা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো গঙ্গাও বিষ্ণুর একজন পত্নী। বিষ্ণু ও গঙ্গার মধ্যে আসক্তি দেখা দিলে সরস্বতী তা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাকে প্রহার করতে থাকেন। লক্ষ্মী তাতে বাধা দান করেন। সরস্বতী লক্ষ্মীকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের শাপ দেন, গঙ্গাকে বলেন নদী হয়ে জন্মাতে, যে জীবের সব পাপ গ্রহণ করবে, আর গঙ্গা সরস্বতীকে নদী হওয়ার শাপ দেন। দেবী ভাগবতে কাহিনী আরও বিস্তারিত। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে শাপ দেন তুলসী হয়ে জন্মানোর, পরজন্মে তিনি হবেন পদ্মাবতী নদী। গঙ্গার প্রতি অভিশাপ নেমে আসে। ভগীরথ তাঁকে মর্ত্যে নিয়ে আসবেন আর শান্তনুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। এরপর কৈলাসে গিয়ে শিবের সঙ্গে হবে বিবাহ। আর সরস্বতী পরজন্মে ব্রহ্মালোকে ফিরে গিয়ে হবেন ব্রহ্মার স্ত্রী। রামায়ণে আছে সগর বংশের ষাট হাজার অভিশপ্ত পুত্রকে মুক্ত করতে গিয়ে ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন। এজন্য গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। পথে গঙ্গার স্রোতধারায় জহ্নুমুনির আশ্রম ভেসে গেলে তিনি ক্রোধে গঙ্গাকে পান করে ফেলেন। এরপর ভগীরথ স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করলে জহ্নু মুনি তাঁকে কান থেকে বার করে দেন বলে গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী। শিবের জটাতে অবস্থান করার কারণে কেউ কেউ তাঁকে শিবের পত্নী বলেও বিবেচনা করেন। সৌরপুরাণে মেনকার ছেলে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এবং মেয়ে গঙ্গা ও গৌরী। শান্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ হলে শর্তানুযায়ী তিনি প্রথম সাতটি সন্তানকে গঙ্গাতে ভাসিয়ে দেন। কিন্তু অষ্টম সন্তান জন্মালে শান্তনু বাধা দিলে গঙ্গা রাজাকে ছেড়ে চলে যান। শান্তনু ও গঙ্গার এই পুত্রের নাম ভীষ্ম।

গণেশ : গণেশ শিব ও পার্বতীর পুত্র। গণপতি, বিনায়ক, মহাগণপতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, গজানন, লম্বোদর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ইনি পরিচিত। খর্বাকৃতি দেহ, ত্রিনয়ন। চারহস্ত এবং হস্তির ন্যায় মস্তক—মূষিক এঁর বাহন। পুরাণে এঁকে বিঘ্ননাশক এবং সিদ্ধিদাতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার পুজো না করলে ইনি বিঘ্ন ঘটাতে পারেন। যে-কোন পুজোর আগে তাই ইনি পূজনীয়। দুর্গা পুজোর সময় এবং ভাদ্র ও মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থীতে গণেশ পুজোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থীকে গণেশ চতুর্থী বলা হয়। মহারাষ্ট্রে এইদিন সাড়ম্বরে গণেশ পুজোর প্রথা প্রচলিত। গণেশের বাহন মূষিক। মনে হয় আদিম জাতির পূজিত হস্তি দেবতা ও লম্বোদর যক্ষ—এই দুটি ধারণা মিলে গণেশের জন্ম। ইঁদুরও আদিম কোন এক সংস্কার-প্রতীক। পুরাণে গণেশের হস্তিমুণ্ড হওয়ার কাহিনীতে দেখা যায় পার্বতী পুণ্যক ব্রতে বিষ্ণুকে তুষ্ট করলে গণেশের জন্ম হয়। শিশুপুত্র দেখবার জন্যে দেবতাদের সঙ্গে শনিও আসেন। শনির স্ত্রীর অভিশাপ ছিল যে শনি যেদিকে চাইবেন সেদিকে সব পুড়ে যাবে। শনি তাই পার্বতীর সন্তানের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। কিন্তু পার্বতীর পীড়াপীড়িতে গণেশের দিকে চাইতেই গণেশের মাথা খসে যায়। তখন বিষ্ণু একটি হাতির কর্তিত মুণ্ড গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়ে দেন এবং বলে

যান এই হস্তি মাথার দরুণ গণেশ কোনভাবেই অনাদৃত হবেন না এবং সব দেবতার আগে তিনি পুজো পাবেন। গণেশের দুজন স্ত্রী— সিদ্ধি ও বুদ্ধি। মহাভারত লেখার জন্যে ব্যাসদেব লিপিকার খুঁজতে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে গণেশের কাছে যেতে বলেন। গণেশ মহাভারতের লিপিকার হন।

গদাধর : গদ অসুর বিষ্ণুর হাতে নিহত হলে বিশ্বকর্মা অসুরের অস্থিতে একটি গদা তৈরি করে দেন। এই গদার সাহায্যে হেতি প্রভৃতি রাক্ষসকে বিষ্ণু বধ করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম গদাধর। বামনপুরাণের মতে, হিমালয়ে কালঞ্জর পাহাড়ের উত্তরে গয়া নামক স্থানে জনৈক রাজা গয় অশ্বমেধ, নরমেধ ও মহামেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং সে সময় দরজাতে গদা হাতে পাহারায় ছিলেন বিষ্ণু। তাই তাঁর নাম গদাধর।

গোবর্ধন গিরি : মথুরা জেলায় বৃন্দাবনের কাছে একটি পাহাড়। বৃন্দাবনে ইন্দ্রকে পূজা করার প্রথা ছিল। দেশে একবার অনাবৃষ্টি হলে স্থানীয় অধিবাসীরা ইন্দ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় ইন্দ্রের পরিবর্তে গোবর্ধন পাহাড়কে সকলে পুজো করতে শুরু করলে ইন্দ্র অপমানিত বোধ করে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের দ্বারা বৃন্দাবন ধ্বংস করে ফেলতে চেষ্টা করেন। এই অবস্থায় কৃষ্ণ বাঁ হাতের এক আঙুলের সাহায্যে গোবর্ধন পাহাড়কে মাটি থেকে তুলে ছাতার মতো ব্যবহার করে বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করেন। ইন্দ্র পরাজিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চান। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথির পূর্বাহ্ণে বৈষ্ণবরা গোবর্ধন পুজো করেন। মথুরায় গোবর্ধন পাহাড়কে অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করা হয়।

গৌতম : মন্ত্রস্রষ্টা, গোত্র প্রবর্তক, সংহিতাকার গৌতমীর অপর নাম গৌতম। রামায়ণে এঁকে অহল্যার স্বামী বলা হয়েছে। গৌতমের আর একটি পরিচয় ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদ হিসেবে। গৌতম জন্মালে গৌ (= আলো) ছড়িয়ে পড়ে এবং চারদিকের তম (অন্ধকার) সরে যায়—ফলে নাম গৌতম।

রামায়ণে গৌতমের যে কাহিনী দেখা যায় সেটিই অধিক জনপ্রিয়। এ কাহিনী অনুসারে গৌতম অহল্যার স্বামী। পুত্রদের নাম শতানন্দ, শরদ্বাস ও চিরকারী। গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র একদিন আশ্রমে আসেন, অহল্যা যথারীতি অতিথি সৎকার করেন। ইন্দ্র এর পরে ফিরে যান—গৌতমও আশ্রমে ফিরে আসেন। ইন্দ্রের আসার খবর জেনে তিনি অহল্যাকে সন্দেহ করেন এবং পুত্র চিরকারীকে ডেকে অহল্যার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিয়ে বনে ফিরে যান। পুত্র ভাবছিলেন পিতার আদেশ পালন করা উচিৎ হবে কি না—অন্যদিকে বনে গিয়ে গৌতম নিজের ভুল বুঝতে পেরে আশ্রমে ফিরে আসেন—চিরকারী পিতাকে অন্যায় আদেশের কুফল বোঝালে গৌতম পুত্রকে আশীর্বাদ করেন। এই কাহিনীরই আর একটা রূপ পাওয়া যায়। ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন, ফলে ইন্দ্র ও অহল্যা—উভয়কেই গৌতম অভিশাপ দেন।

গৌরী : বরাহপুরাণের মতে গৌরীর আদি পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্রের হাতে সমর্পণ করেন। রুদ্র তপস্যার জন্যে সমুদ্রে ডুব দিলে ব্রহ্মা এই কন্যাকে দক্ষের হাতে তুলে দেন। দক্ষযজ্ঞে শিব নিমন্ত্রিত না হওয়ায় এবং যজ্ঞস্থলে গৌরীর উপস্থিতিতে দক্ষ জামাতাকে অপমান করায় সতী প্রাণত্যাগ করেন। গৌরীকে ছলনার উদ্দেশে শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে এক মকরের আক্রমণে শিব উচ্চৈস্বরে গৌরীকে আহ্বান করলে তিনি সাহায্যার্থে ছুটে এসে শিবের হাত

ধরলে মহাদেব নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। এরপর শিব ও গৌরীর বিবাহ হয়। কূর্মপুরাণে মেনার কন্যার নাম কালী। সৌরপুরাণও তাঁর 'কালী' নাম সমর্থন করে। বামনপুরাণের মতে, মেনকার তিন কন্যার মধ্যে কালিকাই কনিষ্ঠা। গৌরীর জন্মের আর এক কাহিনী পাওয়া যায়। ব্রহ্মা রাত্রি দেবীকে পাঠিয়ে জন্মের সময় গৌরীর রং কালো করে দিয়েছিলেন। আর পদ্মপুরাণ বলে, তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দিলে খোলস ত্যাগ করে কালী গৌরী হন। এই খোলস একানংশা বা কৌশিকী। পদ্ম, মৎস, স্কন্ধ পুরাণগুলিতেও গৌরীর জন্ম সম্পর্কে আরও অনেক কাহিনীই পাওয়া যায়। রামপুরাণ মতে, ইন্দ্র এঁকে সিংহ দান করে বিন্ধ্য পর্বতে বাস করার ব্যবস্থা করে দেন এবং ইনিই মহিষাসুর বধ করেন। দৈত্যে ভ্রাতৃদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ এঁর হাতে হত হন, এ তথ্য শিবপুরাণের। এঁর অন্যান্য নাম পার্বতী, দুর্গা, উমা, কাত্যায়নী, অম্বিকা, চণ্ডী।

॥ চ ॥

চণ্ডী : দেবীভাগবতে পাওয়া যায় যে, মহিষাসুর বহুবছর তপস্যার পর ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করে যে, একমাত্র নারীই তার হন্তারক হতে পারবে। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবকুল তখন ত্রস্ত—এই অবস্থায় বিষ্ণু পরামর্শ দিলেন সকলের তেজ থেকে নির্মিত হোক এক শক্তি। দেবীভাগবতে ইনি মহালক্ষ্মী নামে পরিকীর্তিতা। বামনপুরাণে ইনি কাত্যায়নী। দেবতাদের তেজ কাত্যায়ন ঋষির আহ্বানে এসে রূপ নিয়েছিল বলে এই নাম। কাত্যায়নী শিবের কেউ নন। মহিষাসুর বধের পর দেবতারা ও সিদ্ধরা দেবীকে স্তব করলে তিনি শিবের চরণে এসে ঠাঁই নেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ মোটামুটি একই রকম কথা বলে। ভীত, সন্ত্রস্ত, চিন্তিত দেবকুলের মুখ থেকে তেজ নির্গত হতে থাকলে তা পরে পুঞ্জীভূত হয়ে যে-নারীমূর্তির আকার ধারণ করে তিনিই চণ্ডী। এরপর দেবতাদের স্তবে প্রীত হলে দেবীর দেহ থেকে যিনি বেরিয়ে আসেন তিনি কৌশিকী এবং অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে রইল তিনি কালিকা নামে পরিচিত হলেন, যিনি হিমালয়ে আশ্রয় নেন। চণ্ডীর মুখ থেকে তাঁর অন্যান্য শক্তিরূপ—ব্রহ্মাণী বা কৌমারী বেরিয়ে এসেছিলেন মহিষাসুরের অনুচর ধূম্রলোচন চণ্ডমুণ্ড-রক্তবীজ বধের সময়। এ-গল্প মার্কণ্ডেয় ও বামনপুরাণে কথিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে আছে যে, এই দেবী প্রথমবার মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়কে বধ করেছিলেন। তখন তিনি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা, মহামায়া। মহাভারতে চণ্ডীর ব্যাপক উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ইনি খ্রিস্টপূর্ব সময়ের দেবী। কোনও কোনও উপনিষদে ইনি উমা-হৈমবতী হিসেবেও উল্লেখিত হন, যা আর্য কল্পনারই প্রকাশ বলে মনে হয়। অনেকের মতে, দুর্গা-চণ্ডী অনার্য কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত। পরবর্তীকালে সব মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এই দেবীকে স্তুতি জানাতে মার্কণ্ডেয়পুরাণ-এ ৭০০ শ্লোক রচিত হয়েছে যার নাম 'সপ্তশতী'। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই অধ্যায়ের সাধারণ পরিচয় 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে।

চ্যবন : মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার সন্তান। গর্ভকালে পুলোমার প্রাক্তন পাণিপ্রার্থী এক রাক্ষস পুলোমাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। মায়ের বিপদ দেখে শিশু গর্ভচ্যুত হয় এবং শিশুর তেজে রাক্ষস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গর্ভচ্যুত বলে নাম হয় চ্যবন। বাল্যকাল থেকে তপস্যা করতে করতে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দেহ বল্মীক ও লতাপাতায় চাপা পড়ে যায়। এই সময় রাজা শর্যাতি তাঁর চার হাজার স্ত্রী ও মেয়ে সুকন্যাকে নিয়ে ঐ স্থানে বিহারে আসেন। সুকন্যাকে দেখে মুগ্ধ চ্যবন তাকে ডাকেন, কিন্তু সুকন্যা শুনতে পান না। উইঢিবি দেখে

সুকন্যা তা ভাঙতে গেলে কে যেন মানুষের গলায় ঐ কাজে বিরত থাকতে বলেন। সুকন্যা নিরস্ত হলেও উইঢিবির মধ্যে টিপটিপ করে জ্বলতে থাকা চোখ দুটি কাঁটা ফুটিয়ে নষ্ট করে দেন। এতে চ্যবন অভিশাপ দিয়ে রাজার সৈন্যদের মলমূত্র নিঃসরণ রুদ্ধ করে দেন। রাজা সুকন্যার অপরাধের কথা জেনে চ্যবনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুকন্যাকে বিয়ে করার শর্তে চ্যবন ক্ষমা করতে রাজি হন। রাজা শর্ত মেনে সুকন্যার সঙ্গে চ্যবনের বিবাহ সম্পন্ন করেন। বিয়ের পর সুকন্যা তাপসী রূপে স্বামীর সেবা করতে থাকেন।

॥ জ ॥

জগন্নাথ : ইনি কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য। জগন্নাথের পুজো সারা ভারতে হয়ে থাকে। ওড়িশার পুরীতে এঁর মন্দির। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রায় ও আষাঢ় মাসে রথযাত্রায় ইনি বিশেষভাবে পূজিত হন। ওড়িশা ও বাঙলার কোনও মন্দিরে বিষ্ণুর নবম অবতার হিসেবে জগন্নাথ পূজিত হয়ে থাকেন। পুরীতে অধিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির আনুমানিক দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এখানে জগন্নাথের মূর্তি নির্মিত হয় নিমকাঠের দ্বারা। বেশ কিছু বছর পর পর নিমকাঠের মূর্তিগুলি (জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা) মাটিতে সমাধিস্থ করে নতুন মূর্তি নির্মাণ করা হয়। তবে পুরোনো বিগ্রহ থেকে কোনও একটি অংশ নতুন মূর্তির মধ্যে রাখা হয়, যা পুরোহিতেরও অজানা থাকে । জগন্নাথ-মূর্তি বাহুহীন। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার মুখে কৃষ্ণ ব্যাধের তীরে প্রাণ হারানোর পর তাঁর অস্থি কয়েকজন ভক্ত সংগ্রহ করে তুলে রাখে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুপূজা করতে চাইলেও মূর্তির অভাবে পূজা সম্পন্ন হয় না। তখন বিষ্ণু এসে ইন্দ্রদ্যুম্নকে তাঁর সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে তার মধ্যে কৃষ্ণের অস্থি স্থাপন করতে বলেন। বিশ্বকর্মার ওপর মূর্তি নির্মাণের ভার পড়ে। শর্ত ছিল যতদিন মূর্তি তৈরি শেষ না হচ্ছে ততদিন যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। পনেরো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাজা উপস্থিত হলেন বিশ্বকর্মার কারখানায়। বিশ্বকর্মা রাগে মূর্তির হাত-পা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যান। এরপর ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার কাছে বিধান চাইলে মূর্তির চক্ষু ও প্রাণদান করে নিজেরাই পুরোহিত হয়ে পূজা করেন।

জয়া : পৌরাণিক কাহিনীতে জয়া নামের অনেকগুলির চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে। যেমন— (১) অন্ধক অসুরের রক্ত পান করার জন্য মহাদেব যে মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন তাঁদের একজন; (২) লক্ষ্মীর একজন সহচরী; (৩) গৌতম-পত্নী অহল্যার চার কন্যার অন্যতমা; (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর একজন; (৫) পার্বতীর এক সহচরী, যিনি প্রজাপতি কুশাশ্বের কন্যা; (৬) দক্ষের একজন কন্যা।

জম্বুদ্বীপ : খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনে তাঁর সাম্রাজ্যকে কখনো পৃথিবী আবার কখনো জম্বুদ্বীপ বলা হয়েছে। অশোকের সাম্রাজ্য অবশ্য ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান মিলিয়ে। সিংহলের পালি গ্রন্থেও এই ভূ-খণ্ডের নাম জম্বুদ্বীপ। পুরাণে সপ্তদ্বীপ নামে পৃথিবীর কল্পনা প্রাধান্য পায়। কল্পিত হয় সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার দ্বীপ নিয়ে পৃথিবী গঠিত। এদের মধ্যে লবণবেষ্টিত জম্বুদ্বীপের অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে মনে করা হত। জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রে সুমেরু পর্বত ও চতুর্দিকে ইলাবৃত বর্ষ। জম্বুদ্বীপে মোট নয়টি বর্ষ : ইলাবৃত, ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক, হিরণ্ময়, উত্তর-কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল এবং সাতটি বর্ষ পর্বত : হিমবান, হেমকুট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান।

জহ্নুমুনি : এঁকে নিয়েও নানা কাহিনী প্রচলিত। একমতে উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার সাত ছেলের

একজন। গঙ্গাকে নিয়ে এঁর সম্বন্ধে দুটি কাহিনী প্রচলিত। গঙ্গা এঁকে পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যখ্যাতা হন। তখন গঙ্গা এঁর যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেন। মুনি তখন রেগে গিয়ে গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করে ফেলেন। সেই থেকে গঙ্গা জহ্নুর কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি পান; নাম হয় জাহ্নবী। অন্যমতে ভগীরথ তাঁর পূর্বপুরুষদের উদ্ধারকল্পে যখন গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিলেন তখন গঙ্গা জহ্নুমুনির যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে কান দিয়ে, অন্য মতে জানু থেকে বার করে দেন, এই কারণে গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী।

জৈমিনি : একজন বাকসিদ্ধ ঋষি। ইনি পূর্বমীমাংসা দর্শনের রচয়িতা। সম্ভবত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইনি আবির্ভূত হন। বেদের কর্মকাণ্ডের সূত্রগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সংশোধন করা এঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। সেই অর্থে তিনি প্রাথমিক সূত্রকার হিসেবেও গণ্য হতে পারেন। ভাগবত মতে তিনি ব্যাসের শিষ্য। তাঁর শিষ্য সুমন্ত। নৈমিষারণ্যে হিরণ্যনাভকে জৈমিনি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ শোনান। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। জৈমিনির মতে, বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ; ঈশ্বরকৃত নয়। তাঁর বচনায় মোক্ষ ও ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায় না। এঁর লেখা মহাভারত জৈমিনি মহাভারত নামে পরিচিত। ছান্দোগ্যানুবাদও এঁর প্রণীত বলা মনে করা হয়।

।। দ ।।

দক্ষ : ব্রহ্মার এক পুত্র। ইনিও একজন প্রজাপতি। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে জন্ম বলে এর নাম হয় দক্ষ। ভাগবতে দক্ষকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়েছে. সনকাদি চারজন পুত্র ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যে সহায়তা না করায় ব্রহ্মা মরীচ, অত্রি, দক্ষ, প্রমুখ পুত্রের জন্ম দেন। ব্রহ্মার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনু ও শতরূপা জন্মান। শতরূপার গর্ভে মনুর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। প্রসূতির সঙ্গে দক্ষের বিয়ে হয়, অর্থাৎ দক্ষ নিজের ছোট ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করেন। প্রসূতির ষোলটি কন্যার অন্যতমা সতী-র সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হয়েছিল। ঋক্‌বেদে দক্ষকে আদিত্য বলা হয়েছে। একবার এক যজ্ঞে বিশিষ্ট দেবগণের মধ্যে দক্ষ উপস্থিত হলে ব্রহ্মা এবং শিব ছাড়া সকলেই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শাপ দেন মহাদেব কোন যজ্ঞে যজ্ঞের ভাগ পাবেন না। পরে দক্ষ আয়োজিত এক যজ্ঞে শিব নিমন্ত্রণ পাননা আর বিনা নিমন্ত্রণে সতী উপস্থিত হ'লে সভাস্থ সকলের সামনেই দক্ষ শিবনিন্দা শুরু করেন। সতী এতে অপমানিত হয়ে যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। আর তাঁর তনুত্যাগের কথা শুনে ক্রুদ্ধ শিব তাঁর অনুচরদের নিয়ে দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন।

দধীচি : অর্থবা ঋষির পুত্র বলে ঋক্‌বেদে কথিত আছে। ইনি শিবভক্ত ছিলেন বলে দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছিলেন। বৃত্রাসুরের আক্রমণে উৎপীড়িত ইন্দ্রাদি দেবতাদের রক্ষা করবার জন্য ঋষি দধীচি প্রাণ বিসর্জন দেন। ইন্দ্র তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মিত করে অসুরদের বধ করেন। এঁর মাতার নাম শান্তি।

দুর্বাসা : মহর্ষি অত্রি ও অনুসূয়ার পুত্র। দেবীভাগবত-এর মতে, দুর্বাসার জন্ম শিবের অংশে হলেও তিনি পরম বৈষ্ণব। যেমন তেজস্বী, তেমনি ক্রোধী। অনেককেই অভিশাপ দিয়েছেন। দুর্বাসার দেওয়া মালা মাটিতে ফেলে দেওয়ার জন্য ইন্দ্র অভিশপ্ত হন।

শকুন্তলাকে শাপ দিয়েছিলেন সঙ্কটকালে দুষ্যন্ত তাঁকে চিনতে পারবেন না। এঁর শাপে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব মুষল প্রসব করেন। এই ঋষির জন্মকাহিনী নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। একটি মতে বলা হয়, ব্রহ্মা ও শিব যুদ্ধ শুরু করলে দেবতারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। শিব ক্রোধে ব্রহ্মার একটি মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলেন। বাকি ক্রোধ অনুসূয়াতে আরোপিত হলে তাঁর গর্ভে ক্রোধী দুর্বাসার জন্ম হয়। অন্য মতে, ত্রিপুরকে ধ্বংস করার জন্য মহাদেব যে বাণ সন্ধান করেছিলেন সেই বাণ কার্যসিদ্ধির পব শিবের কাছে ফিরে আসে শিশুপুত্র হিসেবে। ইনিই দুর্বাসা। ঔর্ব মুনির কন্যা কন্দলী দুর্বাসার পত্নী। কথামতো তিনি স্ত্রীর একশোটি অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু অতিরিক্ত হতেই স্ত্রীকে ভস্ম করে ফেলেন। মহারাজা অম্বরীষের কাছে ইনি হতদর্প হন। পাণ্ডবদের বনবাস কালে দুর্যোধনের অনুরোধে দশ হাজার শিষ্য-সহ দ্রৌপদীকে অপ্রস্তুত করতে চাইলে কৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সে কৌশল ব্যর্থ হয়।

দেবল : (১) সবস্বতী তীরে আদিত্য তীর্থবাসী গৃহস্থ তপস্বী ধৌম্যের বড় ভাই। অনেক জায়গায় তিনি অমিতদেবল নামে পবিচিত। (২) অন্য কাহিনীতে ইতি মহর্ষি অমিতের পুত্র এবং ব্যাসের শিষ্য। শিবেব বরে তাঁর জন্ম। রম্ভা দেবলেব প্রণযাসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু দেবল তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবেন। বম্ভা তখন তাঁকে অভিশাপ দেন। রম্ভার শাপে কৃষ্ণবর্ণ হলে এবং অষ্টঅঙ্গ বেঁকে গেলে তিনি রাধাকৃষ্ণেব তপস্যা কবতে থাকেন। বাধাকৃষ্ণ দেখা দেন, কৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করলে তিনি স্বাভাবিক দেহ ফিরে পান।

॥ ধ ॥

ধৌম : মহর্ষি অমিতের ছেলে ও দেবলেব ছোট ভাই। জতুগৃহ ঘটনা ঘটবার পব ধৌম পাণ্ডবদের পুরোহিত হন। ধৌম দ্রৌপদীর সঙ্গে পাণ্ডবদেব পাঁচ ভাইয়ের পৃথকভাবে বিবাহ দেন, পাণ্ডবপুত্রদেব উপনয়নও তিনি করান। পাণ্ডবদেব বনবাস গমনেব সময় ইনি কুশ হাতে মন্ত্রোচ্চাবণ কবতে কবতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান এবং সঙ্গে থাকেন। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটনগরে কিভাবে থাকতে হবে সে উপদেশও তিনি পাণ্ডবদের প্রদান কবেন।

॥ ন ॥

নন্দী : মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক। মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে অযোনি সম্ভব পুত্র পান। এই পুত্র নন্দী বহুদিন মহাদেবের পূজা করে তাঁর গণমধ্যে পরিগণিত হন। মরুৎদের মেয়ে সুযশার সঙ্গে মহাদেব নন্দীর বিয়ে দেন। নন্দীর সঙ্গী ভৃঙ্গী। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করাব ক্ষেত্রে এঁদের প্রধান ভূমিকা ছিল। কুবেরকে জয় করে ফেরার পথে রাবণ যে-পথ দিয়ে লঙ্কায় আসছিলেন সে-পথে শিব ও পার্বতী তখন বিহার করছিলেন। রাবণকে যেতে বারণ করলে তিনি নন্দীর মুখ দেখে হেসে ফেললে নন্দী অভিশাপ দেন তাঁর মুখের আকৃতি বিশিষ্ট বানররা বাবণকে সবংশে নিধন করবে। তবে লিঙ্গপুরাণে নন্দী সম্পূর্ণ মনুষ্যমূর্তি। রামায়ণে তিনি কবাল-কৃষ্ণ-পিঙ্গল ঃ বামন ঃ বিকট ঃ মুণ্ডী নন্দী হ্রস্বভুজ ঃ বলী এবং বানররূপ। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে নন্দী ত্রিনেত্র চতুর্ভুজ, পবিধানে ব্যাঘ্রাচর্ম, হাতে ত্রিশূল ও ভিন্দিপাল এবং একহাত মাথায় ও এক হাতে তর্জনী মুদ্রা।

নারদ : ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, কোল থেকে জন্ম। নারদ সপ্তর্ষি নন, বেদে এঁর উল্লেখ নেই। ইনি ত্রিকালদর্শী, বেদজ্ঞ এবং হরিভক্ত তপস্বী। তর্পণের জন্য ইনি সর্বদা নার বা জল দান করতেন বলে বা অনাবৃষ্টির পর জন্মেছিলেন বলে এঁব নাম হয় নারদ। পুরাণে নারদকে

নিয়ে অসংখ্য কাহিনী পাওয়া যায়। বীণা বাজিয়ে হরি গুণগান গেয়ে ত্রিভুবন ঘুরে সকলকে মোহিত করে বেড়াতেন। পরামর্শ দেওয়া, গোপন খবর জানিয়ে দেওয়া, ঘটকালি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। শিবের বিবাহ দেওয়া, ধ্রুবকে তপস্যার মন্ত্র দেওয়া, দক্ষের দর্প চূর্ণ করার ব্যবস্থা করা—এ-সবই এঁর কাজ। দেবতারা যে কংসবধের আয়োজন করছেন সে-খবর কংসকে ইনিই জানিয়ে দেন। গোপন খবর প্রকাশ করার ইচ্ছে থেকে কলহ সৃষ্টির সূচনা করা নারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নারদের বাহন হিসেবে ঢেঁকির উল্লেখ থাকলেও তার কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ নেই। নারদস্মৃতি নারদের রচনা বলে পরিচিত। নারদের জন্ম সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। পূর্বকল্পে ব্রাহ্মণদের এক দাসীর গর্ভে নারদের জন্ম। এ তথ্য ভাগবত-এর। সর্পাঘাতে তাঁর মাতার মৃত্যুর পর তিনি সংসার ত্যাগ করে উত্তরদিকে বেরিয়ে পড়েন। এক নির্জন বনে অশ্বত্থ গাছের নিচে তপস্যায় বসে তিনি হরির দেখা পান। কল্পাবসানে নারায়ণ যোগনিদ্রা থেকে উঠে অত্রি প্রমুখ মুনির সঙ্গে নারদেরও সৃষ্টি করেন। সেই থেকে নারদ দেবদত্ত বীণায় হরিনাম করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে, নারদ ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে জন্মান। অন্য একটি মতে, কান্যকুব্জে দ্রুমিল নামে এক গোপরাজের স্ত্রী কলাবতীর দেহে কশ্যপের তেজ সঞ্চারিত হলে তারই গর্ভে নারদের জন্ম। নারদ খুব বড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলে নিজের মনে যে গর্ব পুষে রেখেছিলেন, তা ভাঙার জন্য রাগরাগিণীরা বিকলাঙ্গ হয়ে পথে পড়েছিল। হনুমানও নারদের গর্ব ভঙ্গ করেন। অগস্ত্যের শাপে নারদ 'মহতী' মানুষের হাতের বীণাতে পরিণত হন। নারদ-কৃত কয়েকটি বিশিষ্ট কাজ হল : (১) ইন্দ্রলোকে দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সংবাদ দান; (২) সগরকে তাঁর পুত্র নিধনের সংবাদ দান; (৩) পাণ্ডবদের সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী শোনানো ; (৪) প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে বহু উপদেশ দান; (৫) কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মৃত্যুসংবাদ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান; (৬) সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতির কাছে সত্যবানের অল্পায়ুর কথা জানানো ইত্যাদি।

॥ প ॥

পরাশর : বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তির ঔরসে মাতা অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জন্ম। পরাশরকে পুরাণে বৈদিক ঋষি বলা হয়েছে, যিনি বহু মন্ত্রের রচয়িতা। রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষস হয়ে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তিসমেত একশো জনকে খেয়ে ফেলে। শোকে-দুঃখে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেও বিফল হয়ে ফিরে আসার পথে বশিষ্ঠ অনুবর্তমানা পুত্রবধূর গর্ভস্থ সন্তানের বেদপাঠ শুনতে পান। বশিষ্ঠ ও অদৃশ্যন্তী একই আশ্রমে থাকতেন। পরাসু হতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পৌত্রের সম্ভাবনায় নিবৃত্ত হলেন বলে বশিষ্ঠ শক্তির পুত্রের নাম রাখেন পরাশর। বশিষ্ঠকে পরাশর একদিন 'পিতা' বলে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী সব কথা পুত্রকে জানান। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে পরাশর রাক্ষস নিধন যজ্ঞ শুরু করলে সপ্তর্ষিগণ তাঁকে নিবৃত্ত করেন। পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ পরাশরকে পুরাণ সংহিতা রচনার আশীর্বাদ প্রদান করেন। তীর্থ পর্যটনে পরাশর যমুনা তীরে এসে মৎস্যগন্ধাকে দেখতে পান, যিনি যমুনাতে খেয়া পারাপার করতেন। পরাশর তাঁকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়লে পরাশর মৎস্যগন্ধাকে সুন্দরী যোজনগন্ধাতে রূপান্তরিত করেন এবং দিবালোকে লোকচক্ষুর আড়ালে মিলন ঘটানোর জন্য নৌকার চারদিকে কুয়াশা সৃষ্টি করেন। মৎস্যগন্ধা তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন বলে তিনি

রমণীটিকে চিরকুমারীত্বের আশীর্বাদ দেন। এই কন্যার গর্ভজাত সন্তানই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

পুলহ : ব্রহ্মার নাভি থেকে জন্ম, তাঁর মানস-পুত্র ও একজন প্রজাপতি। ইনি চিত্র-শিখণ্ডিন সপ্তর্ষিদের একজন। পুলহের স্ত্রী হলেন ক্ষমা ; পাঁচ পুত্র—কর্দম, উর্বরীবান, আর্যাবৎ, সহিষ্ণু ও কর্মশ্রেষ্ঠ। পুলহের অন্যান্য সৃষ্টিরা হল—প্রজাপতি, সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, মেঘ ও কিম্পুরুষ। পরাশর যখন রাক্ষস নিধন যজ্ঞ শুরু করেছিলেন, পুলহ তখন নানা যুক্তিতে তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। গঙ্গার এক শাখা অলকানন্দার তীরে বসে পুলহ তপস্যা করতেন বলে কথিত।

পৌলস্ত্য : পুলস্তের পুত্র বা পৌত্র। পুলস্ত ব্রহ্মার একজন মানসপুত্র ছিলেন। পুলস্তের পত্নীরা হলেন প্রীতি, হবির্ভূ ও গৌ। মহাভারতে সন্ধ্যা ও প্রতীকী নামে তাঁর আর দুইজন ভার্যার কথা বলা হয়েছে। হবির্ভূর গর্ভজাত সন্তান হলেন বিশ্রবন। বিশ্রবন বা বিশ্রবার পুত্র রাবণ ও কুবের। সেই অর্থে পৌলস্ত্য বলতে এদেরকেই বোঝায়। মহাভারতের মতে, পুলস্ত্যের সন্তানেরা বানর, রাক্ষস, যজ্ঞ, গন্ধর্ব ও কিন্নর।

প্রজাপতি : প্রজাদের যাঁরা সৃষ্টি ও রক্ষা করেন তাঁরাই প্রজাপতি। বেদে ইন্দ্র, সাবিত্রী, হোম, হিরণ্যগর্ভাদিকে প্রজাপতি বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাই প্রজাপতি, কারণ ইনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার পুত্র স্বয়ম্ভুব মনুও প্রজাপতি। মনু সৃষ্টি করেছেন একজন ঋষিকে। অন্য মতে, এঁরা ব্রহ্মারই মানসপুত্র। পুরাণে মোট ষোলজন প্রজাপতির নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন—মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরস, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, কর্দম, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি, কশ্যপ, বিকৃত শেষ, সংশর্য ও স্থাণু। অন্য আর একটি মতে ব্রহ্মা প্রথমে সৃষ্টি করেন একুশ জন প্রজাপতিকে, তাঁরাই অন্যদেব সৃষ্টি করেন। এই একুশ জন প্রজাপতির নাম হল : ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম তপ, যম, মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, সূর্য, চন্দ্র, কর্দম, পরমেষ্ঠ, ক্রোধ ও বিকৃত।

প্রচেতা : বৈদিক যুগে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। দুঃস্বপ্ন ও অমঙ্গল নাশের জন্য কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। মহাভারতের একটি সংস্করণ অনুযায়ী প্রচেতার দশ পুত্র—আর এই দশজনের পুত্র দক্ষ।

প্রসূতি : স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার তিন কন্যার অন্যতমা। এঁর অপর দুই ভগিনীর নাম আকূতি ও দেবহুতি। প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের স্ত্রী, এঁর গর্ভে দক্ষের চব্বিশটি কন্যা হয়। এর মধ্যে তেরো জন ধর্মের স্ত্রী। বাকি এগারো জনের মধ্যে খ্যাতির সঙ্গে ভৃগুর, সতীর সঙ্গে শিবের, সম্ভূতির সঙ্গে মরীচির, স্মৃতির সঙ্গে অঙ্গিরসের, প্রীতির সঙ্গে পুলস্ত্যের, ক্ষমার সঙ্গে পুলহের, শান্তির সঙ্গে ক্রতুর, অনসূয়ার সঙ্গে অত্রির, উর্জার সঙ্গে বশিষ্ঠের, স্বাহার সঙ্গে অগ্নির এবং স্বধার সঙ্গে পিতৃদেবগণের বিবাহ হয়। শিবনিন্দার কারণে যজ্ঞস্থলে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ হয়—প্রসূতির অনুরোধে শিব তাঁকে পুনর্জীবিত করেন।

॥ ব ॥

বরুণ : একজন বৈদিক দেবতা, ইন্দ্রের মতো সহস্রলোচন। বেদের বহু জায়গায় মিত্র ও বরুণকে একটি মাত্র দেবতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—মিত্রাবরুণ মঙ্গলদাতা। মিত্র

আলোর দেবতা হলেও আবরণ রচনাকারী আকাশকে আর্যরা বরুণ বলতেন। ঋক্‌বেদে আকাশকে জলময় সমুদ্র বলা হয়েছে। এইজন্যে অবকাশ ও সমুদ্রের মিলনরেখাকে বরুণের বাসস্থান বলা হয়। বরুণ ধনাধিকারী; জলবিন্দুর মতো শুভ্র, গৌরমৃগের মতো বলবান। বৃষ্টি দান করে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র রাখেন। ঋক্‌বেদে বরুণ ও মিত্র বৃষ্টির দেবতা। এঁর চোখ সূর্য, রথ ও প্রাসাদ সোনার। মহাভারত মতে, ইনি কর্দম মুনির সন্তান। অনেকগুলি স্ত্রী, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—গৌরী, বরুণানী, চার্ষণী। পুত্র সুষেণ, বন্দী, বশিষ্ঠ ও কন্যা বারুণী ও মনোরমা। দক্ষ সাবর্ণি এবং পুষ্করও বরুণের পুত্র। দক্ষযজ্ঞে ভৃগু মারা গিয়ে চার্ষণীর পুত্র হয়ে জন্মান। বরুণের বীর্য বল্মীকের ওপর পড়লে বাল্মীকির জন্ম হয়। মিত্রাবরুণের ছেলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য। উতথ্যের স্ত্রী চন্দ্রকন্যা ভদ্রাকে বরুণ চুরি করেন। বরুণ হরিশচন্দ্রকে একবার শাপ দিয়েছিলেন। খাণ্ডবদাহনের সময় অগ্নির অনুরোধে বরুণ গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ এবং কবিধ্বজ রথ অর্জুনকে দান করেন। চক্র ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে দেন।

॥ ব ॥

বশিষ্ঠ : দশজন প্রজাপতির অন্যতম। হরিবংশের মতে ব্রহ্মার সাত মানস পুত্রের একজন। ব্রহ্মার তেজ থেকে জন্ম। ঋক্‌বেদে সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। অন্য পুরাণে তিনি সপ্তর্ষিদের একজন হিসেবে কথিত। দক্ষযজ্ঞে বশিষ্ঠও মারা যান এবং স্ত্রী অরুন্ধতী সহমৃতা হন। অরুন্ধতী ব্যতীত তাঁব আর তিনজন ভার্যা . উর্জা, অক্ষমালা ও শতরূপা। এঁর পুত্র শক্তি, পৌত্র পরাশর। বশিষ্ঠ রাজা সুদাস, মুচুকুন্দ প্রমুখের কুলপুরোহিত ছিলেন। ইক্ষাকু বংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত। রামচন্দ্রের গুরু ও মন্ত্রী। রাবণের হাতে ইনি একবার বন্দি হন। ভীষ্ম বাল্যকালে এঁর কাছে বেদ অধ্যয়ন করেন। কুরুক্ষেত্রে এসে দ্রোণকে যুদ্ধ বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তপতী-সংবরণের বিয়ে দেন। বশিষ্ঠ ইলাকে পুরুষে পরিবর্তন করেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদ পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী আকাশে দুটি নক্ষত্রে পরিণত হন।

বসুদেব : যদুবংশে শূরসেনের ঔরসে ভোজকন্যা মারিষার গর্ভে জন্ম। কুন্তী বসুদেবেরই ভগিনী। কংস ধ্বংসের কারণে কশ্যপ, অদিতি ও সুরসা যথাক্রমে বসুদেব, দেবকী ও রোহিণী হয়ে জন্মান। বসুদেবের স্ত্রী দেবকী, ছেলে কৃষ্ণ ও কন্যা সুভদ্রা, রোহিণীর গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে অনাতম · বলরাম, সারণ ও দম। উপদেবী, বৃকদেবী, সপ্তমী, শ্রদ্ধা, শ্রুতন্ধরা, জনা ব্যতীত তাঁর পুরবী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা, মালিনী ও কৌশল্যা নামে পত্নী ছিল। কৃষ্ণ জন্মালে বসুদেবই গোকুলে নন্দের ঘরে যশোদার কাছে রেখে আসেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ তিনি কৃষ্ণ কর্তৃক অবগত হন। অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ বসুদেবই করেছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তিনি যোগমগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেন।

॥ ব ॥

বারাণসী : উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার বামকূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি তীরভূমি। প্রাচীন কাশীর রাজধানী—গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী। বরুণা বারা ও অসি নদীর সঙ্গমস্থলে একটি শহর। আগে ছিল গঙ্গা ও গোমতীর সঙ্গম। এখানে অবস্থিত মণিকর্ণিকা ঘাট একটি পবিত্র স্থান—এটি রাজা হরিশচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে জড়িত। বারাণসী একটি পীঠস্থান—দেবীর বাম হাত এখানে

পড়েছিল, দেবী এখানে অন্নপূর্ণা। প্রাচীন ভাবতের দুটি ব্রাহ্মণ্য বিশ্ববিদ্যালয়েব একটির অবস্থান বারাণসীতে (অন্যটি তক্ষশীলায়)।

বাল্মীকি : প্রচেতা ঋষির বংশধর। ভাগবতে বরুণের পুত্র বলে উল্লেখ আছে। বামায়ণ রচয়িতা (তবে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই)। যৌবনে দস্যু ছিলেন। নাম বত্নাকর। নারদ একদিন বনে এসে তাঁকে জানান যে পাপ তিনি করছেন সেই পাপের ভাগ কেউ নেবে না। বাড়িতে গিয়ে তিনি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হন। নারদের উপদেশে তখন ষাট হাজারবার রাম নাম জপ করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তপস্যা করতে কবতে দেহ বল্মীকে ঢাকা পড়ে যায়। তাই নাম হয় বাল্মীকি। এরপর একদিন নারদ এসে তাঁকে রামকাহিনী শুনিয়ে যান। এরপর একদিন তমসা নদীর তীরে যখন তিনি অবস্থান করছিলেন তখন দেখলেন এক ব্যাধ উড়ে যাওযা ক্রৌঞ্চ মিথুনের পুরুষ পাখিটিকে হত্যা করলে ক্রৌঞ্চী বিলাপ করতে থেকে। এই দৃশ্য দেখে বিচলিত বাল্মীকিব কণ্ঠ থেকে ব্যাধের প্রতি অভিশাপবাণী বর্ষিত হয় : মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ. যৎ ক্রৌঞ্চিমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কাম মোহিতম্। এই শ্লোকটিকে কবিতার আদি শ্লোক বলা হয়। ব্রহ্মা এই শ্লোকের ছন্দে বাল্মীকিকে বামায়ণ রচনা করতে নির্দেশ দেন।

ব্যাসদেব : পিতা পরাশর, মাতা দাসরাজের পালিতা-কন্যা মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী। পিতামহ শক্তি, প্রপিতামহ বশিষ্ঠ। দ্বীপে জন্ম এবং বর্ণ কৃষ্ণ বলে প্রকৃত নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদকে বিভক্ত করেছিলেন বলে নাম বেদব্যাস। মহাভারতের রচনাকার। এঁর চেহারা কুৎসিত। ব্যাসই যুগে যুগে বেদকে রক্ষা করেছিলেন। বোধহয় এই কারণে তাঁকে পুরাণে কৃষ্ণের অংশে জাত বলা হয়েছে। পণ্ডিতদেব মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০-১৫০০ শতকেব মধ্যে কোন এক সময় জীবিত ছিলেন। প্রতি মন্বন্তরে একজন করে মোট ২৮ জন ব্যাসের উল্লেখ নানা পুরাণে পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয়, ব্যাস কোনও বিশেষ ব্যক্তি নন, বেদ বিভাগকাবী ঋষিদের উপাধি। চেদিরাজ বসুর বীর্য পান করে অদ্রিকার কন্যা হয় মৎস্যগন্ধা। মৎস্যজীবী পিতার কাছে এই কন্যা পালিতা হন। একদা পরাশর এই রমণীকে সম্ভোগ করলে বেদব্যাসের জন্ম হয়। জন্মেই ব্যাস বড় হয়ে ওঠেন এবং মার অনুমতি নিয়ে তপস্যা করতে চলে যান। সরস্বতী নদীব তীরে তাঁর আশ্রম। অপ্সরারা নানা বকম বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন। ঘৃতাচী পাঁচরঙা শুকের বেশে সামনে দিয়ে উড়ে গেলে ব্যাসের বীর্য স্খলিত হয়ে শুকদেহের জন্ম হয়। বিচিত্রবীর্য মারা গেলে সত্যবতীব নির্দেশে তিনি অম্বিকা, অম্বালিকা ও অম্বিকার দাসীর গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম দেন। পাণ্ডুর মৃত্যুতে কুন্তীকে সান্ত্বনা, পাণ্ডবদেব পাঞ্চালীর জন্মবৃত্তান্ত শোনানো, রাজসূয় যজ্ঞে ভীমার্জুনকে নানা দিকে পাঠানো, বনবাসে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করা, সাত্যকিকে নিরস্ত কবা, শরশয্যায় ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করা, অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনকে সান্ত্বনা দান ইত্যাদি ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিনি শুধু মহাভারতের রচয়িতা ছিলেন না—মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্রও ছিলেন।

ব্রহ্মা : বৈদিক যুগের শেষের দিকে ব্রহ্ম বোধহয় ব্রহ্মাতে পরিণত হন। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার কোনও উল্লেখ নেই। সেখানে পাওয়া যায় হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির উল্লেখ। পুরাণে ব্রহ্মার চার হাত পঞ্চমুখ এবং তিনি অন্তরীক্ষের দেবতা। ইনি হংসবাহন, হাতে অক্ষমালা, পুস্তক এবং কমণ্ডলু। পুরাণে কথিত আছে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর নাভিমূল থেকে

ব্রহ্মার জন্ম। দেবতা হিসেবে ব্রহ্মা সর্বত্র পূজিত। তবে মনুতে আছে ব্রহ্মাণ্ড থেকে ব্রহ্মার জন্ম। প্রলয়ান্তে সমস্ত অন্ধকারে ডুবে গেলে ব্রহ্মা নিজের তেজে জল সৃষ্টি করে সেই জলে সৃষ্টির বীজ স্থাপিত করেন। এই বীজ সোনার ডিমে রূপান্তরিত হয় এবং ব্রহ্মা এর মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন। এই ডিম ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলে তারই একটি অংশ পৃথিবীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, দক্ষ প্রমুখ দশজন প্রজাপতিই প্রধান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার কন্যা-কামিনীর কাহিনী আছে। ব্রহ্মার কন্যা দেবসেনা, সন্ধ্যা ও শতরূপা। সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী এঁর স্ত্রী। ব্রহ্মার বাসস্থান মেরু পর্বতে। আত্মদেহকে অর্ধেক অংশে বিচ্ছিন্ন করে শতরূপাকে তিনি সৃষ্টি করেন ও তাঁকে বিবাহ করেন। শতরূপা এত সুন্দরী ছিলেন যে, ব্রহ্মা তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতেন না। ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করার সময় শতরূপাকে দেখতে অসুবিধে হওয়ায় ব্রহ্মার চারটি মাথা হয়। শতরূপার সৌন্দর্য ব্রহ্মার চতুর্মুখের কারণ। ব্রহ্মাকে নিয়ে কাহিনীর শেষ নেই। শিবের সঙ্গে বিবাদ, রামায়ণ রচনার নির্দেশ, বিভিন্ন রাক্ষসকে বরদান, গায়ত্রীকে শাপ দান ইত্যাদি প্রচুর কাহিনী পাওয়া যায় ব্রহ্মার সম্বন্ধে। একটি মতে ব্রহ্মার পত্নী অনসূয়ার পুত্র চন্দ্র। ইনি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। ত্রিপুর ধ্বংসে শিবের সারথি হয়েছিলেন। ব্যাসের আশ্রমে এসে তাঁকে মহাভারত রচনার নির্দেশ দেন। বরুণ যজ্ঞের আগুন থেকে ভৃগুর জন্ম দেন ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে তিলোত্তমা সৃষ্টি করতে বলেন। গাণ্ডীব ধনু নির্মাণ ও খাণ্ডব দাহনের পরামর্শ ব্রহ্মারই কীর্তি। হিরণ্য শৃঙ্গ পর্বত শিখরে, বিন্দু সরোবরে, প্রয়াগে ও কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন। দেবতারা বারবার বিপাকে পড়লে ব্রহ্মার সমীপে আসেন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। শিবের বিবাহে তিনি ছিলেন পুরোহিত।

বিশ্বরূপ : বিশ্বকে রূপে প্রত্যক্ষ করানোই হল বিশ্বরূপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন—মহাভারতে আরও তিনবার তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। যশোদা বালক কৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দেখতে পান। পুরাণে আছে সতী জন্মেই দক্ষকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। বস্তুত বিশ্বরূপ দেখানো তখন একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

বিশ্বকর্মা : বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রীর গর্ভে প্রভাস নামে বসুর পুত্র। ইনি শিল্পী, ভাস্কর ও যন্ত্রের দেবতা। লঙ্কানগরী, প্রমোদভবন ইত্যাদির স্থপতি। স্বর্গে যমের ও বরুণের প্রাসাদ, পুষ্পক রথ, ইন্দ্রের বজ্র ও বিজয় নামক ধনু এবং আরও বহুবিধ অস্ত্র নির্মাণ করেন। ত্রিপুর নিধনের সময় শিবের রথ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তিলোত্তমা এঁরই সৃষ্টি, পুরীর জগন্নাথ মূর্তিও ইনি নির্মাণ করেন। বিশ্বকর্মার পুত্রকন্যার সংখ্যা নয়টি। তন্মধ্যে নল, ত্বষ্টা, সংজ্ঞা ও চিত্রাঙ্গদা উল্লেখযোগ্য। একটি মতে, ময়দানব বিশ্বকর্মারই পুত্র। এঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলায় ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। বেদে বিশ্বকর্মাকেই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাহু ও পদদ্বয় দিয়ে ইনি স্বর্গ ও মর্ত তৈরি করেন। অন্য নাম : ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা, প্রজাপতি, পিতা, সর্বজ্ঞ, কল্যাণকর্মা। সর্বমেধ যজ্ঞে নিজের কাছে নিজেকে বলি দেন।

বিশ্বামিত্র : ঋক্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রবক্তা বিশ্বামিত্র বা তাঁর বংশের কেউ। বিশ্বামিত্রের বড় বোন সত্যবতী নদীতে পরিণত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি স্নেহবশত কৌশিকী নদীর তীরে তিনি থাকতেন। এক মতে ইনি কান্যকুব্জের রাজা—পরে রাজর্ষি হন। কৌশিকী নদীর তীরে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়র মধ্যে কে বড় এ নিয়ে বার বার দ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে ঋক্‌বেদে। তবে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মর্ষি হন।

বিষ্ণু : নারায়ণ, কৃষ্ণ। সৃষ্টির পালক। ঋক্‌বেদে ৫/৬ সূক্তে এঁর স্তব আছে। কোন কোন স্থানে আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে পূজিত। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে এঁর জন্ম। দুই স্ত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। গড়ুর বিষ্ণুর বাহন। এর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। এঁর শঙ্খ পাঞ্চজন্য এবং চক্র সুদর্শন, গদা কৌমদকী। সমুদ্রমন্থনে প্রাপ্ত কৌস্তুভ মণি এঁর বক্ষোদেশে শোভা পায়। রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রয়োজনে ইনি অবতার রূপে জন্মান এবং দুষ্টের দমন করে ধর্ম সংস্থাপন করেন। পুরাণে উল্লেখ আছে বিষ্ণু দশবার দশটি পূর্ণ অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বিষ্ণুর দশটি অবতার : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, ব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি। তবে বিভিন্ন পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা আরও বেশি।

বুধ : তারার গর্ভে চন্দ্রের পুত্র। বুধ বড় হয়ে ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা হন এবং চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বুধের স্ত্রী ইলা ও পুত্র পুরূরা। বুধের আরও তিনটি পরিচয় পাওয়া যায় · (ক) একজন মুনি; (খ) জনৈক ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা এবং (গ) গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ—পাপের প্রতিমূর্তি।

॥ ভ ॥

ভরত : (১) দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র। শকুন্তলাকে রাজা প্রত্যাখ্যান করলে (দুর্বাসার অভিশাপের কারণে শকুন্তলাকে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন) মেনকা শকুন্তলাকে মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমে রেখে আসেন। এইখানেই ভরতের জন্ম। শিশুকাল থেকে বীর ও সাহসী, তাই কশ্যপ তাঁর নাম রাখেন সর্বদমন। ইন্দ্রলোক থেকে ফেরার পথে দুষ্যন্ত কশ্যপের আশ্রমে আসেন—প্রথমে চিনতে না পারলেও পরে শকুন্তলা-ভরতের মিলন ঘটে। ভরত পরে অন্য রাজাদের পরাজিত করে রাজচক্রবর্তী হন। অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্‌থা, বিশ্বজিৎ ও বাজপেয় যজ্ঞ করার পুণ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। সমগ্র দেশের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয় বলে তাঁর নাম অনুসারে দেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। বিদর্ভরাজের তিন কন্যা তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ভরতের বংশের নবম পুরুষ হলেন কুরু ও চতুর্দশ বংশধর শান্তনু। অন্য একটি কাহিনীতে ভরত রাজা দশরথের দ্বিতীয় পুত্র, মায়ের নাম কৈকেয়ী। স্ত্রী কুশধ্বজ—কন্যা মাণ্ডবী। তাঁর দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল, অন্য মতে সুবাহু ও শূরসেন। মাতুল যুধাজিৎ। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসে রামের বনবাসের প্রসঙ্গ এবং কারণের কথা শুনে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র না ফিরে পাদুকা দিলে তা মস্তকে ধারণ করে অযোধ্যার সিংহাসনে রেখে রামের নামে চতুর্দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেছিলেন। রামচন্দ্র সরযূতে দেহত্যাগ করলে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করেন।

ভরদ্বাজ : উতথ্যের একজন ঋষি পত্নীর নাম মমতা, ছোটভাই দেবগুরু বৃহস্পতি। উতথ্যের অনুপস্থিতিতে বৃহস্পতি উত্তথ্যের স্ত্রী মমতার প্রতি কাম অনুভব করেন। মমতা অস্বীকার করলে বৃহস্পতির বীর্য মাটিতে পড়ে একটি ছেলেতে পরিণত হয়। এই ছেলেকে মমতা বা বৃহস্পতি কেউ স্বীকার করেন না—মরুৎগণ এঁকে পালন করেন। মরুৎগণ কর্তৃক ভৃত এবং সঙ্কর বলে নাম হয় ভরদ্বাজ। পরবর্তীকালে এঁকে শকুন্তলার ছেলে ভরত পালন

করেন। প্রয়াগে এঁর নামে আশ্রম আছে। দণ্ডকারণ্যের পথে রাম ভরদ্বাজ আশ্রমে এসেছিলেন। কর্নেলগঞ্জে একটি মন্দিরে এঁর বিগ্রহ পুজো করা হয়।

ভৃগু : ভৃগু বংশের প্রতিষ্ঠাতা, পিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার চর্ম্ম থেকে জন্ম। দক্ষযজ্ঞে নন্দীর হস্তে নিহত হন। পরে বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণের ব্রহ্মযজ্ঞে তিনি অগ্নির মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় ভৃগু। বরুণের স্ত্রী চর্ষণী পালন করেন বলে তাঁর অপর নাম চর্ষণীপুত্র। প্রথম জন্মে স্ত্রী খ্যাতি, মেয়ে লক্ষ্মী, ছেলে ধাতা, বিধাতা ও কবি। এই বিধাতার পৌত্র মার্কণ্ডেয়। দ্বিতীয় জন্মে তিনি পুলোমা। পুত্ররা হলেন চ্যবন, শুচি, বজ্রশির, শুক্রাচার্য ও সবন। ভৃগু ধনুর্বেদের প্রবর্তক। বিষ্ণুপুরাণ-এ ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, মনুসংহিতাতে দশজন প্রজাপতির অন্যতম। ভৃগু একবার ভগবান বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেছিলেন তাঁর কর্তব্যে অবহেলার জন্য। দশাশ্বমেধ ঘাটের পশ্চিমে ভৃগু একবার শিবের তপস্যা করতে বসলে শিব বর দেন ওই স্থানটি তীর্থে পরিণত হবে। পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে ভৃগুর আশ্রমে এসে উঠেছিলেন। এই ভৃগুই অগস্ত্যকে পরিকল্পনা দিয়েছিলেন নহুষকে কিভাবে সরাতে হবে এবং নহুষ যখন অগস্ত্যকে পদাঘাত করেন তখন অগস্ত্যের জটার মধ্যে গোপনে অবস্থিত ভৃগুই নহুষকে শাপ দেন।

ভৃঙ্গী : শিবের একজন অনুচর ও ভক্ত। মহাদেবের বরে অন্ধক ভৃঙ্গীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর মুখ বানরের মতো যা পার্বতীর বিরাগভাজন হওয়ার কারণে ঘটেছিল। একবার কৈলাসে মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করতে এসে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখে পতঙ্গ রূপ ধারণ করে কেবল পুরুষ অংশটিকে প্রদক্ষিণ করলে পার্বতী ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে দুর্বল হওয়ার অভিশাপ দেন। ভৃঙ্গীর পা এত দুর্বল হয়ে যায় যে, তিনি দাঁড়াতে পারেন না। মহাদেব তখন তাঁকে তৃতীয় পা দান করেন।

॥ ম ॥

মঙ্গল : গ্রহ। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন তপস্যা করেছিলেন তখন শিবের কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ে—এই ঘাম মঙ্গলে পরিণত হয়। মহাদেব এঁকে নবগ্রহের একজন হিসেবে স্থাপন করেন। মঙ্গল সম্পত্তি ও স্ত্রী রক্ষা করেন। এঁর চার হাত, রক্তাম্বর। বৌদ্ধতন্ত্রে ইনি দ্বিভুজ, রক্তাম্বর। যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির দেবতা।

মদন : অথর্ববেদ-এ কথিত হয়েছে, ইনি প্রেম ও কামের দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, তিনি ধর্মের এবং হরিবংশে লক্ষ্মীর পুত্র। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ মতে তাঁর পিতা ধর্ম ও মাতা শ্রদ্ধা। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে জন্ম। ব্রহ্মা এঁকে সৃষ্টি করে নিজেই এর শরে জর্জরিত হয়ে কন্যা শতরূপাকে গ্রহণ করেন। এর ফলে অভিশাপ দেন মহাদেবের ক্রোধে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। মদনের অপর নাম মকরকেতু, কুসুমায়ুধ, রমণ, রস, স্মর, দর্পক, মধুদীপ ইত্যাদি। ইনি দক্ষের দেহজ কন্যা রতিকে বিবাহ করেন দক্ষের অনুরোধে। মকর এঁর বাহন। ধ্বজা মীন। এঁর পুষ্পময় কুসুম কার্মুক ইক্ষুদণ্ডে গঠিত, তূণে পুষ্পময় পঞ্চশর। মদনের মৃত্যুর কারণ মহাদেব। কুমার কার্তিকেয়র জন্ম সম্ভাবিত করতে গিয়ে ইন্দ্র কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে মদন শিবের তপস্যাভঙ্গের আয়োজনকল্পে পুষ্পধনু মারতে উদ্যত হলে শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে বহির্গত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করে ফেলে। পরে মদনকে অশরীরী হিসেবে বাঁচিয়ে দেন মহাদেব, তাঁর নাম হয় অনঙ্গ।

আর একমতে, মহাদেব বর দেন কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মাবেন। ইনি প্রদ্যুম্ন। মদনের সহচর বসন্ত।

মনু : ব্রহ্মার দেহজাত বলেই অন্য নাম স্বায়ম্ভুব। মনুর স্ত্রী হলেন শতরূপা, ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ; মেয়ে হলেন আকূতি, দেবহুতি, প্রসূতি। এই সমস্ত ছেলে-মেয়ে থেকে সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি (মনু—মানব)। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ নিয়ে একটি দিব্যযুগ। ৭১টি দিব্যযুগে একটি মনুর রাজত্বকাল বা মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একটি দিনের দিবাভাগ বা এক কল্প। ব্রহ্মার প্রত্যেক দিবাভাগে মোট ১৪ জন রাজত্ব করেন। প্রতি মন্বন্তরের শেষে দেবতা, সপ্তর্ষি, বেদ ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান কালে যে ১৪ জনের উপরে মনুর রাজত্ব নির্ধারিত হয়েছে তাঁরা হলেন : স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্নি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রুচিসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। মৎসপুরাণে বলা হয়েছে স্বাযম্ভুব মনু ব্রহ্মা ও গায়ত্রীর সন্তান। ক্রমিক ৬ মনুব কাল শেষ হয়েছে। বর্তমানে বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল।

মহিষমর্দিনী : দুর্গার একটি নাম। মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলে এই নাম। মহিষাসুরের অত্যাচার দেবতাদের বিপন্ন করে তুললে তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে জানলেন ব্রহ্মার আশীর্বাদে মহিষাসুর ত্রিভুবন বিজয়ী, তবে একমাত্র নারীর হাতেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। তখন সব দেবতাবা মিলে সম্মিলিত জ্যোতি প্রেরণ করলেন মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে। সেখানে ঋষি কাত্যায়নেব শক্তি যোগ হতে উদ্ভূত হলেন অপূর্ব লাবণ্যময়ী এক দেবী। ইনিই কাত্যাযনী। অষ্টাদশভূজা। নানা দেবতা নানা অস্ত্রে ভূষিত করলেন এই দেবীকে । যেমন—শিব দিলেন ত্রিশূল, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতঘ্নী, পবন তৃণ ও ধনু, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড ইত্যাদি। এইভাবে সজ্জিতা দেবী হুঙ্কার দিয়ে উঠলে অগস্ত্য এঁর নাম দেন দুর্গা। দুর্গা তখন সিংহের পিঠে চড়ে বিন্ধ্যপর্বতে মহিষাসুরকে নিধন করতে চলে যান। মহিষাসুর এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করার জন্য দুন্দুভিকে দূত করে পাঠান। দূত এসে জানায় দেবী বীর্যশুল্কা। মহিষাসুর তখন সসৈন্যে এগিয়ে আসেন। শেষ যুদ্ধে দেবী মহিষাসুরকে পরাজিত করে ত্রিশূল বিদ্ধ করে হত্যা করেন।

মাদ্রী : পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী ধৃতির অংশে জন্ম। কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হবার পর ভীষ্ম কুলধর্মের রীতি মেনে প্রচুর পণ দিয়ে মদ্রদেশের রাজা শল্যের বোন মাদ্রীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসে পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ে দেন। এদিকে কুন্তীর ক্ষেত্রজ সন্তান হতে থাকলে মাদ্রী পাণ্ডুকে অনুরোধ করেন কুন্তী যাতে তাঁকে ক্ষেত্রজ সন্তান হবার মন্ত্র শিখিয়ে দেন। পাণ্ডু কুন্তীকে অনুরোধ করলে কুন্তী মাদ্রীকে মন্ত্র দিয়ে যে-কোন দেবতাকে স্মরণ করতে বলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করলে মাদ্রীর নকুল ও সহদেব দুটি যমজ পুত্র হয়। পরে কুন্তীকে আবার পাণ্ডু অনুরোধ করেন মাদ্রীকে আবার মন্ত্র দিতে। কিন্তু যমজ ছেলে হওয়ায় ঈর্ষান্বিত কুন্তী আব মন্ত্র দেননি। এরপর রথে বিহার করার সময় একদিন পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলে পাণ্ডুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মাদ্রী সহমৃতা হন। কুন্তী মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন।

॥ য ॥

যম যমুনা : অন্য নাম ধর্ম। মৃতদের পাপ ও পুণ্যের বিচারক। কৃষ্ণ বা সবুজবর্ণ, পরিধানে রক্তবাস, বাহন মহিষ। শ্যাম ও শবল নামে দুটি ভীষণাকৃতির কুকুর এঁর অনুচর। যমের

আরও অনুচর আছে, যাঁরা মানুষের আয়ু শেষে আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যায়। এখানে বিচার হয় এবং পাপীদের পাপ অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যমের উদ্দেশে রচিত। আর একটি সূক্তে যম ও তাঁর বোন যমী (যমুনা)-র কথাবার্তা আছে। ঋকবেদে যম পিতৃলোকের অধিকারী। স্কন্দপুরাণ অনুসারে অনুসূর্যা সাবিত্রী ত্বষ্টার মেয়ে—সন্তান যম ও যমী—যমজ বলে এই নাম। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে আছে সংজ্ঞা সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে চোখ বোজায় সূর্য শাপ দিয়েছিলেন পুত্র হবে প্রজাসংযাম অর্থাৎ যম। পুরাণে দেখা যায় পদাঘাত করার জন্য ছায়া (বিমাতা) যমকে অভিশাপ দিলে যমের দুটি পা ক্ষতযুক্ত ও কীট-দষ্ট হয়ে পড়ে। পরে সূর্যের (পিতা) আশীর্বাদে যম সুস্থ হয়ে উঠলেও দুর্বল পায়ের জন্যে মহিষে চড়ে বেড়াতে হয়। পুরাণে যমীকেই যমুনা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে ধর্ম ও ধর্মরাজ হিসেবে যমকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

যাজ্ঞবল্ক্য : বৈদিক ঋষি। সম্ভবত ইনি আরণ্যক, যোগশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা, স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা এঁর গ্রন্থের নাম। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক এঁর দ্বারাই সংকলিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম নীতির বিরোধী ছিলেন—ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে ইনি জনকের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি যুধিষ্ঠিরের সভাসদ ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি উপস্থিত ছিলেন।

॥ র॥

রতি : কন্দর্পের স্ত্রী ও দক্ষের স্বেদজ কন্যা। মহাদেবের ক্রোধাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলে তাঁকে পুনর্জীবিত করবার জন্য মর্তলোকে রতি মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর অনেক নাম , কামী, প্রীতি, মায়াবতী, কেলিকলা, সভঙ্গী ইত্যাদি।

রক্তবীজ : দানবরাজ রম্ভের মৃত্যুর পর তার সঙ্গে স্ত্রীও সহমরণে যান। কিন্তু চিতায় আগুন দিলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ করে মহিষাসুর বেরিয়ে আসেন। পরে শিবের কাছ থেকে বর পান যুদ্ধে তার প্রতিটি ভূপতিত রক্তবিন্দু থেকে সমান শক্তির একটি করে রক্তবীজ জন্মে যুদ্ধ করবে। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধে রক্তবীজ সেনাপতি হয়েছিলেন। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রক্তবীজের দেহ থেকে ভূপতিত রক্ত থেকে এক একটি রক্তবীজের জন্ম হচ্ছিল— বিষয়টি দেবীর কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শেষে দেবী নিজের অঙ্গ থেকে নির্গত চামুণ্ডাকে মাটিতে পড়ার আগেই রক্তবীজের দেহ থেকে পতিত রক্ত পান করে নিতে বলেন। এইভাবে চামুণ্ডার হাতে সমস্ত রক্তবীজ নিহত হয়।

রাহু : দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার ছেলে। অন্যমতে কশ্যপ ও সিংহিকার পুত্র। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু যখন মোহিনী বেশে দেবতাদের অমৃত পরিবেশন করেছিলেন তখন রাহুও ছদ্মবেশে দেবতাদের সঙ্গে বসে অমৃত পান করতে থাকেন। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য রাহুকে চিনতে পেরে ধরিয়ে দেন। অমৃত গিলে ফেলার আগেই বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। অমৃত গ্রহণের জন্য মাথা রাহু ও দেহ কেতু নামে বেঁচে তাকে। এই ঘটনার পর থেকে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর শত্রুতা—সুযোগ পেলেই রাহু চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করার চেষ্টা করে—ফলে গ্রহণ হয়।

রুক্মিণী : বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা। ইনি লক্ষ্মীর অবতার। রুক্মিণী ও কৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লে তিনি কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেন। রুক্মিণীর ভাই রুক্মী। কংসকে হত্যার কারণে রুক্মী কৃষ্ণের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই বিয়েতে মত দেননি। ওদিকে জরাসন্ধ পালিত-পুত্র শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে দিতে চান। এ হেন অবস্থায় রুক্মিণী এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে কৃষ্ণের কাছে খবর পাঠান এবং কন্যাদানের সময় কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে এসে রুক্মিণীকে হরণ করেন। পরে দ্বারকাতে তাঁদের বিবাহ হয়। তিনিই কৃষ্ণের প্রধান ভার্যা। তাঁর গর্ভজাত পুত্র সন্তান দশটি : প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, চারুচন্দ্র, ভদ্রচারু, চারু ও চারুভদ্র, একটি কন্যা : চারুমতি। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতাতে এঁরা সহগমন করেন।

॥ ল ॥

লক্ষ্মী : ঋক্‌বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিনি আদিত্যের পত্নী। শতপথব্রাহ্মণ মতে শ্রীর জন্ম প্রজাপতি থেকে। পুরাণ অনুসারে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে স্ত্রী খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম। আর এক মতে, পরমাত্মার দেহের বাম পাশ থেকে লক্ষ্মীর জন্ম। পরমাত্মার নির্দেশে লক্ষ্মী দু'ভাগে বিভক্ত হন, তাঁর বাম অংশ রাধাতে পরিণত হয়। বৈকুণ্ঠে ইনি বিষ্ণুর স্ত্রী, কামের মাতা। সীতা ও রুক্মিণী লক্ষ্মীরই অংশ। দুর্বাসাপ্রদত্ত পারিজাত ফুলের মালাকে ইন্দ্র অপমান করলে স্বর্গরাজ্য থেকে লক্ষ্মী চলে গিয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নেন এবং সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী আবার উঠে আসেন। লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য সুরাসুরের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে বিষ্ণু মায়া বিস্তার করে লক্ষ্মীকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী একবার তুলসী হয়েও জন্মান।

লোমশ : উত্তর ভারতীয় একজন মহর্ষি। পৃথিবীর প্রাপ্ত সীমা ধরে অনেকবার পৃথিবী পরিক্রমণ করেন। স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে অর্জুনকে দেখেন। ইন্দ্র লোমশকে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকতে বলে দেন। বনপর্বে আছে লোমশ মুনির উপদেশেই ইন্দ্র দধিচীর অস্থিতে বজ্র তৈরি করেন। লোমশ মুনির একটি লোম এক কল্পে নষ্ট হত বলে এই নাম।

॥ শ ॥

শিব : ত্রিমূর্তির (মহেশ্বর, শিব ও রুদ্র) অন্যতম। তমোগুণে প্রলয়ের কর্তা, রুদ্রমূর্তিতে বিশ্বসংসার হরণ করেন বলে তাঁর নাম হর। পিণাক এঁর ধনু, জটাজুটহেতু ইনি কপর্দী, হলাহল পানে নীলকণ্ঠ। দক্ষকন্যা সতীকে ইনি বিবাহ করেছিলেন। গঙ্গা নামে তাঁর আর এক স্ত্রী ছিল। দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশ। ইনি বৈদিক দেবতা নন, তবে রুদ্র নামের উল্লেখ কোন কোন জায়গায় আছে। স্কন্দপুরাণে আছে ব্রহ্মার তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য শিব ব্রহ্মার পাঁচটি মুখের একটি ছিঁড়ে নিয়ে নিজে পঞ্চানন হন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণ ও আরণ্যক গ্রন্থে এবং নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে শিবকে পশুর দেবতা ও কৃষির দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুকদেব : ব্যাসদেব ও ঘৃতাচীর সন্তান। ব্যাস মহাদেবের তপস্যা করে বর চেয়েছিলেন অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের মতো গুণসম্পন্ন ও পবিত্র এক পুত্রের। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন না। এমন সময় সেখানে অপ্সরা ঘৃতাচী আসেন শুকপাখির বেশে। তিনি তাঁকে দেখে কামার্ত হন এবং বীর্য স্খলিত হয়ে গিয়ে অরণিতে পড়ে। শুকদেবের জন্ম হয়। অত্যন্ত

মেধাবী। উপনয়ন দেন শিব স্বয়ং, ইন্দ্র দেন কমণ্ডলু আর দিব্যবস্ত্র। ইনি বৃহস্পতির কাছে বেদ শিক্ষা করেন আর মোক্ষধর্ম অধ্যয়ন করেন পিতার কাছে। তাঁর মতো নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় মুনি ভারতবর্ষে খুব অল্পই ছিলেন। যোগবলে সূর্য অভিমুখে যাত্রা করেন ও বায়ুমণ্ডলের উপরে গিয়ে ব্রহ্মত্ব পান।

শুম্ভ-নিশুম্ভ : অসুর ভ্রাতৃদ্বয়। পাতাল অধিবাসী, এই দুই অসুরের তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বর প্রার্থনা করতে বললে, তারা অমরত্ব চেয়ে বসে। না পেয়ে পুরুষজাতীয় দেবতা, অসুর বা পশু-পাখী যাতে তাদের বধ না করতে পারে সেই বর চায়। এই বরে বলীয়ান হয়ে হয়ে তারা স্বর্গভূমিতে দেবতাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহাদেবীর অঙ্গ থেকে আবির্ভূতা দেবী কৌশিকী তাদের বধ করেন।

শুক্রাচার্য : অসুরদের গুরু, ভৃগুর পুত্র। বলা হয় পুলোমার সবচেয়ে শক্তিশালী পুত্র। শুক্র সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন এবং সেই মন্ত্রবলে দেবাসুরের যুদ্ধে মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে দিতেন। কচ এই বিদ্যা শিক্ষার জন্যে শুক্রের কাছে আসেন—কন্যা দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য কচকে ঐ বিদ্যা দান করেন। জামাতা যযাতিকে শুক্রাচার্য শাপ দিয়েছিলেন। শুক্র বলীর গুরু ছিলেন। বিষ্ণু ছদ্মবেশে এসে বলীর কাছে ত্রিপাদ ভূমি চান। শুক্র বিষয়টি বুঝতে পেরে শিষ্যকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। ফলে বলীকে পাতালে চলে যেতে হয়।

॥ স ॥

সত্যবতী : অদ্রিকা অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যী হয়ে জলে বাস করতেন। জালে ধরা পড়লে এর পেটে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পাওয়া যায়। এই মেয়ের গায়ে মাছের গন্ধ ছিল বলে নাম মৎস্যগন্ধা। কন্যা পিতার নির্দেশে খেয়া পার করতেন। কোন একদিন পরাশর মুনি মৎস্যাগন্ধাকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন। সত্যবতী বলেন উন্মুক্ত স্থানে সঙ্গম সম্ভব নয়, তখন পরাশর কুয়াশা সৃষ্টি করেন। মৎস্যগন্ধা তখন বলেন, যে এতে তাঁর কন্যাভাব নষ্ট হবে--তিনি ঘরে ফিরতে পারবেন না। পরাশর বলেন তিনি কন্যাই থাকবেন এবং আরও বর দিতে চাইলেন। মৎস্যগন্ধা উত্তম গাত্র-সৌগন্ধ বর চান এবং বর পেয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এই মিলনের ফলে তৎক্ষণাৎ এক পুত্রের জন্ম হয়—ইনিই ব্যাসদেব। পরে শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ব্যাসের পরামর্শে বংশের ভাবী সর্বনাশ যাতে না দেখতে হয় তার জন্য দুই পুত্রবধূর সঙ্গে বনে গমন করেন এবং সেখানে তপস্যায় দেহত্যাগ করেন।

সনক : সনন্দ, সনাতন ব্রহ্মার একজন মানস-পুত্র। বিষ্ণুর অংশে জন্ম। ব্রহ্মা প্রথমে অবিদ্যা সৃষ্টি করেন, যা থেকে তমিস্র, অন্ধতমিস্র, মোহ, মহামোহ প্রভৃতির জন্ম হয়। এইসব অসৎ সৃষ্টি দেখে আবার ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। আর তখনই সনক, সনন্দ, সনাতনাদি সাতজন পুত্রের জন্ম হয়। কোনও কোনও মতে সাতজনের বদলে চারজনকেই এসময় সৃষ্টি করেন, যাঁরা সকলেই সত্ত্বের পূর্ণ মূর্তি, নিষ্ক্রিয় উর্ধ্বরেতা ও শৈশবেই বেদজ্ঞ।

সরস্বতী : বেদে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী দেবী। আর্য-অধিকৃত ব্রহ্মাবর্তের অঞ্চলের একটি নদী। বৈদিক আর্যদের মতে, এই নদী দেবীরূপে দেশকে উর্বরা ও জলকে পবিত্র করেন। বেদে কিন্তু সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবীরূপে উল্লেখিত হন না। বেদে কথিত হয়েছে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে সরস্বতীর আবির্ভাব। ইনি শুক্লা, বীণাধারিণী ও চন্দ্রের শোভাযুক্তা। কোথাও

কোথাও এঁকে কৃষ্ণকণ্ঠ উদ্ভূতাও বলা হয়েছে। দেবীভাগবত মতে, সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। আর ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে লক্ষ্মী আর সবস্বতী নারায়ণের পত্নী। ব্রহ্মার ঔরসে সবস্বতীর গর্ভে জন্মান স্বয়ম্ভু মনু। সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বন, দধীচির আশ্রমও এই নদীর তীবে। বশিষ্ঠকে একবার ভাসিয়ে নিয়ে যান এবং বিশ্বমিত্র কর্তৃক একবার অভিশপ্ত হন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর ষোলশ পত্নী সরস্বতীর জলে প্রাণ বিসর্জন দেন। গঙ্গাকে সরস্বতী অভিশাপ দেন যে, তাঁরই জলে পাপীতাপী এসে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। একদা অগ্নি সমস্ত সৃষ্টিকে নাশ করতে উদ্যত হলে সরস্বতী ব্রহ্মার নির্দেশে বাড়বাগ্নিকে তাঁর বক্ষে স্থান দেন। তাঁরই কারণে পুষ্কর তীর্থে পরিণত হয়।

সূর্য : আর্যদের উপাস্য দেবতা। গ্রিকদের Helios, ও টিউটনদের Tyr, ইরানীয়দের 'খুরসেদ'। লাতিনে এঁর উল্লেখ Sol রূপে। সবিতা, সূর্য, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু—এই পাঁচটি নামে সূর্যস্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তাশ্ব-যোজিত একচক্ররথে ইনি বিশ্বভ্রমণ করেন। রামায়ণ ও মহাভারতে সূর্য কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে এঁর বিবাহ হওয়ায় তাঁদের তিনটি সন্তান হয় মনু, যম ও যমুনা। সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়।

সৌভার : বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে বহু ঋকবেত্তা ১২ বছর জলে বাস করেন। মান্ধাতার ৫০টি কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন। তারপর হঠাৎ একদিন সংসার ছেড়ে স্ত্রীদের নিয়ে তপস্যা করে মুক্তি পান।

।। হ।।

হিমালয় : পুবাণে মানস সরোবরের দক্ষিণে অবস্থিত। পার্বতী বা উমা এঁরই কন্যা। হিমালয়-পত্নী সুমেরু-কন্যা মেনকা। মৈনাক নামে এঁদের একটি পুত্রও ছিল। দক্ষযজ্ঞে সতী যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। পরের জন্মে সতীই পার্বতী হয়ে হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।
